বঙ্গ বৃত্তান্ত

বঙ্গ বৃত্তান্ত

বিদেশী পর্যটকদের লেখায় বাঙ্গালার কথা

[পঞ্চম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী]

অসীম কুমার রায়

ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশিত ১৯৫৬

প্রকাশক : ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : সাধনা প্রেস
৪৫।১ এফ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সুধীর দাশগুপ্তকে

সূচীপত্র

মানরিক ১
ফাহিয়েন ৯৬
হিউয়েন ৎসাঙ ৯৭
পুণ্ড্রবর্ধন ৯৭
সমতট ৯৮
তাম্রলিপি ৯৯
কর্ণসুবর্ণ ৯৯
ইব্‌নে বতুতা ১০২
পঞ্চদশ শতাব্দীর চীন দেশের সরকারী কাগজ পত্রে
বাঙ্গালা দেশের বিবরণ ১০৮
মা হুয়ান ১০৯
হু-হিয়েন ১১১
সি ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু ১১৪
শু-ইউ-চু-ৎসিউ-লু ১১৭
মিং-শে ১২০
ভারথেমা ১২২
দোম-জোয়াও ১২৪
ডুয়ার্তে বার্বোসা'র ১২৫
জোয়াও দে বাররোস ১২৮
সিজার ফ্রেডারিক ১৩১
র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌ ১৩৩
জেসুইট মিশনারিদের চিঠি ১৩৭
বার্নিয়ের ১৪৯
তাভের্নিয়ের ১৫৫
টমাস বাউরী ১৬১
পরিশিষ্ট ১৬৩
নির্দেশিকা ১৮২

প্রাক্ কথন

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাজক মানরিক শাহজাহানের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে এ দেশের সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি, শাসন ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। বস্তুত, মানরিকের বিবরণ ছাড়া সেই সময় বাঙ্গালা দেশের, বিশেষ করে দক্ষিণ বঙ্গের, কি অবস্থা ছিল তা জানবার আর প্রায় কোন উপায়ই নেই। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর বাঙ্গালা দেশ অংশের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

মানরিকের আগে ও পরেও অনেক বিদেশী পর্যটক বাঙ্গালা দেশে এসেছেন, ও তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ দেশের কথা লিখেছেন। ফা-হিয়েন গুপ্তসম্রাটদের সময় তাম্রলিপ্তি বন্দর হয়ে শ্রীলঙ্কায় যান। হিউয়েন ৎসাং যখন বাঙ্গালা দেশে আসেন তখন এ দেশের রাজা শশাঙ্ক। এই দুই জন চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিবরণে এ দেশের কথা কিছু কিছু জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্গালা দেশের অনেক অংশে মুসলিম শাসন আরম্ভ হয়, তবে এই সব সুলতানদের ইতিহাস কোন মুসলিম ঐতিহাসিক লেখেন নি। এঁদের সময় বাঙ্গালা দেশের অবস্থার কথা জানবার উপায় শুধু ইবনে বতুতার বিবরণ ও চীন দেশের সরকারী রিপোর্ট। বাংলার সুলতানদের সময় কয়েক বছর বাঙ্গালা ও চীনদেশের মধ্যে রাজদূত বিনিময় হয়। চীন দেশের রাজদূতরা তাঁদের সরকারকে যে সব রিপোর্ট দিতেন তার কিছু অংশ ঐ দেশে পাওয়া যায়।

মুঘল যুগে মানরিক ছাড়া গোয়া থেকে অন্য খ্রীষ্টান মিশনারীরাও বাঙ্গালা দেশে এসেছিলেন। তাঁরা গোয়াতে যে রিপোর্ট পাঠাতেন তাই থেকে দক্ষিণ বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থার কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়।

মুঘল যুগে যে সব ব্যবসায়ীরা ইয়োরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালা দেশেও ঘুরে গিয়েছিলেন। এঁরা অনেকে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন।

এই সব ভ্রমণ বৃত্তান্তের বাঙ্গালা দেশ অংশটুকুর ও রিপোর্টগুলির অনুবাদ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ডায়েরী ও রিপোর্টগুলি ছাড়া, এই শতাব্দীর শেষ অবধি আর কোন প্রসিদ্ধ বিবরণ মনে হয় বাদ পড়েনি।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের গ্রন্থটি কাজে লাগতে পারে।

পোর্তুগীজরা প্রায় তিনশ বছর কখনও জলদস্যু বা সৈনিক, কখনও মিশনারী আর কখনও বা ব্যবসায়ী রূপে বাঙালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছিল। এই মেলামেশার চিহ্ন পাওয়া যায় বাঙ্গালা ভাষায় বহু সংখ্যক পোর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশে। এই শব্দগুলি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে দেওয়া হ'ল। প্রবন্ধটি ১৯৮৬ সালের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সেবাষ্টীন মানরিকের বঙ্গদেশে ভ্রমণ

পাদরি মেষ্ট্রো ফ্রে সেবাষ্টীন মানরিক [Padre Maestro Fray Sebastien Manrique] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ধর্মযাজক রূপে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি তিনবার বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী তিনি তার কয়েক বছর পরে ইয়োরোপে বসে লেখেন। এই অনুবাদ শুধু তাঁর বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসার বিবরণ অংশ থেকে করা।

মানরিক পোর্তুগালের লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভ্রমণ কাহিনী স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। ইংরেজি অনুবাদক একফোর্ড লুয়ার্ড [Eckford Luard] লিখেছেন যে মানরিকের ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট। ইংরেজি অনুবাদ হ্যাকলুইট সোসাইটি [Hakluyt Society] ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

মানরিকের জন্ম পোর্তুগালের ওপোর্টো শহরে। জন্ম তারিখ জানা নেই। তিনি গোয়া শহরে ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৬২৮ [বা ইংরেজি অনুবাদকের মতে ১৬২৯] খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোচিন থেকে যাত্রা আরম্ভ করে সেই বছরই জুন মাসে হুগলিতে পৌঁছান। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আরাকান যাত্রা করেন। প্রায় ছয় বছর আরাকানে থেকে তিনি বাঙ্গালা দেশ হয়ে গোয়া ফিরে যান। তারপর কিছু দিন পরে তিনি পূর্ব এশিয়াতে চলে যান। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখান থেকে গোয়া ফিরে যাচ্ছিলেন। ঝড়ে তাঁর জাহাজ উড়িষ্যার সমুদ্র তীরে এসে লাগে। সেখানে নেমে তিনি বাঙ্গালাদেশ, উত্তর ভারত হয়ে স্থলপথে ইয়োরোপ ফিরে যান। পথে তিনি গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।

মানরিক যখন বাঙ্গালাদেশে এসেছিলেন তার একশ বছরের কিছু আগে পোর্তুগীজরা প্রথম বাঙ্গালাদেশে আসে। এখানে কয়েক জায়গায় তারা বসতি স্থাপন করে। পোর্তুগীজরা নিজেদের বসতি গুলিকে ব্যাণ্ডেল বলত। এই শব্দটি ফারসী বন্দর শব্দ থেকে বানানো। গোড়ার দিকে বাঙ্গালাদেশে তাদের দুটি প্রধান ব্যাণ্ডেল বা বসতি ছিল পশ্চিমে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ, যাকে এরা বলত ছোট বন্দর, আর পূবে চাটগাঁ যার নাম এরা দিয়েছিল বড় বন্দর। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সরস্বতী নদী মজে গেলে তারা সাতগাঁ থেকে হুগলিতে এসে বন্দর বা বসতি বানায়। পোর্তুগীজদের বাঙ্গালা দেশের বসতিগুলি পোর্তুগালের রাজার অধীন ছিলনা। এখানে এরা স্থানীয় সরকারের বা মুঘল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ব্যবসা করত। অধিকাংশ পোর্তুগীজই ভাগ্যান্বেষী লোক ছিল, আর তাদের মধ্যে কিছু বরখাস্ত হওয়া সৈনিকও থাকত। এরা অনেকে এখানকার ছোট খাট রাজা বা জমিদারের চাকরি করত, অনেকে আরাকানের মগ রাজার নৌ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হত, আর কিছু লোক স্বাধীন ভাবে জলদস্যু বৃত্তি

করত। আরাকানের লোকেরা পোর্তুগীজদের সাহায্যে বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ অংশে সর্বত্র নৌকা করে এসে লুটপাট করত আর স্থানীয় লোকেদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানাতো। একশো বছরেরও বেশী দিন ধরে মগ আর পোর্তুগীজদের অত্যাচারে এই অঞ্চলের বহু গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায়। মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীতে এই জলদস্যুদের অত্যাচারের বিবরণ বিশদভাবে পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের কথা যে সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জলদস্যুদের কথা প্রায় নেই। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন অপ্রাচীন পাঠে দুটি লাইন পাওয়া যায়:

ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে॥

পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে এদের কথা বোধহয় আর কোথাও নেই। চট্টগ্রামের কবি আলাওলের পিতা ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে মারা যান। আলাওল কয়েকবার সেই কথা লিখেছেন:

কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্মলেখা।
দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহিদ হৈল বাপ।
রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ॥

পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার সম্পর্কে মুঘল ঐতিহাসিকরাও প্রায় নীরব। একটু বিশদ করে এদের কথা লিখেছেন শুধু আসামের ইতিহাস লেখক শিহাবুদ্দীন তালিশ (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি লিখেছেন, "আরাকানের মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুরা প্রায়ই জলপথে এসে বাঙ্গালা দেশ লুট করত। সামনে হিন্দু মুসলমান যাকেই তারা পেত তাকেই তারা ধরে নিয়ে যেত। তাদের হাতের চেটোতে ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত ঢুকিয়ে বেঁধে এনে নৌকার পাটাতনের নীচে তাদের ফেলে বন্দী করে নিয়ে যেত। সকালের দিকে তাদের কয়েক মুঠো চাল ফেলে দিত, যেন হাঁস মুর্গী খাওয়াচ্ছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলাদেরও তারা এমনি করে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বা উপপত্নী বানাত। শেষ অবধি চাটগাঁ আর ঢাকার মধ্যে নদীর দুধারে লোকের বসতি সব উজাড় হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালা দেশের মুঘল নৌ সেনারা এমন ভীত হয়ে পড়েছিল যে তাদের একশটি সশস্ত্র নৌকা যদি জলদস্যুদের চারটি নৌকাও দেখতে পেত তাহলেও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে তারা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত··· জলদস্যুদের লুটের অর্ধেক পেতেন আরাকানের রাজা।"

জলদস্যুরা যে সব লোকদের ধরে নিয়ে যেত তাদের আরাকানে ধান ক্ষেতে কাজ করবার জন্য বেচে দেওয়া হত। বাড়তি লোকেদের হুগলিতে এনে বেচা হত। মানরিক লিখেছেন যে শুধু পোর্তুগীজ নয়, এদেশী ব্যবসায়ীরাও এদের কিনে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় বেচত। কিছু লোককে সিংহল বা অন্য পোর্তুগীজ অধিকৃত দেশে নিয়ে গিয়ে বেচা হত।

মানরিক তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙ্গালা দেশের লোকেদের ধর্ম, আচার ব্যবহার,

জীবন যাত্রা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে তখন এ দেশে খাবার জিনিসের অভাব ছিল না। লোকে পেট ভরে খেতে পেত। তবে কাপড় চোপড়, বাড়ি ঘর দোর, বাসন বা অন্ত জিনিস পত্রের ব্যাপারে বাঙালীরা নিতান্ত দরিদ্র ছিল।

মানরিক তাঁর বাঙ্গালাদেশের তিনটি যাত্রার প্রত্যেকটিতে একবার করে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য প্রত্যেক বারই ছাড়া পান, তবে তাঁর সঙ্গে পুলিশ আর বিচার বিভাগের লোকেরা যে ব্যবহার করেছিল তার বর্ণনা থেকে সমসাময়িক বাঙ্গালা দেশের বিচার আর শাসন ব্যবস্থার একটা অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। কাজির বিচার যাকে বলে সে রকম কিছু ছিলনা মনে হয়। দোষ ভাল ভাবে প্রমাণ না হলে শাস্তি দেওয়া চলত না; আর অভিযোগ ভুল প্রমাণ হলে অনেক সময় অভিযোগকারীরই শাস্তি হত।

এই লেখার মধ্যে গোল ( ) বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ লেখকের নিজের, আর চতুষ্কোন [ ] বন্ধনীর অংশ ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদকের।

প্রথম পরিচ্ছেদ

[১৬২৮ বা ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ]

এই পরিচ্ছেদে লেখক তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য, আর কিভাবে এই মিশন আরম্ভ হল তাই বর্ণনা করেছেন; আর বলেছেন যে কি করে তাঁকে সম্পূর্ণ বাঙ্গালা দেশের ধর্মযাজকের পদের মত সম্মানীয় পদ দেওয়া হল।

হে দয়ালু কৌতুহলী পাঠক! এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করবার আগে, বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনার একঘেয়ে বর্ণনা না করে, আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে অনেক বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি আমার মিশনের আর ভ্রমণের কাহিনী লেখবার ইচ্ছা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম; আমি আমার এলাকার [মানরিক এই লেখা লেখবার সময় পোপের পোর্তুগাল-স্থিত জমিদারীও দেখাশোনা করতেন] কাজ কারবার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবার আমার সময় ছিল না। তাছাড়া ভাল ঐতিহাসিকের বিদ্যা বা গুণও আমার ছিল না কিন্তু পরে যখন কতগুলি আধুনিক ভ্রমণকাহিনী দেখলাম তখন আমার খানিক সাহস হল যে আমার ভাষার চাতুর্য না থাক, অন্ততঃ সত্য কথা লিখেই আমি আমার এই ভ্রমণ কাহিনীকে অমরত্ব দিতে পারব। আমার ভাষা হয়তো আরিস্টোফানেসের [Aristophanes] মত পাড়াগেঁয়ে হবে, কিন্তু তার মধ্যে প্লাটোর সত্যবাদীতার গুণ পাওয়া যাবে।

তাই সত্যের দণ্ড সবলে আঁকড়ে থেকে আমি লেখা আরম্ভ করলাম। আমি তখন কোচিমের [কোচিনের] মঠের একজন সদস্য ছিলাম। কোচিন ঐ নামেরই প্রধান শহর ও রাজধানী। এই শহর আয়তনে ইণ্ডিয়ার [অর্থাৎ পোর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের] দ্বিতীয় শহর; কিন্তু যদি এখানকার ঠাণ্ডা আর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা

ধরা হয়, তাহলে এর স্থান প্রথমই হওয়া উচিত। এর এক পাশ দিয়ে মানগট্টি [Mangatte, Mangatty] নদীর একটি শাখা বয়ে গেছে। অন্যপাশে ধর্মহীন [মানরিক হিন্দু না লিখে heathen শব্দটি ব্যবহার করেছেন] রাজার প্রাসাদ। পরে সমুদ্রের নোনা জলের সঙ্গে মিশে এই নদীটি কোচিনের সেই জায়গাকে দু'ভাগ করে মোহানার কাছে বেশ চওড়া হয়ে গেছে। সেই খানে এই নদী বইপিম [Vaipim] ও আনজিকাইমাল [Anjequaimal, এর্নাকুলাম] এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়।

এই শহরে থাকতেই আমাকে বাঙ্গালা [Bengala] রাজ্যের মিশনের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই নির্বাচন করেন গোয়ার শ্রদ্ধেয় ফাদার মাষ্টার ফ্রাই লুইস কুটিনহো [Frai Luis Coutinho]। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে আমাদের সম্প্রদায়ের প্রাদেশিক ভিকার ছিলেন। [অগস্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ইণ্ডিয়াতে অর্থাৎ পোর্তুগীজ অধিকৃত ভারতে, কোন আলাদা প্রভিন্স ছিল না। এখানকার ভিকার পোর্তুগালের ভিকারের অধীন ছিলেন। তাই ইণ্ডিয়ার ভিকার কে প্রাদেশিক ভিকার বলা হত।] আমার তিন জন সাথী, ফ্রাই মানুএল-দে-লা আসুমসিওন [Frai Manuel de la Assumcion], ফ্রাই ডীগো কাটেলা [Frai Diego Catela], ফ্রাই গ্রেগরিও দে লোস আঞ্জেলেসকে [Frai Gregorio de los Angeles] নিয়ে আমরা সব সুদ্ধ চার জন ছিলাম। কোচিনের মঠের কর্তা ফাদার প্রিওরের [Prior] কাছে হুকুম এলো যে আমাদের যা কিছু দরকার সব যেন দেওয়া হয়। প্রিওর যথাসাধ্য সেই হুকুম তামিল করেছিলেন। তিনি আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন ও আমাদের দুটো সওদাগরী জাহাজে তুলে দেন। দুটোরই বাঙ্গালা দেশের যাবার কথা কিন্তু আলাদা আলাদা বন্দরে। আমার সাথী হলেন ফ্রাই গ্রেগরিও, আর হুগলি [Ugolim] শহর-গামী সেণ্ট অগস্টিন নামক জাহাজে আমরা রওনা হলাম। অন্য দুই [পাদরি] ভ্রাতা উড়িষ্যা [Ourixa] রাজ্যের পিপলি [Piple বা Pipli বা শাহ-বন্দর সুবর্ণরেখার তীরে ছিল] শহরে যাবার জাহাজে ওঠেন। এই জাহাজে মাল বোঝাই আগেই হয়ে গিয়েছিল বলে এটি চোদ্দ দিন আগেই ছেড়ে যায়। কন্যাকুমারীর কাছে সিংহলের উপসাগরে [Gulf of Ceilan] খারাপ আবহাওয়া আর ঝড়ের মুখে পড়ে তাঁদের জাহাজ ভীষণ সমুদ্রের মধ্যে চলে যায়। কোন রকমে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে তাঁরা সব চেয়ে কাছাকাছি আর সেই সময়কার সব চেয়ে ভাল বন্দর তুতিকোরিনে এসে পৌঁছান। ঝড়ে জাহাজের অবস্থা এতো খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে সে বছর আর তাঁরা বাঙ্গালা দেশে যেতে পারেন নি।

আমাদের জাহাজটি আগেই এতো বোঝাই হয়ে গিয়েছিল যে নদীর গভীর অংশে যেখানে বড় জাহাজগুলি বোঝাই হয় সেখানে গিয়ে মোহানার কাছে বালির চড়ায় আটকে পড়ে। দুদিন চড়ায় আটকে থাকার পর জাহাজের লোভী ব্যাপারীরা বুঝতে পারে যে অন্তত কিছু মাল না নামিয়ে ফেললে জাহাজ আর এগোতে পারবে না। এই বাধা দূর হবার পরও জাহাজ চড়া পেরিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে যাবার পর জাহাজের ক্যাপ্টেন মঠ থেকে আমাদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে

আমরা ভিয়াম পাসিস [Viam pacis] অনুষ্ঠান করে জাহাজে উঠলাম। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের [ইংরেজি অনুবাদকের মতে ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের] ৬ই মে আমরা যাত্রা আরম্ভ করি।

গোড়াতেই বাতাসের অভাবে আমরা প্রায় চোদ্দ দিন না এগোতে পেরে পোর-কাদ আর কোল্লমের মধ্যে থেমে থাকি। ক্যাপ্টেন তখন জাহাজের অভিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন যে আমাদের কোচিন ফিরে যাওয়া উচিত। এই দুরবস্থার মধ্যে অবশ্য তাঁরা পুণ্যাত্মা মাতা মেরীর মারফত স্বর্গীয় করুণার জন্য প্রার্থনা করতে ভোলেন নি। আর তাঁরই দয়াতে, ঠিক যখন জাহাজের মুখ ঘোরান হবে তখন এমন সুবাতাস বইতে আরম্ভ করল যে আমরা তেরো দিনেই বাঙ্গালার ব্রাচেসে পৌছে গেলাম। [বঙ্গোপসাগরে নদীর মুখের কাছে অগভীর সমুদ্রকে ব্রাচেস বলা হত]।

সমুদ্রের তীর বরাবর এই জায়গাতে অনেক চড়া থাকে, আর জল এখানে অগভীর বলে জায়গাটা বিপজ্জনক। জায়গাটা চন্দেখান রাজ্যের মধ্যে। [চন্দেখান ভাগীরথীর মোহানার পূর্বদিকে, সুন্দরবনের অন্তর্বর্তী অঞ্চল] এখানকার সমুদ্রকে ব্রাচেস [braces =fathoms] বলা হয় এই জন্য যে এখানে সমানে জাহাজ থেকে জল মেপে চলতে হয়। এমন ভাবে যেতে হয় যে জাহাজটি যেন অন্ততঃ ছ বা সাত ফ্যাদম গভীর খাড়ির মধ্যে থাকে। আর যদি দেখা যায় যে জল আট ফ্যাদম বা তার চেয়ে বেশী গভীর তাহলে বুঝতে হবে যে ভুল পথে চলে এসেছি আর এখনই জল মাত্র তিন বা চার ফ্যাদম গভীর হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে খুব সাবধানে এগিয়ে আমরা পরম পবিত্র ট্রিনিটির দিন ব্রাচেসের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সমুদ্র সেদিন শান্ত ছিল। আর আমার সাথী ফাদার আর আমি ধার্মিক অনুষ্ঠানের জন্য জাহাজের উপর একটি বেদী বানিয়ে নিলাম। শান্ত আবহাওয়াতে আমরা ফ্যাদম মেপে মেপে বেশ এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের কপাল দোষে বা বলা যায় আমাদের পাপের দরুণ এক ব্যাপার ঘটল। সূর্য যখন মাথার উপর এসেছে আর সমুদ্রের গোপন শক্তি যখন ঢেউগুলিকে শান্ত করে জল খুব কম করে ফেলেছে আমাদের জাহাজ তখন চন্দেখানের বালির চড়ায় আটকে গেল। এই সব চড়া জলের মধ্যে অনেক দূর অবধি গেছে ; এমনকি দূর সমুদ্রে যেখান থেকে স্থল দেখা যায় না সেখানেও জলের তলায় এই চড়া থাকতে পারে, আর আমাদের মত যারা এতে আটকে যায় তাদের বিপদে ফেলে। আমাদের জাহাজ পাঁচ ফ্যাদম গভীর জলে আটকে গিয়ে ছিল। এর কারণ এই যে কোচিনের মোহনায় দুর্ঘটনার সময় জাহাজের জোড় অনেক জায়গায় খুলে গিয়েছিল, আর জাহাজের গায় অনেক ফুটো হয়ে গিয়েছিল। জাহাজের মালের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল শঙ্খ অর্থাৎ বড় বড় ঝিনুক। এগুলি তুতিকোরিনে আর মৎস্য উপকূলে [Fishery Coast] পাওয়া যায়। বাঙ্গালা আর ইন্দোস্তানের (Indos-tan) বন্দরগুলিতে এগুলি ব্যবসার সামগ্রী। জাহাজের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে শঙ্খগুলি ভরে গিয়ে জাহাজটি এতো ভারী হয়ে গিয়েছিল যে যেমন আগেই বলেছি পাঁচ ফ্যাদম গভীর জলেও এটি আটকে যায়।

মেয়েদের গয়না বানাবার জন্য ধর্মহীনদের মধ্যে শঙ্খের বেশ চাহিদা। এগুলি দিয়ে চুড়ি আর আংটি বানান হয়, আর মেয়েরা এই সব শুধু হাতেই নয় পায়েও পরে। পালিশ করবার পর শঙ্খগুলি একেবারে সাদা হয়ে যায়। আর এই সাদা জমির উপর সোনালী আর অন্য নানা রঙের নক্সা আঁকা হয়। তখন এগুলিকে বেশ সুন্দর দেখায়। প্রতি বছর এত শঙ্খ এই দেশে আমদানী করবার কারণ এই যে এই দেশের লোকেদের নিয়ম যে যখন স্বামী বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় মারা যায় তখন শবকে এই সব অলঙ্কার শুদ্ধ পোড়ান হয়। এই সব শঙ্খদের মধ্যে কখন কখন এক একটা এমন শঙ্খ পাওয়া যায় যেগুলির মুখগুলি উলটো দিকে ঘোরানো। এদের রাজ শঙ্খ বলে। এগুলি শুধু রাজ রাজড়াদেরই যোগ্য, আর এদের এক একটার দাম দুশ থেকে তিনশ টাকা, অর্থাৎ স্পেনের দেড়শ পেসোর মতন।

জাহাজের শঙ্খগুলিই আমাদের সর্বনাশ ঘটাল। এগুলি জলে ভরে যাবার দরুণ পাম্প করে জাহাজ থেকে জল বার করা সম্ভব হলনা। তখন আমাদের পাইলটের আক্কেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে প্রস্তাব করল যে জাহাজের মাস্তলগুলি কেটে ফেলা হোক। লোকটি বেশ চতুর আর তেরো বার এই খাড়ি দিয়ে যাওয়া আসা করে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে আমাদের কাছে এসে বলল যে ভগবান তাকে তার পাপের শাস্তি দিচ্ছেন, আর আমরা যেন তাঁর কাছে এই জাহাজের ক্রুশ'র উপর যাত্রীর প্রাণের জন্য করুণা ভিক্ষা করি। এই ভয়ানক খবর শুনে আমরা তখনই ঠিক করলাম যে জাহাজে যত খ্রীষ্টান আছে আমরা তাদের কনফেসন গ্রহণ করব। আমার সাথী জাহাজের সামনের দিকে গেলেন আর আমি জাহাজের পিছনের দিকে। চারিদিকে মেয়েদের আর ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি আর মাস্তল কাটার শব্দ এবং হৈ চৈ র মধ্যে আমাদের কাছে যতটুকু সময় ছিল তাইতে সবাইকে কনফেস করালাম। আমার কাছে যারা এসেছিল সবাইকে শোনা হয়ে যাবার পর আমি আমার গলা থেকে ক্রুশটি খুলে নিলাম আর আমাদের পরিত্রাণের এই চিহ্নটি হাতে নিয়ে জাহাজে তলার দিকে নেমে গেলাম। সেখানে মূর [মুসলমান] মেয়েদের থাকবার জায়গা। লস্করী বলে যে সব নাবিকদের পোর্তুগীজ সওদাগরী জাহাজে নেওয়া হয় এরা তাদের স্ত্রী। এরা বেশীর ভাগই ধর্মে মুসলমান। আমি সেই মেয়েদের গিয়ে বোঝালাম যে তারা শুধু ইহজীবন মাত্র নয়, অনন্ত জীবনও খোয়াতে চলছে। তাদের আত্মাদের পরকালে কি কি শাস্তি পেতে হবে তাও বললাম। আর তা ছাড়া সেই চরম অবস্থায় ভগবান আমাকে যা যা বলতে অনুপ্রাণিত করলেন সেই সবও যোগ করে দিলাম। কিন্তু বক্তার অযোগ্যতার দরুণই এসব কথার কোন ফল হল না। বরং তাদের মধ্যে এক বুড়ী তাদের আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল আর তাদের প্রফেট কি বলেছেন সেই কথা তাদের মনে করাতে লাগল।

যদিও সবাই জাহাজের মাল জলে ফেলে দিয়ে তাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করছিল তবুও জাহাজ বেশ জলে ভরে যাচ্ছিল। আমরাও যখন আমাদের ধর্মীয় কাজ শেষ হয়ে গেল তখন মাল ফেলতে সবাইকে সাহায্য করতে লাগলাম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে

আবহাওয়া শান্ত না থাকলে আমাদের সব চেষ্টাই বৃথা হত। তখন বাতাস প্রায় ছিলই না। সামান্য একটু হাওয়া দিলেই আমাদের চড়ায় আটকানো জাহাজ ভেঙ্গে দুই খান হয়ে যেত। মাস্তুল কাটা হয়ে গেলে আর হালটিকে কোন রকমে সোজা করে সবাই ভেলা বা ঐ ধরণের জিনিষ বানাতে লেগে গেল। এই চরম দুর্দশার মধ্যেও ঝগড়া মারামারি বেঁধে গেল। আমাদের তখন সেই দাঙ্গার মধ্যে গিয়ে ভগবানের দোহাই দিয়ে বোঝাতে হল যে, যে দুর্দশার মধ্যে আমরা রয়েছি সেটা যেন আমরা মনে রাখি। শেষ অবধি অবশ্য দাঙ্গা থেমে গেল। এ সব দেশে সন্ন্যাসী, পুরোহিত প্রভৃতি লোককে সবাই বেশ খাতির করে।

ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল আর ডাঙার দিক থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করল। যদিও বাতাস অত্যন্ত সামান্য ছিল তবুও তাইতেই আমাদের জাহাজ নিচের জমির উপর এমন ধম্ ধম্ করে ধাক্কা মারতে আরম্ভ করল যে আমাদের মনে হচ্ছিল যে এখনই বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে তলিয়ে যাবে। আমার সাথীর তখন মনে এলো যে আমাদের সঙ্গে সালামান্‌কা'র সাধু আমাদের মহিমান্বিত বি, জুয়ান ডি সাগুনের [B. Juan de Sagun] অস্থি আছে। তিনি তখন সেই অস্থি একটি ফিতায় বেধে জাহাজে থেকে জলে ঝুলিয়ে দিলেন। আর এই পবিত্র কাজ দেখে সেই ঈশ্বরের দাসের আর অন্য বেশীর ভাগ লোকের চোখে জল ভরে এলো। ঈশ্বরের অসীম করুণায় আর সেই মহিমান্বিত সাধুর আমাদের জন্য দয়া ভিক্ষার জন্য জাহাজ জোয়ারের জলে ভেসে ডাঙ্গার কাছে বালুর চরে এসে লাগল। আমরা তখন আসন্ন মৃত্যুর থেকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর আর আমাদের মহিমান্বিত সন্তকে ধন্যবাদ দিলাম। আর সেই রাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তার পর দিন যখন পাইলট জানাল যে আমরা আঞ্জেলিম [Angelim, হিজলি তখন উড়িষ্যা রাজ্যের অংশ] রাজ্যের মুস-ন্দলিম [Musundulim, মসনদ-ই-অলি] রাজার দেশে আছি, সেই সময়ের বিবরণ।

রাত্রির অনিশ্চিত ছায়া যখন পশ্চিম দিকে মিলিয়ে গেল আর ঊষার আগমন যখন সূর্যের পূর্বদিকে উদয় ঘোষণা করল তখন আমাদের ক্যাপ্টেন দেশটিকে চিনতে পেরে হুকুম দিলেন যে জাহাজে যত অস্ত্র শস্ত্র আছে সব যেন তৈরি থাকে। তিনি নিজে জাহাজে যত ছোট কামান ছিল সেগুলিকে দাগবার জন্য তৈরি করালেন। কিন্তু বারুদ নিয়ে আসাতে দেখা গেল যে সেগুলির আর ব্যবহারের যোগ্য নেই। কিছু লোক নিজেদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য বোতলে করে বারুদ নিয়ে যাচ্ছিল। সেই বারুদই কাজে লাগাতে হল। এরা বোতলগুলি ডেকের উপর রেখেছিল বলে বারুদ জলে ভেজেনি; কিন্তু এদের সঙ্গে দু'তিন বারের বেশী কামান দাগবার মত বারুদ ছিল না।

আমরা যখন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছি তখন মুসলমানদের দাঁড়টানা বহর দেখা গেল। আমাদের দেখতে পেয়ে তারা দাঁড়টানা থামিয়ে একটা ছোট নৌকাতে শান্তির চিহ্ন হিসাবে একটা সাদা পতাকা লাগিয়ে পাঠিয়ে দিল। আমাদের জাহাজের পাশে এসে তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলবার অনুমতি চাইল। অনুমতি দেওয়াতে তারা তাদের লস্কর অর্থাৎ ক্যাপ্টেন জেনারেলর তরফ থেকে বলল যে আমরা যেন কোন রকম সন্দেহ না করি। কারণ তাদের রাজা হুগলির [Ugulim] পোর্তুগীজদের সঙ্গে যে সন্ধি করেছেন তা তিনি কোন রকমে ভাঙতে বা লঙ্ঘন করতে চাননা। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে তিনি ও তার পূর্ববর্তী রাজারা যে সব শর্ত করেছেন সে গুলি যেন পুরোপুরি মানা হয়। এর মধ্যে একটা শর্ত এই যে যদি কোন পোর্তুগীজ জাহাজ তীরে আটকিয়ে যায় তাহলে জাহাজের মাল সব সেই দেশের রাজার হয়ে যাবে [ভাঙ্গা জাহাজের মালের বিষয়ে এই রকম নিয়ম কালিকট ছাড়া ভারতের সর্বত্র ছিল —ইংরেজি অনুবাদক]। তাছাড়া তিনি শুধু ন্যায্য দাবী, অর্থাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেন, সদাগররা আর পাদরিরা যা মেনে নেবেন. সেই দাবীই করবেন। এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের এই জবাব দেওয়া হল যে আমাদের জাহাজ যখন হুগলি-গামীই ছিল তখন আমরা এই শর্তনামা পালন করব। সর্ব শক্তিমান ভগবানের নামে শপথ করে যে শর্ত করা হয়েছে তা আমারা কখনই ভাঙব না। পোর্তুগীজ জাতি বরং হাজারটি প্রাণ বলি দেবে তবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেনা।

ইতিমধ্যে ভাঁটা এসে যাওয়াতে আমরা জাহাজ ছেড়ে আধ কোমর জলে হেঁটে তীরে উঠলাম। যখন সবাই উঠে এসেছি তখন যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে ফাদার ফ্রাই এমানুএল দেলা এসপেরেন্‌সাকে চিঠি পাঠানো হল। ফাদার এমানুএল ঐ সময় অগষ্টিনীয় সম্প্রদায়ের মিশনের সুপিরিয়র ছিলেন ও সেই সময় হিজলিতে ছিলেন। এই চিঠিটি সাহিবো-সুবা [Saibo Subba] ও অশ্বারোহীদের সেনাপতির হাতে পড়ে। তিনি তিনশ অশ্বারোহী নিয়ে সেই পথে যাচ্ছিলেন। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে পৌছেই তিনি ক্যাপ্টেন আর ফাদারদের ডেকে পাঠালেন। আমরা তিন জনে তাঁর কাছে গিয়ে সাধারণ অভিবাদন ইত্যাদি করতেই তিনি সিন্দুক গুলি আর জাহাজের মালখানার চাবি চাইলেন। ক্যাপ্টেন বললেন যে সিন্দুকগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাদের চাবি মালিকদের কাছে আছে। আর মালখানা, তা জাহাজে তো তাঁর নিজের সৈন্যরাই ভরে গিয়েছে; তিনি (অর্থাৎ ক্যাপ্টেন) যদি অন্য কোন দামী জিনিষ জাহাজ থেকে না এনে থাকেন তাহলে চাবি নিয়ে এসে তিনি কি করবেন।

এই জবাবে সেই মুসলমান ভীষণ রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন যে ক্যাপ্টেন এবং পাদরিদের মধ্যে একজনের মাথা যেন এখনই কেটে ফেলা হয়। তখন তারা ক্যাপ্টেন-কে, আর আমি ক্যাপ্টেনের সব চেয়ে কাছে ছিলাম বলে, আমাকে ধরে ফেলল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম। কিন্তু যখন দেখলাম যে ক্যাপ্টেন হাসছেন আর চটপট মুখোমুখি জবাব দিচ্ছেন তখন আমার খানিক ভরসা হল। এই সময় খুব হৈ চৈ করে এক দল পেয়াদা এল আর আমাদের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে

আর হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে আমাদের নিয়ে চলল। আমাদের এই দশা দেখে আমি ক্যাপ্টেনকে কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নেবার বিষয়ে সান্ত্বনার বাক্য বললাম। তাতে তিনি বললেন যে আমি যেন ঘাবড়ে না যাই, কারণ এ সবই শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্ম। তা যাই হোক না কেন, এই পেয়াদারা আমাদের নিয়ে যেতে যেতে আমাদের সব কাপড় চোপড় কেড়ে নিল ; শেষে আমি শুধু আমার জাঙ্গিয়া পরে ছিলাম। এমনি ভাবে তারা আমাদের আগে থেকে ঠিক করা এক জায়গায় নিয়ে গেল আর তলোয়ার খুলে এমন সব করতে লাগল যে এখনই যদি আমরা টাকা না আনতে পাঠাই তাহলে তারা আমাদের মাথা কেটে ফেলবে।

এই রকম শিষ্ট আমোদে সারা রাত্রি কাটল। শেষে ভোর হবার কিছু আগে আমারা ভেরীর কর্কশ শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ শেষ হতেই একজনের গলা শুনতে পেলাম 'মিলাও মিলাও' অর্থাৎ সন্ধি ও সখ্যতা হয়ে গেছে। এই কথা শোনা মাত্র পেয়াদারা খুব ভদ্রভাবে আমাদের মুক্ত করে দিল আর দূত এসে আমাদের সাহিবো-সুবার তরফ থেকে বন্ধুতার নিদর্শন হিসাবে সিরিপাও অর্থাৎ পানের খিলি দিল। আমাদের তখন সাহিবো-সুবার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি আমাদের জন্য টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, আমাদের তিনি খুব আদর করে খাবারের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সেই টেবিলে সূর্য উঠবার এক ঘণ্টা পর অবধি ছিলাম।

ইতিমধ্যে ফাদার ফ্রাই মানুএল রাজার কাছ থেকে ফর্মান অর্থাৎ আমাদের মুক্তি দেবার জন্য হুকুম নিয়ে এসে পৌছলেন। তিনি ক্যাপ্টেন ও পাদরিদের জন্ম নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজান ডুলিও আনিয়েছিলেন। এই ডুলিগুলি বড় নয়। এতে একজন বসে বা পা গুটিয়ে শুয়ে যেতে পারে। চার জন লোক কাঁধে করে এগুলি নিয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে কিছু মেয়ে লোক থাকাতে আমরা ডুলিগুলি তাদের দিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। আর সেখান থেকে তিন লীগ [প্রায় পনর কিলোমিটার] আমাদের হেঁটে যেতে হ'ল। আমারতো তিন লীগ মনে হচ্ছিল যেন তিনহাজার লীগ কারণ দেশটা একেবারে সমতল আর জলা মতন। রাস্তায় এত জল আর কাদা যে আমরা কেবল কাদায় আটকে যাচ্ছিলাম। আর অনেক জায়গায় জল ছিল প্রায় এক কোমর।

এই সব অসুবিধা থাকা সত্বেও সেদিনই বেশী রাত্রে আমরা শহরে পৌছে গেলাম। মুসল্লিমের প্রধান কর্মচারীরা কিন্তু আগে থেকেই সকলের থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আমরা গেলাম আমাদের গির্জা আর বাসস্থানে। গির্জা দেখার পর প্রথম কাজ হল বাগানের পুকুরে গিয়ে আমাদের কাদার বোঝা ধুয়ে ফেলা। তার পরদিন সকালে এখানকার ছোট নবাব [Princeling] আমাদের উপহার পাঠালেন। একে এরা আদিয়া বলে। এই উপহারের মধ্যে ছিল দুটি ভেড়া আর দুটি টাকা অর্থাৎ স্পেনের মুদ্রায় এক পেসো। এদেশে এরকম ধরণেই উপহারের সঙ্গে রাঁধবার সামগ্রী কেনবার দাম না পাঠালে অভদ্রতা বলে মনে করা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হুগলি শহরে যাবার অনুমতি পাবার আগে অবধি হিজলীতে আর কি কি ঘটল তার বর্ণনা।

আমাদের হিজলিতে পৌঁছবার তুদিন পরে মুসন্দলিম ফাদার ফ্রাই এমানুএলকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন যে জাহাজের ক্যাপ্টেন, আর সদাগরদের যেন তার পর দিন, তাঁর সামনে হাজির করা হয়। এই হুকুম অনুসারে তার পর দিন অর্থাৎ আমরা এসে পৌঁছবার তৃতীয় দিনে আমরা সবাই ক্রুয়া [droua = দ্বার ?] অর্থাৎ নির্দিষ্ট ঘরে জড় হলাম। এইখানেই সাধারণতঃ সাক্ষাৎ হয়। ঘরটিতে ভাল কার্পেট বিছানো। ঘরের একটি জায়গা মুসন্দলিমের জন্য আলাদা করে সাজান। একটি রেশমী চাঁদোয়ার তলায় আসনে তুটি সিলিকের, অর্থাৎ সোনা আর রূপার জরির কুশনের উপর রেশমের নানা রকম ফুল তোলা। এই সব দামী কুশনের মাঝে একটি চকচকে সাদা স্বচ্ছ মসলিনের বালিশ। মসলিনের তলায় লাল কাপড়ের আভা একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। সাদা আর লাল আভায় মিশে একটা চমৎকার আর মনোহর পরিবেশ হয়েছিল। এই কুশনগুলি সেই অর্ধ মহামান্যের হেলান দিয়ে বসবার জন্য।

আমাদের ক্রুয়াতে তু ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করতে হল। আমাদের সঙ্গে কিছু মির্জাও ছিলেন। এঁরা এখানকার অভিজাত ব্যক্তি। এমন অবসরে এঁরা চুপচাপ বসে না থেকে দাবা খেলেন। একজন চাকর ঘুঁটিগুলি নিয়ে এল। এদের ছক রেশম বা কাপড়ের তৈরি। আমাদের দেশের মত কাঠের ভারী আর অসুবিধাজনক নয়। এদের ছক যেখানে ইচ্ছা পাতা যায়। আমরা অবশ্য কৌতুহলী দর্শক মাত্র ছিলাম। কয়েকটা ভাল মাত দেখলাম। সত্যই এই বিদেশীরা এই খেলায় বেশ নিপুণ।

ঠিক এই সময় আমরা বতীচা অর্থাৎ ধাতুর তৈরি থালা পেটার জোর শব্দ শুনতে পেলাম। এই শুনে সবাই সেই ক্ষুদে রাজাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়াল। আমরাও খানিক এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কয়েকজন নকীব রূপার দণ্ড হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি আসতেই ফাদার এগিয়ে গিয়ে মাথা নত করে তাঁকে অভিবাদন করে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি হাসিমুখে আর বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে আমাদের গ্রহণ করলেন। তিনি যখন ক্রুয়ার দিকে গেলেন আমরাও তাঁর পিছু পিছু গেলাম। নিজে বসবার পর তিনি আমাদের সর্দারদের মধ্যে বসতে বললেন। এসব দেশে নিয়ম হল মাটি, কার্পেট, কম্বল বা বেতের মাতুরের উপর পা মুড়ে বসা।

আমরা যখন এই রকম ভাবে সবাই বসেছি তখন রাজা আমাদের ইণ্ডিয়া [গোয়া ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ] আর ভাইসরয় [পোর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি-ডোম ফ্রানসিসকো ডে গামা] সম্পর্কে বিভিন্ন খবর জিজ্ঞাসা করলেন। এসব শোনা হয়ে গেলে তিনি তুজন মহাপাত্র অর্থাৎ যাকে আমরা রাজসংসারের পরিচালক বলব, তাদের ডেকে পাঠালেন। এঁরা আসবার পর তিনি ক্যাপ্টেন, পাদরিদের আর প্রধান সর্দারদের ডেকে বললেন যে জাহাজের মালের ব্যাপারে যেন আমরা সর্বসম্মতিতে একটা নিষ্পত্তি করে দিই। এর পর তিনি আমাদের বিদায় দিলেন। মহাপাত্ররা প্রথমেই

জাহাজে বোঝাই করা মালের ফর্দ চাইলেন। এগুলি তখনই আনতে পাঠান হল, আর তাঁরা এগুলি সময় মত ভাল করে পড়ে দেখবেন বলে নিয়ে গেলেন। এগুলি বারবার করে পড়ে তাঁদের নিজেদের মর্জি মত এক রায় দিলেন। এই সব বিদেশীরা যদি হুগলির পোর্তুগীজদের উপর নির্ভর করে না থাকত তাহলে এই রায় আমাদের আরও বিরুদ্ধে যেত। এই সব এশিয়ার জাতিরা দেখেছি শুধু নিজেদের বিশেষ সুবিধাটুকু বোঝে।

ইতিমধ্যে যাদের এখানে কোন কাজ ছিলনা তারা হুগলি রওনা হয়ে গিয়েছিল। বাকিরাও সেই পথে যাবে ঠিক করেছিল। এমন সময় এক জলবদার অর্থাৎ নবাবের (ঢাকার রাজপ্রতিনিধি) একজন দূত মুসন্দলিমকে খবর দিতে এল যে তিনি যেন বুঝে সুঝে কাজ করেন কারণ জাহাজে মাল ছিল আট লক্ষ টাকার, অর্থাৎ যা স্পেনের চারশ হাজার পেসোর সমান। আর তাঁর যেন মনে থাকে যে এর অর্ধেক নবাবের। হিজলির রাজ্য নবাবের অধীন ছিল, তাই রাজা খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। কারণ মুঘল সরকারের ভিত্তিই হল অত্যাচার আর হিংসা। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থে ঘা লাগলে কেউ ন্যায় অন্যায়ের খোঁজ রাখেনা। তাই রাজা নবাবকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করবার জন্য জাহাজের মালের ফর্দ আর ক্যাপ্টেন, পাদরি এবং সদাগরদের সঙ্গে মহাপাত্রদের যে চুক্তি হয়েছিল সেটাও তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন। নবাবকে আরও বেশী সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি ঠিক করলেন যে ঐ জাহাজেই যে পাদরিরা এসেছেন তাঁদের একজনকেও ঢাকায় পাঠাবেন।

ফাদার ম্যানুএলের এক খোজা বন্ধু প্রাসাদেই থাকত। সে ফাদারকে এই খবর দেয়। এই খবর পাবা মাত্র ফাদার একটি পোরচা তৈরি করবার হুকুম দিলেন। পোরচা এক ধরণের নৌকা। ডিঙ্গির মত ওদেশে হামেশাই দেখা যায়, তবে ডিঙ্গিগুলি বেশী ছোট। পোরচাতে খুব বলিষ্ঠ দাঁড়ী ছিল। রাত্রে ফাদার আমাদের চুপিচুপি সেই নৌকাতে চাপিয়ে দিলেন। আমাদের সঙ্গে বন্দুক টন্দুক নিয়ে চার জন পোর্তুগীজ আর দুজন দাস ছিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি আর খুব চুপিচুপি রওনা হয়ে নদী বেয়ে সমুদ্রে এসে পড়লাম। [হিজলি নদী যেখানে ভাগীরথীতে এসে পড়েছে সেখানে এত চওড়া যে তাকে সমুদ্র বলা চলে।] প্রায় তিন লীগ ধরে বেশ স্রোত পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নদী জলে ভরা গঙ্গায়—হুগলি শহর থেকে এই জায়গা প্রায় ষাট লীগ দূরে।

আমাদের পথ ছিল উজান বেয়ে, যার মানে বাঙ্গালা আর হিন্দুস্থানী ভাষাতে স্রোতের উল্টো দিকে। এরকম যাওয়া বেশ কষ্টকর আর একঘেয়ে। তবে দুধারে অনেক গ্রাম আর বসতি, আর তাদের মধ্যে অনেকগুলিই হুগলির পোর্তুগীজদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম যে শহরে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী। মুরগী, খাসী (এদেশের লোক খাসীর মাংস ভেড়ার মাংসের চেয়ে বেশী পছন্দ করে) ইত্যাদি তো আছেই, তাছাড়া প্রচুর বাছুরের মাংস, পায়রা ও অন্যান্য পাখী, নানা রকমের চাল,

ঘি, দুধের তৈরি খাবার আর ও দেশের মিষ্টিও প্রচুর। এ দেশে চিনি খুব সুলভ।

এই সব গাদা গাদা খাবার ছাড়া এখানে নানা রকম ফলও পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল আম। আম এমন সুস্বাদু আর চমৎকার ফল যে পুরাকালের পদ্যলেখক এবং কবিরা যদি আমের কথা জানতেন তাহলে তাঁরা আমকে তাঁদের দেবতাদের অমৃত ইত্যাদির চেয়ে উপরে স্থান দিতেন। অতিশয়োক্তি করছি না, আমি দাবী করে বলতে পারি যে আম ইয়োরোপের সব চেয়ে ভাল ফলের চেয়ে কম নয়। এগুলি দেখতে ডিম্বাকার, তবে অনেকগুলি একেবারে গোল। যেগুলি বড় সেগুলি দু তিন বছরের শিশুর মাথার মতন বড়, আর খুব ছোটগুলি হাঁসের ডিমের মতন হবে। এদের রং সাধারণতঃ ঘোর সবুজ, তবে অনেকগুলিতে ফিকে হলদে আর গোলাপী মিলে বেশ চমৎকার দেখতে হয়। এই শেষেরগুলিতে একটা মৃদু সুগন্ধ থাকে। ফলের শাঁস খড়ের রঙের। আমের খোসা আপেলের খোসার চেয়ে মোটা। আর খোসা ও বিচি ফেলে দিয়ে এই ফল খেতে হয়।

এই রকম ভাবে আমাদের কষ্ট কিছু সহনীয় করে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের হুগলিতে আনলেন। এখন আমাদের পাদরি ভ্রাতারা আর অন্য পোর্তুগীজরা আমাদের পরম আদরে গ্রহণ করলেন। এই আদর তাঁরা শুধু পোর্তুগীজদেরই দেন না, অন্য ইয়োরোপীয় জাতির লোককেও দেন। [মানরিক এখানে সত্য কথা বলেন নি। ইয়োরোপের অন্য জাতির লোকেরা পোর্তুগীজ এলাকায় যেতে হলে নিজেদের নাম বদলিয়ে পোর্তুগীজ নাম নিয়ে যেত। কারণ পোর্তুগীজরা সমানে চেষ্টা করত যে অন্য জাতির লোকেরা না তাদের একচেটে ব্যবসা ও মিশনারী কাজে ভাগ বসায়—ইংরেজ অনুবাদক।] আমরা টলেন্টিনোর সেন্ট নিকোলোসের মঠে [এই মঠ ব্যাণ্ডেলের প্রধান গির্জার সঙ্গে যুক্ত] উঠলাম। সেখানেও আমরা সেই সদয় ব্যবহারই পেলাম যা এই সব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক অন্যের প্রতি করতে অভ্যস্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাতে হুগলি শহরের ও এই শহর স্থাপনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে।

আগেই বলেছি যে হুগলি শহর গঙ্গার ধারে সমুদ্র থেকে ষাট লীগ দূরে অবস্থিত। এই শহর স্থাপন করেন কয়েকজন পোর্তুগীজ ব্যবসায়ী। তখন সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি। এই ব্যবসায়ীরা ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গা থেকে মাল বোঝাই জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য শুধু মাল বেচা নয়, এখানকার জিনিস কিনে রপ্তানি করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তাঁরা তাঁদের মাল নাবিয়ে বড় বড় গোলা বা গুদাম ঘর তৈরি করেন। গুদামগুলি এক রকম শক্ত বেতের তৈরি চাটাই দিয়ে আলাদা আলাদা ঘরে ভাগ করা। এই বেত ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গায় পাওয়া যায় আর এদেশের লোকেরা একে বাম্বুস [bambus, বাঁশ] বলে। এই ঘর-

গুলিতে খড়ের চাল বানিয়ে তাঁরা বর্ষার পাঁচ ছয় মাস কাটাতেন, অর্থাৎ যতদিন না বাড়ী ফেরবার ভাল আবহাওয়া আসে। এই ভাল ঋতুর নাম স্থির মনসুন, আর যতদিন না এই মনসুন আসে তাঁরা এইখানেই জিনিষপত্র কেনা বেচা করে ব্যবসা করতেন। ঠিক সময় এলে তারা চলে যেতেন।

এই ব্যবসাতে এত লাভ হত, আর দেশটি এত সমৃদ্ধিশালী ও উর্বর যে সেই লোভে পড়ে কয়েক বছর পরে এঁদের মধ্যে কয়েকজন এই দেশে দু এক বছর করে থেকে যেতে আরম্ভ করেন। এতে দেশী লোকদের, যারা বেশীর ভাগই ধর্মহীন, তাদের কোন আপত্তি ছিল'না। আর মুসলমান শিকদার যে জেলাটিকে শাসন করতেন তার তো একেবারেই আপত্তি ছিলনা। এই লোকটির কয়েকজন পোর্তুগীজের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায়ই ওদের খেতে ডাকত। একে ওদের দেশে মেহমানী বলে। এমন কি সে ওদের ওখানে বসবাস করতেও অনুরোধ করেছিল, আর বলেছিল যে তারা যদি চায় তো পাদরি আনিয়ে, আর গির্জা বানিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের সব আচার পালন করতে পারে। পোর্তুগীজরা এই সব কথায় খুশী হলেও বাইরে তা প্রকাশ করেনি। তাদের আশা ছিল যে তাদের এই অনুরোধ পাদশা বা অন্তত পক্ষে ঢাকার নবাব, যাঁর এলাকায় ঐ প্রদেশ অবস্থিত, তাঁর তরফ থেকে আসবে। ইতিমধ্যে তারা অবশ্য তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলো আমদানি করা জিনিস বেচে তারা বেশ ভাল দাম পেত।

এই সব জিনিসের বেশীর ভাগই দক্ষিণ [সুমাত্রা, মালাক্কা, প্রভৃতি] থেকে আমদানি করা। কেবল কড়ি অর্থাৎ সামুদ্রিক ঝিনুক আসত মালডিভ থেকে, শঙ্খ আসত টুটিকোরিন আর মৎস্য উপকূল [তিনেভেলীর সমুদ্রতীর যেখানে মুক্তা পাওয়া যায়, তাকে মৎস্য উপকূল বলা হত] থেকে, গোলমরিচ আসত মালাবার থেকে আর দারচিনি আসত সিংহল থেকে। শেষের দুটি দ্রব্যের এক চেটে ব্যবসায়ের অধিকার মহামহিম পোর্তুগালের রাজার নিজের। তাই তার আদেশে অন্যদের এই দুটি জিনিষ রপ্তানি করা নিষেধ। তবুও এরা, বিশেষ করে কোচিনের ব্যবসায়ীরা চুরি করে এগুলি রপ্তানি করে।

পোর্তুগীজরা দক্ষিণ ইণ্ডিয়া থেকে যে সব জিনিস আমদানি করে তার মধ্যে প্রধান হল নানা রকমের কাজ করা রেশমী কাপড়। এগুলি হল ব্রোকেড, রেশম মেশান ব্রোকেড, ভেলভেট, দামাস্ক [রেশমের উপর উঁচু করে ফুল তোলা], মসলিন ইত্যাদি। এ সবই চীন দেশে তৈরি। এগুলি কালো বাদে আর সব রঙের হয়। কালোকে এরা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে মনে করে, আর কিছু ফকির যারা দেখাতে চায় যে তারা সংসারকে অবজ্ঞা করে, তারা ছাড়া কেউ কালো কাপড় পরেনা। পোর্তুগীজরা চীন থেকে অনেক চীনেমাটির বাসন আর সোনার পাত লাগান জিনিস পত্র যেমন খাট, টেবিল, বাক্স, সিন্দুক, লেখবার ডেক্স ইত্যাদি সৌখিন জিনিস আমদানি করে। এরকম জিনিস চীনে অনেক পাওয়া যায়। এরা চীন থেকে ইয়োরোপীয় কায়দায় মুক্তা আর দামী পাথর বসান গয়নাও আনায়। এগুলির কাজও ভাল আর দামও অনেক কম। চীন সাম্রাজ্যে অনেক মজদুর, তাই সেখানে মজুরী কম।

সোলার আর তিমোর রাজ্য থেকে পোর্তুগীজরা অনেক সুগন্ধি চন্দন কাঠ আনায়। এই কাঠ লাল আর সাদা দুরকমই হয়। সোলার রাজ্য হল ডোমিনিক সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। এই পবিত্র সম্প্রদায়ের পাদরিরা সেখানে ধর্মপ্রচারে বেশ সাফল্য লাভ করেছেন। এই কাজে অনেক পাদরিরা নিজেদের প্রাণ অবধি বিসর্জন দিয়েছেন। ধর্ম বিদ্বেষের দরুণ তাঁদের হত্যা করা হয়। এ সব কথা ঐ দেশের ইতিহাসে লেখা আছে।

পোর্তুগীজরা মলুকা দ্বীপ আর বান্দা থেকে লবঙ্গ, জায়ফল আর জয়িত্রি, আর বোর্ণিও দ্বীপ থেকে দামী কর্পূর বাঙ্গালাদেশে আমদানি করে।

এই সব ওষুধ আর জিনিসপত্র, বিশেষ করে যেগুলি বেশী দামী সেগুলিকে এদেশের সদাগরেরা অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা আগ্রার দরবারে নিয়ে যায়। পাদশা সাধারণতঃ সেখানে থাকেন। এর মধ্যে কিছু জিনিস তার সামনে আনা হয়। পোর্তুগীজরা হুগলী বন্দরে পৌছে গেছে শুনে তিনি ঢাকার নবাবকে এক হুকুম পাঠান যে সাতগাঁও দেশের পোর্তুগীজদের প্রধানদের মধ্যে দুজনকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের ভ্রমণের জন্ম সব রকম আরাম ও সুবিধার ব্যবস্থাও যেন করা হয়। নবাব এই হুকুম পাওয়া মাত্রই একজন মির্জাকে দুজন পোর্তুগীজকে আনতে পাঠান। পথ খুব দীর্ঘ, আর যদিও তিনি গঙ্গা বেয়ে আর সবচেয়ে দ্রুতগামী নৌকা অর্থাৎ জেলিয়া (এতে এক এক দিকে আঠার জন করে দাঁড়ী থাকে) করে গিয়েছিলেন, তবু তাঁর পৌছতে আঠাশ দিন লেগে গিয়েছিল। তিনি যখন হুগলি পৌছলেন তখন পোর্তুগীজরা কেউ সেখানে ছিল না। কেউ চলে গিয়েছিল মলাক্কাতে, কেউ বা চীন আর কেউ কেউ ইণ্ডিয়াতে।

মির্জা এতে বেশ নিরাশ হয়ে পড়েন, আর নবাবতো তার চেয়েও বেশী। নবাব অবশ্য আর কোন উপায় নেই দেখে মির্জাকে এক কড়া আদেশ পাঠান যে তিনি যেন দরবারে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলেন। আর পাদশাকে পোর্তুগীজদের ফেরার সম্বন্ধে যেন এই আশ্বাস দেন যে তারা এখানকার কিছু ব্যবসায়ীকে নানা রকম জিনিস কেনবার জন্ম দুলক্ষ টাকা আগাম দিয়ে গেছে। এই সব জিনিস হল কাপড়, ঘাসের তৈরি জিন্‌ঘম [gingham, একরকম ঘাসের (পাটের ?) তৈরি কাপড়], নানা রঙের, রেশম, তা ছাড়া চিনি, ঘি, চাল, নীল, বড় লঙ্কা, শোরা মোম, আর অন্য অনেক জিনিস; এই গাঙ্গেয় প্রদেশ এমনি প্রাচুর্যে ভরা। পোর্তুগীজরা যে সব জিনিসের ব্যবসা করত তার মধ্যে প্রধান কতগুলি হল খুব দামী কাজ করা কাঁথা, বিছানা-ঢাকা, শামিয়ানা, আর অন্য সব অদ্ভুত জিনিস যাতে শিকারের ছবি নক্‌শা থাকে আর এ দেশে তৈরি হয়। মির্জা যেন পাদশাকে আশ্বাস দেন যে পোর্তুগীজরা এই সব জিনিস নিতে পরের বছর আসতে বাধ্য হবে। এই সব কথায় পাদশা মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেও তিনি নবাবকে জানাতে ছাড়েননি যে তাঁর কর্তব্যে অবহেলা হয়েছে। এই আর অন্য কিছু তিরস্কারে নবাব এত মর্মাহত হন যে তিনি কিছু দিন পরেই মারা যান। [বোধহয় ঢাকার সুবেদার খানজাহানের কথা বলা হচ্ছে। এই ঘটনা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের হতে পারে। সেই বছর খানজাহান ঢাকার সুবেদার নিযুক্ত হন। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।]

পরের বছর হুগলি বন্দরে প্রথম জাহাজ আসে ইণ্ডিয়ার গোয়া নগর থেকে। এই

জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মালিক ছিলেন গোয়ার তাভারেস [Tavares]। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত এবং রাজনীতি আর সরকারী কাজে অভিজ্ঞ লোক। জাহাজ থেকে নামতেই তাঁকে খুব আদর যত্ন করে অভ্যর্থনা করা হল। তৎক্ষণাৎ ঢাকার নবাবকেও খবর পাঠান হল আর তিনি খবর পেয়েই একজন জেলভীদার [Gelvidar] অর্থাৎ হুকুম-বাহককে দিয়ে সাতগাঁ আর হুগলির শিকদারদের আদেশ পাঠালেন যে পোর্তুগীজরা যদি ফিরে যাবার চেষ্টা করে তাহলে যেন তাদের আটকান হয়। আর তারা যেন এই রকম ব্যবহার করেন যে পোর্তুগীজরা বুঝতে না পারে যে তাদের আটকান হচ্ছে। তিনি তাদের দরবারে পাদশার কাছে ব্যবস্থা করছেন ; ইতিমধ্যে যেন পোর্তুগীজদের সঙ্গে যথাসাধ্য ভদ্র ব্যবহার আর তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। শিকদারদের অবশ্য পোর্তুগীজদের আটকাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করতে হয়নি, কারণ তাদের কম পক্ষে পাঁচ মাস সেখানে থাকতেই হত। তাই শিকদারদের কাজ ছিল পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পোর্তুগীজদের খুশী রাখা।

এই অবসরে সেই মির্জা যিনি আগের বছর এসেছিলেন তিনি কিছু কোসা অর্থাৎ খুব হাল্কা নৌকা আর দুটো পটলা অর্থাৎ মালবাহী নৌকা নিয়ে এলেন। পটলা গুলির ডেকে কেবিন বানান ছিল। কেবিনের দেওয়াল মাটির তৈরি, আর হাল্কা রাখবার জন্য ছাদ খড়ের। ছাদের নীচের কাঠামো বাঁশের তৈরি। এগুলি খুব কায়দা করে বানান। আমি আগেই বলেছি যে বাঁশ এক রকম শক্ত বেত ; এ দেশের অনেক জায়গায় জন্মায়। বাঁশগুলিকে নানা রকমের রঙ আর গালা দিয়ে রঙ করা হয়। উপরের ছাদ এবং এই কাঠামোর মাঝখানে অনেক রঙের তালপাতার চাটাই লাগান হয়। চাটাইগুলির উপর আবার অনেক রকমের ছবি আঁকা থাকে যে যেমন খরচ করতে পারে সেই হিসাবে। তাই এই ছাদগুলিকে খুব সুন্দর আর পরিষ্কার দেখায়। মির্জা যেই নৌকা থেকে নামলেন অমনি শিকদার এসে তাঁকে যথাবিহিত সম্মান করে অভ্যর্থনা করলেন। এই সব অনুষ্ঠান হয়ে গেলে মির্জা তাভারেসের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাভারেস আগে থেকেই সেখানকার সব পোর্তুগীজদের জড়ো করে তাঁর বাড়ি থেকে কিছু এগিয়ে মির্জাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। মির্জা আসতেই জাহাজ থেকে আনা ছোট কামান আর বন্দুক ছুঁড়ে তাঁকে সম্মান জানান হল। এই অভ্যর্থনা হয়ে গেলে আর সবাই বসলে পর মির্জা সম্রাটের ফরমান বা আদেশ পড়বার হুকুম দিলেন। এতে পাদশার এই আজ্ঞা ছিল যে দুজন প্রধান পোর্তুগীজ যেন তাঁর সামনে উপস্থিত হন ; আর তিনি তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবেন। তাতে ক্যাপ্টেন তাভারেস বললেন যে তাঁরা সবাই যেতে তৈরি আর তাঁরা খুশী হয়েই সম্রাটের হুকুম তামিল করবেন, তবে মির্জা যে দুজন প্রধান পোর্তুগীজকে বেছে নিতে চান সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই যে তারা সবাই সমান পদের। তাতে সেই মুসলমান জবাব দিলেন যে দুজনের মধ্যে একজন তাভারেস নিজেই, আর বাকি যত জন ইচ্ছা লোক সঙ্গে নিয়ে যাবার ভার তিনি তাভারেসের উপরই ছেড়ে দিচ্ছেন। অতএব ক্যাপ্টেন তিন জন পোর্তুগীজ আর এক দল চাকর বেছে নিলেন। লোক বাছাই করলেন শুধু

ভাল চেহারা আর তাদের কাপড় চোপড়ের চাকচিক্য এবং জাঁক জমক দেখে। মুঘলরা পোর্তুগীজদের সম্পর্কে আসবার আগে ভাবত যে এ বিষয়ে তারাই বুঝি শ্রেষ্ঠ। কারণ সব মুসলমান জাতির মধ্যে মুঘলরাই নিজেদের কাপড় চোপড়, বা বাড়ি সাজান বা ভাল খাওয়ার জন্য এই রকম লোক দেখানো বেশী খরচ করে।

সব তৈরি হয়ে গেলে তাঁরা নৌকাতে গঙ্গা বেয়ে দুমাসে পাটনা নগর পেঁছিলেন। সেখানে ডাঙ্গায় নেমে তারা আগ্রা নগরে দরবারে গেলেন। [বোধহয় ফতেপুর সিক্রী হবে। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সেখানেই ছিলেন।] পাদশা তাঁদের সাদরে আর সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। ক্যাপ্টেন তাভারেসের সঙ্গে কথা বলার পর পাদশা তাঁকে খুব পছন্দ করেন। তাভারেস সকৃতজ্ঞ হয়ে তাঁকে কথা দেন যে তিনি হুগলিতে এসেই থাকবেন। আর অন্য পোর্তুগীজদেরও তাঁর সঙ্গে আনবেন। মহামহিম সম্রাট তাভারেসের এই কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অনেক দামী উপহার দেন। এই উপহারকে এদেশে শিরোপা বলে। তাছাড়া সম্রাট আদেশ দিলেন যে তাভারেসকে যেন একটি ফর্মান বা চিঠি দেওয়া হয় যাতে তিনি যেখানে ইচ্ছা নগর পত্তন করতে পারবেন আর তার কাছাকাছি জমির অধিকারও তিনি পাবেন। নবাবকে আর উল্লিখিত শিকদারদের আদেশ পাঠান হয় যে বাড়ি বানাবার জন্য যা কিছু দরকার তা যেন পোর্তুগীজদের দেওয়া হয়। এই ফর্মানেই পাদরিদের গির্জা ও মঠ বানাবার অধিকার, ও যে সব ধর্মহীন লোক আঞ্জিল [Angil] অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্মের সুসমাচার গ্রহণ করতে চায় তাদের বিনা বাধায় বাপ্টাইজ করবার অধিকার দেওয়া হয়। এই সব সুবিধাজনক দস্তাবেজ নিয়ে তাভারেস ফিরে এলেন।

সম্রাটের কাছ থেকে এই সম্মান ইত্যাদি পেয়ে তাভারেস যখন হুগলি ফিরলেন তখন দেশী লোকেরা তাঁর প্রায় পূজা করা আরম্ভ করল। [তাভারেস অকবর-নামাতে লিখিত পরতাব বার [Partab Bar-Pero Tavarez] হতে পারেন।] তাভারেস দেখে শুনে একটি উপযুক্ত জায়গা বেছে নিলেন। আর মনসুন শেষ হতেই গোয়ার ভাইসরয় আর কোচিনের বিশপ, যাঁর এলাকায় তখন বাঙ্গালা দেশ পড়ত, তাঁদের চিঠি পাঠালেন। কোচিনের বিশপ সেই সময় ছিলেন মাইনোরিটি সম্প্রদায়ের মহামাননীয় ডন ফ্রে আন্দ্রেস। ভাইসরয় তাঁকে বাঙ্গালা দেশের জন্য পাদরি বাছাই করবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন যে এই অঞ্চলে মিশনের কাজ মহান সেণ্ট অগস্টিন সম্প্রদায়ের পাদরিদের দেওয়া হোক।

ভাইসরয় ও প্রাদেশিক প্রধান পাদরিকে তখন আজ্ঞা পাঠান হল যে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য তাঁরা যেন ঠিক লোক বাছাই করেন। এই আদেশ অনুসারে প্রাদেশিক পাদরি তখন ফ্রে বার্ণাডো দে জিসাস নামে একজন সাধুপ্রকৃতির পাদরিকে প্রধান ও তাঁর অবর্তমানে ফ্রে জুয়ান দেলা ক্রুজ নামে একজন বিদ্বান ও চরিত্রবান পাদরিকে বাঙ্গালা দেশে কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। তিন জন অন্য পাদরিও তাদের সাথী হন। তাঁরা কোচিনে পৌছিয়ে বিশপের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি সমাদরে তাঁদের গ্রহণ করেন। যখন তাঁদের বাঙ্গালা দেশ রওনা হবার সময় হয় তখন

তিনি ফাদার ফ্রে বার্ণাডো কে ভাইকেরিও দেলা ভেরা নিযুক্ত করে তাঁকে সব সাধারণ ক্ষমতাদি প্রদান করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা রাজ্যে অগষ্টিণিয়ান সম্প্রদায়ের পাদরিদের আগমন।

প্রাচীন কালে জয়মাল্য পরে সীজরের আগমনে রোমের লোকেরা যেমন উল্লসিত হত, চার্চের স্বর্গীয় সূর্যরূপী মহান ফাদার অগষ্টিনের প্রকাশে গঙ্গার তীরের লোকেরা তার চেয়ে অনেক বেশী উল্লসিত হয়েছিল। সীজর শত্রুর কাছ থেকে লুটে সেই দেশকে (রোমকে) ঐশ্বর্যপূর্ণ করতেন, আর এই সব পাদরিরা এসেছিলেন মানুষ মাত্রের শত্রুর কাছ থেকে জেতা লুট দিয়ে এই অবিশ্বাসে ভরা রুক্ষ দেশকে সুফলা করতে। তাই যখন সুসমাচারের সম্ভার নিয়ে দূতেরা এসে পৌছলেন তখন পোর্তুগীজ, মূর আর এদেশের লোকেরা সবাই তাঁদের অভ্যর্থনা করল। অবশ্য প্রত্যেকেই নিজেদের স্বার্থে। খ্রীষ্টানরা যে তাদের ধর্মের নেতাদের সাদরে অভ্যর্থনা করল সেটা তাদের কর্তব্য। আর ধর্মহীনরা তাঁদেব অভ্যর্থনা করল এই জন্য যে তারা জানত যে পাদরিরা না এলে খ্রীষ্টানরা এদেশে থাকবেনা। সকলেই এক সাথে মিলে গির্জা আর মঠ বানাবার কাজে লেগে গেল, আর কিছুদিনের মধ্যেই সব মাল মশলা জড় হয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এই আদি গির্জার ভিত্তি স্থাপন হল সেই দিনই [১৫ই আগষ্ট] যেদিন স্বর্গের সম্রাজ্ঞী স্বর্গে বিজয় প্রবেশ করেন (Feast of the Assumtion of the Virgin), যে বিজয় তিনি বহু আত্মাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়ে লাভ করবেন এটা যেন তারই সূত্রপাত। এই আত্মারা পুতুল পূজার ঘৃণিত শিক্ষায় বা প্রফেট মাহোমার [Mahoma] মিথ্যা শিক্ষায় বন্দী ছিল। এদের উদ্ধার করা হবে সুসমাচারের অজেয় অস্ত্র দিয়ে।

খুব শীঘ্রই এই ঈশ্বরের দাস ও তাঁর দ্রাক্ষাকুঞ্জের কর্মীরা বুঝতে পারলেন যে তাঁদের এক জায়গায় থাকা চলবেনা। দুজন তখন ঐ নতুন বসতির কাজে লেগে রইলেন, আর বাকি তিনজন কাছাকাছি এলাকায় ঈশ্বরের বাণী বপন করতে চললেন। ইতিমধ্যে তাঁরা ইণ্ডিয়ার প্রাদেশিক পাদরিকে আরও লোক পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

এই নতুন বসতির সুনাম শীঘ্রই ইণ্ডিয়ার বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল, আর অনেক পোর্তুগীজ এবং দেশী খ্রীষ্টান সেখানে আসতে লাগল। কিন্তু যে সব লোক এল তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই খুব গরীব, আর পোর্তুগীজ যারা আসত তারা অধিকাংশই ডাকাত বা অসৎ চরিত্রের লোক।

এই ধরণের লোকেতেই শহর ভরতি থাকত। ক্যাপ্টেন সবাইকে সাহায্য করতেন, কাউকে টাকা দান করে, কাউকে ধার দিয়ে আর কারও জন্য বা জামিন দাঁড়িয়ে। সবাই এরা ব্যবসা করতে আরম্ভ করে আর কিছু দিনের মধ্যেই হুগলি প্রাচ্য দেশের ধনী শহরের মধ্যে অন্যতম হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের প্রাদেশিক পাদরি যখন জানতে পারলেন যে তার পাঠান পাচ জন কর্মী

কি রকম ভাল ভাবে ঐ সব ধর্মহীনদের মধ্যে ফল আহরণ করছেন, তখন তিনি পরের মনসুনে পাঠাবার জন্ম কোচিনেরই কিছু লোককে নিযুক্ত করলেন। তিনি আরও সাত জন পাদরিকে পাঠিয়ে দিলেন আর এঁদের সাহায্যে প্রভুর দ্রাক্ষাকুঞ্জের কাজ আরও ছড়িয়ে পড়ল। এঁরা হিজলি [Angelim] জেলাতে আরও দুটি গির্জা বানালেন, একটা ঐ শহরেই আর একটি ব্যাণ্ডেল বা বন্‌জা গ্রামে। [পোর্তুগীজরা নিজেদের প্রায় সব বসতিকেই ব্যাণ্ডেল বলত। ইউলের মতে বন্‌জা হচ্ছে কাঁথী]। এই গ্রামে বহু ব্যবসায়ী চিনি, মোম, আর জিংঘমের ব্যবসা করত। যেমন আগেই বলেছি জিংঘম, ঘাস আর রেশমের তৈরি একরকম কাপড়; খুব হাল্কা আর গরম কালে পরতে বেশ আরাম।

সেই বছরই আমাদের অগস্টিনীয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন পাদরি উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই দেশ কটকের নবাবের শাসনাধীন। তাঁর কাছ থেকে তাঁরা পিপলিতে গির্জা ও বাসস্থান বানাবার ও অন্য কয়েকটি কাজ করবার অনুমতি পান। এর আগে থেকেই পিপলি বন্দরকে ইণ্ডিয়ার লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বেশ পছন্দ করত।

আরও কিছু কাল পরে আমাদের সম্প্রদায়ের পাদরিরা দেশের ভিতরকার অন্যান্য রাজ্যে প্রবেশ করে শেষে ঢাক [Daack] বা পোর্তুগীজরা যাকে ঢাকা [Daca] বলে সেই নগরে পৌছল। এইটিই বাঙ্গালার প্রধান শহর, আর প্রধান নবাব বা সম্রাটের নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধির রাজধানী। সম্রাট এই পদ কয়েকবার নিজের ছেলেদের দিয়েছেন। এই নগর একটি প্রশস্ত সমতল ভূমির উপর প্রসিদ্ধ আর সুফলা গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। গঙ্গার ধারে এই শহর দেড়লীগ অবধি চলে গিয়েছে। এক দিকে প্রসিদ্ধ শহরতলী মানাশোর [Manaxor] আর অন্য দিকে দুই প্রসিদ্ধ শহরতলী নরন্দিন আর পুল্‌গরি [Narandin ও Pulgari] নগরটিকে সাজিয়ে রেখেছে। এই শহরতলি গুলিতে খ্রীষ্টানদের বসতি, আর এখানে আমাদের পবিত্র সম্প্রদায়ের ছোট কিন্তু ছবির মত দেখতে একটি মঠ আর একটি ভাল গির্জা আছে। বিরাট ধর্মহীন দেশে ঈশ্বরের এই আরাধনা স্থল যেন এই অঞ্চলকে মুক্তির সত্য পথ দেখাচ্ছে।

এই শহরের বিরাট ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বহু জানা অজানা জাতির লোক এখানে বাস করে। এই প্রদেশের সুফলা জমিতে অনেক রকমের ফসল জন্মায়। তারই দৌলতে এই শহরে যে সম্পদ জড়ো হয়েছে তা একেবারে অবাক করে দেয়। আশ্চর্য লাগে এখানকার লোকেদের বিশেষ করে খত্রিদের [Catari] বাড়িতে যা টাকা আছে তাই দেখলে। এত টাকা যে গোনা শক্ত, তাই সাধারণতঃ ওজন করে এর পরিমাণ জানা হয়। আমি শুনেছি যে গঙ্গার ধারে এই বাণিজ্যকেন্দ্রে স্থানীয় লোকই থাকে দু লক্ষের উপর, আর তাছাড়া বাইরের বহু জায়গা থেকে তো বহুলোক আসেই। কিছু লোক আসে ব্যবসা করতে। অন্য কিছু লোক যুদ্ধ দেবতার ভক্ত। তারা আসে মাইনা অর্থাৎ এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে বেশী বেতন ইত্যাদি পাওয়া যায় তার লোভে। আর এখানকার অগুনতি বাজারে যে কত রকম খাবার আর অন্য জিনিস পাওয়া যায় তা দেখেও কম আশ্চর্য লাগেনা। আমার কখন কখন এত রকমের পোষা

আর জঙ্গলী পাখী প্রায় বিনামূল্যেই বিক্রী হচ্ছে দেখে আশ্চর্য লাগত। যেমন চার আনায় [একরূপার real এ] কুড়িটা ঘুঘু [turtle dove] বা বোলটি জঙ্গলী পায়রা। অন্ত জিনিসও প্রায় এই রকম সস্তা। সম্রাট আর অন্ত মুঘল শাসকরা এই শহর থেকে যে কর ইত্যাদি পান তা প্রায় অবিশ্বাস্য। একেবারে প্রামাণিক বলে শুনেছি সেই কথাটুকু বলেই এই বিষয়টি ছেড়ে দিই। একমাত্র পান [betele] বা ভারতীয় পাতা থেকেই তাঁরা দিনে চার হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় দু হাজার পেসো কর আদায় করেন। এই শহরের সমৃদ্ধির আর একটি কারণ এই যে এর কাছেই বাকলা, সোলিমান বাস আর কাটরাবো বলে তিনটি উর্বর দেশ আছে। [বাকলা, বেভারিজের মতে, বাকরগঞ্জ জেলার সাধারণ নাম। সোলিমান বাস বা সুলেমান বাস সেলিমাবাদ পরগণা। কাটরাবো মাণিকগঞ্জে কটিবারি বা কঠোরবো টপ্পা]

প্রথমে যে পাদরিরা এখানে আসেন তাঁরা নিজেদের বাসস্থানের কাছেই একটি গির্জা বানান পরে তাঁরা আরও দুটি গির্জা বানান, একটি সিরিপুরে অন্যটি নোরিকুল ব্যাণ্ডেলে। [সিরিপুর বা শ্রীপুর চাঁদরায়ের রাজধানী, সোনার গাঁ থেকে মাইল কুড়িক দূরে। নোরিকুল ছিল ঢাকা থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে। এখন দুটি জায়গার কোনটিরই অস্তিত্ব নেই মনে হয়।] এখানে তাঁদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। মুসলমান মোল্লারা তাঁদের ধর্মপ্রচারে ভীষণ ভাবে বাধা দেয়। মোল্লারা কোরাণের পেশাদার ব্যাখ্যাকারী। আর খাবারের জন্ম জন্তুদের গলা কাটাও এদের কাজ। তাই যে জায়গায় কোন মোল্লা আছে সেখানে খাবারের জন্ম অন্ত কারু পশুবধ করা ভীষণ অনুচিত বলে ধরা হয়।

যেমন আগেই বলেছি, এই লোকেরা কয়েকজন দরবেশের সঙ্গে, অর্থাৎ যারা সংসার থেকে আলাদা থাকে আর যাদের পীর বা সাধু বলা হয়, তাদের সঙ্গে মিলে নবাবের বড় স্ত্রীকে এমন উসকে দেয় যে পাদরিদের বিতাড়িত করবার জন্ম যেন তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা সাধারণ লোকের মনে এক ভয় ঢুকিয়ে দেয় যে যদি তারা কাফির অর্থাৎ ধর্মহীন লোকেদের, মুসলমানদের অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি তাদের মধ্যে থাকতে দেয়, তাহলে ঈশ্বর তাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন। এরা বলে "পাদরিরা হল নাজারীনের শেখ বা খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। এরা শুয়োরের মাংস আর মদ খেতে শেখায়। এই দুই কাজই ফোরকান বা কোরানে হারাম বা ঘোর পাপ বলে লেখা আছে। এদের এই দুই কাজ শেখাবার উদ্দেশ্য হল মহান প্রফেট মহম্মদকে ঘৃণা করতে শেখান। এদের মিথ্যা উপদেশ শোনা উচিত নয়, এদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।" পাদরিরা সম্রাটের, সুতরাং নবাবেরও, সমর্থন না পেলে হয়তো ওদের এই মতলব সফল হত। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ধর্মের প্রচারের সুবিধার জন্মই এই রকম ঘটতে দিয়েছিলেন।

সম্রাট আকবর ও তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর অনেক বার এই পাদরিদের খোরাক পোষাকের জন্ম জমি দিতে চেয়েছিলেন বা রাজকোষ থেকে বাঁধা মাহিনা ঠিক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অগষ্টিন সম্প্রদায়ের পাদরিরা এই রাজ্যে, বা

পারস্যে বা অন্য যে সব বিধর্মী রাজার দেশে তাঁরা বাস করেছেন কোথাও এই দান গ্রহণ করেননি। এশিয়ার অধিকাংশ রাজারাই বিদেশীকে এই অনুগ্রহ দেখান প্রতিদানে কোন উপকার বা সেবা পাবার জন্য। কারণ, যেমন আমি আগেই বলেছি যে তাঁদের আশা এই যে পাদরিরা থাকলে খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীরা সহজে তাঁদের দেশের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু যখন তাঁরা দেখেন যে সব সুফল তাঁরা পাবেন ভেবেছিলেন তা পাওয়া যাচ্ছেনা তখন তাঁরা পাদরিদের তাড়াবার চেষ্টা করেন।

কয়েককজন পাদরি জমি পাবার আর নিজেদের রোজগার বাড়াবার এই রকম চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদেরও এই বিপদ ঘটেছিল। তাঁরা শেষ অবধি মুশকিলে পড়ে যান ও তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ যে ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে তাঁদের মিশনের উদ্দেশ্য নৈতিক মান রক্ষা করা আর সুসমাচারের প্রচার করা, তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পারমার্থিক বিষয়ের উপর। আর্থিক ব্যাপার তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত ব্যবসাদারদের হাতে যারা সোজাসুজি ব্যাবসা করতে এসেছে। এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে না ঘটে তাই অগস্টিন সম্প্রদায়ের লোকেরা চাইতেন যে তার চেয়ে বরং বিশ্বাসীদের দানে এমন কি ধর্মহীনদের দানেও চালিয়ে নেবেন, বা পোর্তুগালের মহামান্য রাজা যে ত্রৈমাসিক ভাতা দেন তার উপরই বেঁচে থাকবেন। অবশ্য অসৎ মন্ত্রীদের জন্য অনেক সময় এই ভাতা বিতরণ করা হত না।

এ ছাড়া ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাদেশিক কর্তারা তাঁদের দারিদ্র সত্বেও যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। আর যে সব মিশনারীরা ক্যাথলিক ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন তাঁরা যদি নিজেদের এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যে লেগে যান তাহলে এটা শুধু তাঁদের কলঙ্ক নয়, তাঁদের মানসিক শান্তির পরিপন্থীও বটে। বিশেষতঃ যদি সেখানে অন্য ব্যবসায়ীরাও থাকে। আর পাদরিরা সরকারী কর্মচারী বা শাসককে ঘুষ দিয়ে এই চেষ্টা করেন যে সব ব্যবসা শুধু তাঁদের হাতেই থাকবে। তাঁরা ভুলে যান যে এই সব কাজ কাদার ভিত্তির উপর তৈরি বাড়ির মত বেশী দিন টিকবে না। এই কাজ খ্রীষ্টান আর ধর্মহীন দুই জাতিই ঘৃণা করে এবং তারা সকলেই এতে লজ্জা পায়। তাই যে ধর্ম তাঁরা প্রচার করেন তা খ্রীষ্টানদের কাছে হয়তো ছোট হয়না, ধর্মহীনদের কাছে কিন্তু তার আর কোন মান থাকে না। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার এই যে যখন এই সব কথা বা এর চেয়েও খারাপ কথা অধ্যক্ষদের কানে যায় তখন তাঁরা কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিয়ে কথাটা এড়িয়ে যান বা লুকোবার চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাতে বাঙ্গালা রাজ্যের উর্বরতার আর বাণিজ্য সম্ভারের বর্ণনা আছে। এই রাজ্য এখন মুঘলদের অধীন।

বাঙ্গালা রাজ্য বারটি প্রদেশে বিভক্ত, যথা বাঙ্গালা, হিজলি [Angelim] উড়িষ্যা, যশোর, চান্দেখান [Chandekan], মেদিনীপুর, কাটরাবুহ [Catrabo], বাকলা [Bacala], সোলিমানবাস, বুলভা [ভোলা], ঢাকা আর রাজমোল। এই শেষোক্ত নামটি

পোর্তুগীজরা এই ভাবেই উচ্চারণ করে, স্থানীয় লোকদের উচ্চারণে এই নাম রাজমেল। পুরাকালে এই সব প্রদেশ একজন ধর্মহীন রাজার অধীন ছিল। তাঁর নাম ছিল বঙ্গালকে পাদশা, অর্থাৎ বাঙ্গালার সম্রাট। তাঁর এত বেশী প্রতাপ ছিল যে তাকে ভারতবর্ষের প্রধান রাজাদের মধ্যে একজন, এবং ক্যাম্বে নরসিঙ্গার রাজাদের সমান ধরা হত।

বাঙ্গালার সম্রাট গৌড় নগরে বাস করতেন। এই নগরের বর্ণনা যথা সময়ে দেওয়া হবে। এই সম্রাটের অধীন বারজন রাজা ছিলেন, এক এক প্রদেশে এক এক জন করে। লোকে এঁদের বাংলার বার ভুঁইয়া [Boines] বলে জানত।

এঁরা সবাই এখন মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন। এই অবস্থা হয় এদের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ বেঁধে যাবার জন্য এবং বাঙ্গালার সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের পর। মুঘল পাদশা তখন এই প্রদেশগুলি শাসন করবার জন্য তাঁর নবাবকে নিযুক্ত করেন। নবাবরা, যেমন আগেই বলেছি, আমাদের ভাইসরয়'র মতন। এঁরা আবার যেখানে যেখানে এঁদের সুবিধা সেখানে শাসক [governor] বা শিকদার নিযুক্ত করেন। দেশের লোকেদের দাবিয়ে একেবারে শক্তিহীন করে দেবার জন্য এঁরা রাজকর বাড়িয়ে দেন, এবং চার বা পাঁচ মাসের কর আগাম আদায় করে নেন। এঁদের শাসনের মেয়াদ খুব কম, আবার তাও সম্রাটের মর্জির উপর নির্ভর করে। হয়তো যখন এঁরা সব চেয়ে কম আশা করছেন, তখন এঁদের পদোন্নতি করে দেন, আর কখনও বা হঠাৎ বরখাস্ত করে দেন। এই জন্যই এঁরা কর সব সময় আগাম আদায় করেন। কখনো কখনো এরা জোর করে কর আদায় করেন, আর যে সব হতভাগ্যের কর দেবার কোন উপায় নেই তাদের স্ত্রীদের এবং ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস করে নিলামে বেচে দেন। এই বেচা সম্ভব হয় এরা ধর্মহীন [হিন্দু] বলে। এত অত্যাচার সত্বেও বাঙালীরা সহজে কর দিতে চায় না। এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ভাবে যে যতক্ষণ না তাদের ভাল করে মার দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কর দেওয়া ভীষণ অপমানজনক। ভাল করে মার না খেয়েই যদি এরা কর দিয়ে ফেলে তাহলে এদের স্ত্রীরা এদের অবজ্ঞা করে, আর কয়েক-দিন এদের ভাল করে খেতে দেয়না, এবং বলে যে এত কষ্টকরে জড়ো করা টাকা যারা এত সহজে দিয়ে দেয় তারা অপদার্থ আর কাপুরুষ।

এখানকার আবহাওয়া মোটামুটি স্বাস্থ্যকর, গঙ্গা ও এখানকার অন্য নদীর জল চমৎকার। এখানে খাদ্যশস্য ইত্যাদির প্রচুর ফলন, বিশেষ করে গম, চাল, শাক সব্জি, আখ, ঘি, ইত্যাদি। অলিভ বাদে অন্য অজস্র রকমের তেল এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। পোষা জংলী অনেক রকমের পশুর মাংস এখানে সুলভ। এখানকার চাল ইয়োরোপের চালের চেয়ে অনেক ভাল। এখানকার সুগন্ধি চাল আশ্চর্যরকম মিহি। এগুলি শুধু সুস্বাদুই নয়, রাঁধবার পরও এদের সুগন্ধ থেকে যায়। এত সব খাবার জিনিস পাওয়া যায় খুব সস্তায়। যেমন এক কান্ডিল [বোধহয় দক্ষিণ ভারতের খাণ্ডি, প্রায় ২২০ কিলোগ্রাম] চাল, যা চোদ্দ পারা বা আমাদের চোদ্দ সলেমিনের সমান তার দাম তিন বা বড় জোর চার টাকা—আর এক টাকা মানে আধ পেসো বা স্পেনের চার রিয়াল। এক কলসী ঘি যাতে বার আজামব্র [এক আজামব্র প্রায়

দুলিটার। তাহলে বার আজামব্র হবে ২৪ লিটর অর্থাৎ ঘি হলে প্রায় ২০ কিলো, কিন্তু ইংরেজি অনুবাদক লিখেছেন ৭৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৩৪ কিলো।] ঘি ধরবে, তার দাম দুটাকা। এক বোঝা আখ যার ওজন হবে সাত বা আট অরোবা [এক arroba তে সাড়ে এগার কিলো] বিক্রী হয় পাঁচ বা ছয় পেসোতে।

মাংসের কথা যদি ধরা যায় তো গরু অনেক জায়গায় একটা পাওয়া যায় তিন বা চার রিয়ালে অর্থাৎ এক টাকায়। কুড়ি বা পঁচিশটা মুর্গি বিক্রী হয় এক পেসোতে। আঙুরের ক্ষেত বাঙ্গালা দেশে নেই, তাই পোর্তুগীজরা যা দেশ থেকে এনেছে তা ছাড়া আঙুরের তৈরি মদ এখানে পাওয়া যায় না। এরা অবশ্য ধান গাঁজিয়ে এক রকম মদ তৈরি করে। বড় বড় জালা বা গামলার মধ্যে ধান কে তিন বা চার দিন ভিজিয়ে রাখা হয়। খানিকটা গাঁজালে আর গলে গেলে পর একে আগুনের উপর কয়েকবার ফুটিয়ে নেওয়া হয়, যেমন তেজ দরকার সেই হিসাবে। এই মদ খুব তেজালো, আর খেলে ঠিক আমাদের দেশের মদ বেশী খেলে যেমন নেশা হয় তেমনি নেশা হয়। এ ছাড়া এরা চিনি থেকেও এক রকম বন মদ বার করে। এর নাম জাগরা। একেও দরকার মত ফুটিয়ে এর তেজ ঠিক করে নেওয়া হয়। এই দুরকম মদের যে কোন একটি ন্যাকড়া ভিজিয়ে আগুন ধরালে এমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে যেন তেলে ভেজান হয়েছে।

মেদিনীপুর অঞ্চলে ফুল এবং অন্য গন্ধ দ্রব্য দিয়ে অনেক রকম দামী সুগন্ধি তেল বানানো হয়। এই তেল সব জায়গায় রপ্তানি করা হয়। প্রাচ্য দেশের প্রায় সবাই, মেয়ে ও পুরুষ, স্নান করবার পর গায় সুগন্ধি তেল লাগায়। তাই এই তেল পাঠান হয় ধনীদের সখ মেটাবার জন্য।

বাংলা রাজ্য বেশ বড় দেশ। আর এখানে অনেক বিদেশীদের যাওয়া আসা। এর কারণ এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, খাদ্য দ্রব্যের তো বটেই, ভাল কাপড়েরও। এত বেশী বাণিজ্য হয় এই দেশে যে প্রতি বছর একশ'র বেশী জাহাজ বোঝাই চিনি, চর্বি, তেল, মোম আর এই রকম অন্য জিনিস বাঙ্গালা দেশের বন্দরগুলি থেকে রপ্তানি করা হয়।

বেশীর ভাগ কাপড়ই সুতীর, এত সুন্দর করে তৈরি যে অন্য দেশে এরকম কাপড় দেখা যায় না। সব চেয়ে সুন্দর আর দামী খাসা [মসলিন] এই দেশে তৈরি হয়। এই গুলি পঞ্চাশ বা ষাট গজ করে লম্বা, আট করতল [hand breadth = দশ সেন্টিমিটার] চওড়া ; তাতে সোনা, রূপা বা রঙিন রেশমের পাড় দেওয়া। এই মসলিন এত মিহি যে ব্যবসায়ীরা এগুলিকে দু হাত লম্বা ফাঁপা বাঁশের মধ্যে ভরে খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক ইত্যাদি বহু দেশে নিয়ে যায়।

যেমন আমি আগেই বলেছি, এই বাঁশ একরকম বেত, কিন্তু আমাদের দেশের বেতের চেয়ে অনেক বেশী মজবুত। এদের মধ্যে আবার যে গুলি কে মন্দা বাঁশ [Dendrocalamus strictus] বলে সেগুলি ভীষণ শক্ত ; এদের মধ্যে অনেকগুলি মানুষের পায়ের মত মোটা। যেগুলি মানুষের হাতের চেয়ে বেশী মোটা নয় সেগুলির

বাজারে খুব দাম, এক একটা প্রায় দুশ বা তিনশ টাকা করে ; পালকির দণ্ড বানাবার জন্য এগুলির খুব চাহিদা। এগুলি যথেষ্ট লম্বা বলে মাঝ খানটা বেঁকিয়ে নেবার পরও বইবার জন্য দুদিকে এক এক পাশে দুজন করে লোক দাঁড়াবার জায়গা থাকে। যারা পালকি বয় তারা যেন এই যানের বলদ [bueyes, স্প্যানিশ ভাষায় বলদ], আর শুধু কাজেই নয়, নামেও, কারণ সারা ভারতবর্ষে এদের বয় [buyes] বলে ডাকা হয়।

এদেশে আফিম বলে এক রকম গাছ জন্মায়, অনেকটা আমাদের সনের মত দেখতে, তবে এর বীজ খুব মিহি আর প্রতি বছর এর চাষ করতে হয়। যখন এতে ফুল ধরে তখন একে বলে পোস্ত। এই গাছ আর ফুল থেকে একরকম ভীষণ তেতো আর কালো আঠা বেরোয়, যার নাম আফিম। প্রাচ্য দেশের লোকেরা তাদের যৌন ক্ষমতা বাড়িয়ে লালসা মেটাবার জন্য আফিম ব্যবহার করে। আফিম অবশ্য খুব মেপে আর সাবধানে ব্যবহার করতে হয়, কারণ বেশী খেয়ে নিলে আফিম ভীষণ ক্ষতিকর। যাদের খাওয়া অভ্যাস আছে তারা বড় জোর চার বা পাঁচ পেসো ওজনের খেতে পারে। তেলের সঙ্গে মেশালেই আফিম ভীষণ বিষ। আফিমের একটা বিশেষত্ব এই যে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে কোন আফিমসেবী একদিনও আফিম না খেয়ে থাকতে পারে না। যদি কোন কারণে আফিম না পায় তাহলে যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ তারা মৃতপ্রায় হয়ে থাকে। যত আফিম না পায় তত তারা দুর্বল হতে থাকে, আর যদি তিন বা চার দিন বা বড় জোর ছ দিন আফিম না পায় তাহলে তারা মরে যায়। ভাঙ আর পোস্ততেও এই প্রভাব হয়। কিন্তু পোস্ত খায় জলের সঙ্গে মিশিয়ে, কালো আর তেতো মিশ্রণ বানিয়ে। এই খেলে যৌন ক্ষমতা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, কিন্তু আবার স্বাভাবিক ক্ষমতা এতে এত কমে যায় যে মানুষ দু তিন বছরের মধ্যেই পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে, আর কোন রকম কাজ করবারই তার ক্ষমতা থাকেনা। পোস্ত, ভাঙ আর আফিমের আর একটি প্রভাব এই যে এতে মানুষ অবোধ হয়ে যায়, আর ভেবে কাজ করবার ক্ষমতা তাদের একেবারে থাকেনা।

বড় লোকেরা আবার এই সব ঔষধের সঙ্গে জায়ফল, জয়িত্রি, লবঙ্গ, বোর্ণিওর, কর্পূর, অম্বর, almiscre [কস্তুরী ?] প্রভৃতি জিনিষ মিশিয়ে ব্যবহার করে। এগুলি সব গরম জিনিস, তাই এই সব বর্বর ভোগ্য জিনিস তারা যে কাজের জন্য ব্যবহার করে তাতে এদের সাহায্য করে।

এই তিনটি ঔষধ উৎসাহহীন লোকেদের মধ্যে গভীর ঘুম, হাসি আর প্রফুল্লতা আনে, আর সব রকম দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়। এই সব বর্বর লোকেরা আমাদের সত্য ও পবিত্র ধর্ম জানে না, তাই তারা ভাবে যে শরীরের সুখই মনুষ্য জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যাতে বাঙ্গালা দেশের লোকেদের চেহারা, চরিত্র আর জীবনযাত্রার প্রণালীর কথা আছে।

যদিও একজন ইটালীয় লেখক বলেছেন যে বাঙ্গালা দেশের লোকেরা ফর্সা ও অহংকারী তাদের জীবনযাত্রা, কাপড় চোপড় খুব শৌখিন, ইত্যাদি সব কথা, আমি কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করতে রাজি নই। কারণ ঐ লেখক যা লিখেছেন তা শোনা কথা আর আমি যা লিখব তা আমার চোখে দেখা এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল তাই সত্যের ভিত্তিতে আমি বলি যে বাঙ্গালা দেশের লোকেরা মাঝারি কালো রঙের, অনেকে আবার সিংহলের সিংহলাদের মত কালো। তাদের আকৃতি ভাল, শরীর সুগঠিত, লম্বায় মাঝারি। সাধারণ লোকে, মেয়ে-পুরুষ সবাই সুতী কাপড় পরে। কাপড় কেটে সেলাই ক'রে, অর্থাৎ কোন রকম জামা বানিয়ে পরে না। পুরুষরা দেড় বা দু হাত [six or seven hand breadths] চওড়া কাপড় পরে কোমর থেকে নীচের দিকে। কোমরের উপর তারা কোন কাপড় পরেনা, আর তাদের পা ও খালি থাকে। মাথায় তারা বার বা চোদ্দ বিঘত লম্বা আর দু বিঘত চওড়া কাপড়ের পাগড়ি [toca] পরে। তার দাম বড় জোর সিকি টাকা। সাধারণ লোকেরা এমনি ভাবেই থাকে। যাদের অবস্থা ভাল বা যারা পদে উঁচু, কাঁধের উপর দিয়ে শরীরের উপরের অংশে ঐ রকমই লম্বা একটি কাপড় ফেলে রাখে।

মেয়েরাও এই রকমই কাপড় পরে তবে পরিমাণে একটু বেশী। সাধারণতঃ আঠার বা কুড়ি বিঘত [span] লম্বা, আর এই দিয়ে তারা সারা শরীর ঢেকে রাখে। কোন কোন জেলায় সাধারণ কাপড় এত সস্তা যে মেয়েদের চার রিয়ালের [এক টাকার] কাপড়েই পোষাক হয়ে যায়। মেয়েদের হাতে সাধারণতঃ আর্মলেট আর ব্রেসলেট [চুড়ি ?] থাকে। ব্রেসলেটের আকার ও প্যাটার্ন আর্মলেটের থেকে আলাদা। এই গুলি বাহুর উপর, মধ্য আর নিম্ন ভাগে পরা হয়, যাতে আর্মলেট ভাল করে চোখে পড়ে। এ ছাড়া তারা কানে বড় বড় রিং বা অন্য গয়না পরে। নাকের পাশেও বিশেষ করে বাঁ পাশে তারা ছোট ছোট সোনার বা রুপার রিং পরে, আর যাদের সামর্থ্য আছে তারা এতে একটা বা দুটো দামী মুক্তা লাগিয়ে নেয়। তারা নেকলেসও পরে, এগুলি সাধাবণতঃ কাঁসার তৈরি। কাঁসা এক রকমের ধাতু, আমাদের মোরিস্কো লাটেনের [Morisco latten] চেয়ে ভাল। বড়লোকের বাড়ির মেয়েরা উৎসব বা অন্য অনুষ্ঠানে এই সব গয়নাই পরে, তবে সেগুলি সোনার তৈরি, এবং তাতে অনেক দামী পাথর বসান থাকে। এ ছাড়া তারা আংটিও পরে, শুধু হাতের আঙুলে নয়, পায়ের আঙুলেও। তারা পায়ের পাতার উপর আর পায়েও গয়না পরে। এই হল এদের গয়না। যেমন আমি আগেই বলেছি, এগুলি সোনা, রুপা, কাঁসা, ঝিনুক (শঙ্খ), হাতির দাঁত, বা কোথাও কোথাও রাঙের (calaim) তৈরি। রাঙ টিনের মত এক রকম ধাতু। উৎসবের দিনে মেয়েরা নানা রকম রঙ্গিন রেশমী কাপড় পরে, এই কাপড়ের উপর সোনা, রুপা বা রেশমের সুতার কাজ করা। তেমনি বড়

লোক পুরুষরাও এই সব দিনে পাজামা আর কাবা পরে, মুঘলদের অনুকরণে। কাবা ক্যাসকের (cassock) মত প্রায় পা অবধি লম্বা। এই কোট গুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, দেখে হিন্দু আর মুসলমানের তফাত বোঝা যায়। মুসলমানদের বেলা এগুলি ডান দিকে খোলে আর হিন্দুদের বেলা বাঁ দিকে। পাজামা, যেগুলি কে ইজার বলে সেগুলি একই রকম লম্বা আর সরু। ফ্যাসনের চূড়ান্ত হয় যদি এতে ফরাসীদের আধ মোজার (half hose) মত অনেক লাইন আর ভাঁজ (crease) পড়ে থাকে। সাধারণ লোকেরা এই সব দিনে শুধু খুব পরিষ্কার সাদা কাপড় পরে।

বাঙালীরা খুব অলস আর দুর্বল চিত্ত; এশিয়ার অন্য জাতির মত এরাও স্বার্থ নিয়ে মেতে আছে। বাঙালীরা তাই ভীতু ও কাপুরুষ, হুকুম দেওয়ার চেয়ে তামিল করতেই বেশী পারে। তাই এরা এত সহজে বন্দীদশা বা দাসত্ব মেনে নেয়। এদের কাছ থেকে ভাল কাজ পেতে হলে এদের সঙ্গে মৃদু ব্যবহার না করে কর্কশ ব্যবহার করলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। কথটা এতই সত্য যে ওদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, "মারে ঠাকুর, না মারে কুকুর" [Mare Tacur namare cucur]। যার অর্থ "যে মারে সে প্রভু, আর যে তা করেনা সে কুকুর"। এই থেকেই কৌতূহলী পাঠক এদের চরিত্র জেনে যাবেন।

লোকেরা সাধারণতঃ মাটি আর কাদার তৈরি কুঁড়ে ঘরে থাকে। ওগুলি খড় বা হোগলা [olas] দিয়ে ছাওয়া। হোগলা এক রকম পাম জাতীয় গাছের পাতা। এরা নিজেদের থাকবার জায়গা খুব পরিষ্কার রাখে, আর সাধারণতঃ সমানে কাদা আর গোবর মিশিয়ে লেপে। এই লেপা শুধু দেওয়ালে নয় মেজেতেও হয়। আর যেখানে তারা খায় সেখানে রোজ লেপা হয়। অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার প্রতিবার খাবার আগে জায়গা লেপা নিয়ম। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে খায়না, আগে পুরুষদের খাবার দিয়ে পরে নিজেরা খায়।

সাধারণ লোকেদের বাড়ির আসবাব পত্র হল, একটি মাদুর। এর উপর এরা সুতী কাপড়ের তৈরি এক রকম তোষক যাকে এরা কাঁথা বলে তাই পেতে শোয়। তা ছাড়া চারটি বাসন যাতে এরা ভাত ও অতি সাধারণ রকমের ঝোল [Stew] রাঁধে। সব জিনিষই অতি সস্তা ধরণের।

এদের দৈনিক খাবার হ'ল ভাত, তার সঙ্গে যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলেই নুনেতেই এরা সন্তুষ্ট। এরা এক ধরণের পাতা যাকে এরা শাক [xaga] বলে তাও খায়। যাদের অবস্থা ভাল তারা দুধ, ঘি আর দুধের তৈরি অন্য জিনিষও খায়। মাছ খুব কমই খায়, বিশেষ করে যারা দেশের মধ্যভাগে থাকে। কয়েকটি জন্তুর মাংসও ব্যবহার করা হয়, যেমন ছাগল, বা ছাগল ছানা বা খাসী করা ছাগলের মাংস যার নাম বকরী মাংস। এ ছাড়া বন্য শুয়োর বা জাবালি [Jabali], জংলী পায়রা, ঘুঘু, বটের, আর এই রকম অন্য জন্তুর মাংসও এরা খায়। তবে পোষা শুয়োর, মুরগী, ডিম, অন্য পোষা জন্তু, বিশেষ করে গরু বা ষাঁড়ের মাংস এরা কখনোই খায় না।

এই সব অবিশ্বাসী বা প্যাগানদের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যারা কোন

জন্তুর মাংস খায়না, এমন কি যে সব তরকারির রং লাল সেগুলিও ছোঁয়না। তারা বলে যে রক্তের রঙের কোন জিনিষ খাওয়া বড় গুনাহ [boro guna], যার মানে ভীষণ পাপ। এই মূর্তি পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণতঃ খিচুড়ি [Kachari] খায়। খিচুড়ি মসুরের ডাল [Lentil] এবং ভাত মেশান এক রকম খাবার। সাধারণত দুভাগ চালের সঙ্গে এক ভাগ মসুর মেশান হয়। মসুরের বদলে মুগ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। মুগ এক রকম ছোট আকারের তরকারি; ঘোর সবুজ রঙের, খুব সহজে হজম হয়, আর রুগ্ন লোকেদের পক্ষে খুব ভাল। এই সব উপকরণ ছাড়া এতে অনেক খানি ঘি মেশান হয়, যাতে এটি বেশ ভারি হয়।

ভোজের সময় এরা অন্য রকমের খিচুড়ি ব্যবহার করে। এর নাম গুজরাতী খিচুড়ি এতে অনেক রকম মশলা যেমন বাদাম, কিসমিস, লবঙ্গ, জয়িত্রি, জায়ফল, দারুচিনি এলাচ ও গোলমরিচ দেওয়া হয় বলে এর অনেক খরচ পড়ে। এদের অনেক রকম মিষ্টিও আছে। সবই এদের নিজেদের ধরণের তৈরি, আর সবেতেই ঘি একটা বড় উপকরণ। এদেশের সবাই মেয়ে বা পুরুষ খেতে বসবার আগে স্নান করে নেয়। যদি স্নান না করে,—এমনিই এদের অদ্ভুত বিশ্বাস,—এদের ভীষণ পাপ হয়। আর স্নান করার আগে যদি তেল মেখে নিতে পারে, তাহলে স্নান একেবারে নিখুঁত হয়। অধিকাংশ অন্য দেশের অবিশ্বাসীরা যেমন একটির বেশী বিবাহ করে এই জাতির লোকেরা তা করেনা।

পুরুষরা যৌন সম্পর্কের বিষয়ে বেশী আসক্ত নয়। কিন্তু মেয়েরা এ বিষয়ে তাদের ছাড়িয়ে যায়, আর পুরুষদের সহযোগ পাবার জন্য নানা রকম মন্ত্র তন্ত্র করে আর তাদের ঔষধ খাওয়ায়। এতে কখন কখন তারা মারা যায়, বা আর কিছু না হ'ক পাগল হয়ে যায়, বা সারা জীবনেব জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বাঙ্গালাদেশের মেয়েরা স্বভাবতঃই জেদী; এমন কি তারা কখন কখন বিষ খেয়ে বা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে ফেলে। কিন্তু সব মিলিয়ে এরা মানবিক [humane], দয়ালু; সহজেই এদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাই এরা পুরুষদের চেয়ে সহজে আমাদের সত্য ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙালীরা শকুন ইত্যাদি খুব মানে, তাই পাখীদের ডাক বা গান শুনে বা অন্য জন্তু জানোয়ারের চলন দেখে, তারা নির্বোধের মত সেই চিহ্নগুলি থেকে ভাল মন্দ ফল বার করে, এবং সেই অনুসারে তারা যে কাজ করতে যাচ্ছিল সেটা করে বা ছেড়ে দেয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালাদেশের ধর্মহীনদের ও তাদের ব্রাহ্মণদের পূজা, আচার ও অন্য অনুষ্ঠান।

পুরাকালে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই অবিশ্বাসী [heathen] মতের প্রচলন ছিল, আর এখনও অধিকাংশ লোকই সেই মত মেনে চলে। যখন থেকে এই দেশ মুঘল সম্রাজ্যের অধীন হয়েছে তখন থেকে অবশ্য কিছু লোক এই অবিশ্বাসী মত অর্থাৎ

নরকের কঠিনতর পথ ছেড়ে দিয়ে নরকের চওড়া আর সোজা রাস্তা অর্থাৎ অলকোরানের মত বেছে নিয়েছে। দুর্বল মনুষ্যচিত্ত যত রকম সুখ চায় সব এতে পাওয়া যায় কারণ অলকোরানের মতে মানুষের সব আনন্দ এতেই। আর এর চেয়েও বেশী আনন্দের জন্ত এদের প্রফেট মাওমেট [Maomet] পরকালে আরও সুখের আশ্বাস দিয়েছেন। এগুলি হল ইহকালের কষ্ট অর্থাৎ যত রকমের সুখ ভোগের বদলে পরকালের আরাম আর আনন্দের জীবন, এমন জায়গায় যেখানে দুধ, ঘি বা মধুভরা নদী বইছে আর অন্ত সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে।

আর ধর্মহীনরা [হিন্দুরা]! এরা অজস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এরা সবাই ব্রাহ্মণদের শিক্ষা মেনে চলে। ব্রাহ্মণরা, যেমন আমি আগেই বলেছি এদের পুরোহিত। সকলেই অবশ্য গঙ্গা নদী, সূর্য আর গরুকে পূজা করবার বিষয়ে একমত। গরু সম্পর্কে এরা বলে যে এই জন্তু থেকে এরা অনেক উপকার পায়, অর্থাৎ যে সব গুণ তাদের স্বর্গীয় স্রষ্টাকে আরোপ করবার কথা সেগুলি তারা এই জন্তুকে করে।

আর গ্যাঞ্জেস নদী যাকে এরা গোঙ্গা বলে [Gonga], তাকে এদের গ্রন্থগুলিতে অনেক গুণের অধিকারী বলা হয়েছে। এরা বলে যে একথা একেবারে সত্য, যে যেকেউ এই নদীতে স্নান করে সে তৎক্ষণাৎ পাপের সব শাস্তি আর কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। তাই যারা এই নদীর তীরে থাকে তারা সকালে উঠেই এই নদীতে স্নান করে, তা সেদিন বৃষ্টিই পড়ুক বা খুব ঠাণ্ডাই থাকুক। কখনও এর অন্তথা করেনা। এদের জলে নামবার আগে কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে। সেগুলি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করব। ব্রাহ্মণদের অনুষ্ঠানগুলিই বেশী রহস্তজনক আর কুসংস্কারপূর্ণ সেগুলিই আমি বিশেষ করে বলব। এরা পবিত্র গঙ্গাতে প্রবেশ করবার আগে ডান হাতে কিছু খড় নেয়, আর বা-হাতে চামচের মত দেখতে তামা বা ঐ ধরণের কোন ধাতুর পাত্র নেয়। এই সব উপকরণ নিয়ে তারা নির্দিষ্ট সংখ্যক পা ফেলে নদীর দিকে এগিয়ে যায়। কয়েক পা গিয়ে কিছু কিছু খড় পাশে ফেলে দেয় আর সেই সঙ্গে স্তুতি আর বিনয়সূচক কিছু মন্ত্র বলে। এমনি করে যতক্ষণ না সব খড় ফুরিয়ে যায় ততক্ষণ তারা চলে। এই হল প্রথম অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল ছোট পাত্রটিতে কিছু জল ভরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া! এই দুই কাজের অর্থ, তাদের কথা অনুসারে, এই বোঝান যে সমস্ত খাদ্য আর পানীয় স্বর্গ থেকে আসে। এইবার এই হাস্তকর নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। এর পর তারা সসম্ভ্রমে গঙ্গাকে নমস্কার করে, মাথার উপর হাত তুলে কয়েকবার খোলে আর বন্ধ করে, আর তার পর পূর্ব দিকে মুখ করে কিছু হাত নেড়ে তাদের ভাঁড়ামি শেষ করে। এখন নিজেদের মতে একেবারে শুদ্ধ আর পবিত্র হয়ে তারা জল থেকে উঠে সোজা বাড়ি যায় যাতে পবিত্র হবার শেষ অনুষ্ঠান অর্থাৎ গরুর সব চেয়ে ঘৃণ্য অংশে চুমা খাওয়া শেষ করে, নিজেদের মাথায় সেই জন্তুরই বিষ্ঠার গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে পবিত্র হওয়ার কাজ শেষ করতে পারে। যে সব বাঙালীরা [Bangalas] নদী থেকে দূরে দেশের মধ্যে থাকে তারা এই স্নান পুকুরে করে। পুকুরগুলি গাঁয়ের সকলের খরচে বানানো, কিম্বা কোন বড় লোকের বানানো হয়। অথবা কোন বড়লোকের মৃত্যুর পর

তাঁর স্মৃতিতে পুকুর বানানো হয়। পুকুর বানানো বেশ শ্রমসাধ্য আর এতে খরচও বেশ পড়ে। ধর্মহীনদের মন্দিরও আছে। মন্দিরকে এরা প্যাগোডা [Pagoda] বলে, আর এগুলিতে এরা পুরুষ বা স্ত্রীর বা কোন বোবা জন্তুর মূর্তি রাখে। প্যাগোডাতেই তারা প্রার্থনা করে আর পূজা দেয়। অধিকাংশ মন্দিরেই ব্রাহ্মণেরা যারা এই সব মিথ্যা দেবতার পুরোহিত, তারাই পূজারী। কয়েকটি মন্দির অবশ্য সত্যই সুন্দর দেখতে, বিরাট আকারের আর অজস্র ধনে পূর্ণ।

বাংলার রাজ্যগুলির মন্দিরের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হল উড়িষ্যা রাজ্যের সমুদ্রের ধারে জগন্নাথের মন্দির। এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, আর বহুলোক এখানে তীর্থ করতে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে অনেক দান করে। আমি আগেই বলেছি, এটির নাম জগন্নাথের প্যাগোডা। এই নাম হয়েছে ভিতরের মূর্তির নামে। এই মূর্তি পাথরের তৈরি, প্রকাণ্ড বড়, খুব উঁচু আর এর একটা পা ভাঙা। খুব দামী ভাল ভাল মণি মুক্তা ও সোনার গয়না দিয়ে এটি ঢাকা। এই শয়তানী মূর্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের বইতে লেখা আছে যে জগন্নাথ স্বর্গে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের রাঁধুনি ছিল। একদিন সে এমন খারাপ রাঁধে যে শাস্তি স্বরূপ তাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়। পড়ে যাওয়াতে তার পা ভেঙে যায়। জগন্নাথের মূর্তি সোনার কাপড়ে ঢাকা আর সিংহাসনের উপর বসান। দৈত্যরা চারিদিকে একে পাহারা দিচ্ছে। এই দৈত্যদের এদের ভাষায় রাক্ষস (raiquos) অর্থাৎ অর্দ্ধদেবতা বলে। এদের বইতে এই সব অর্দ্ধদেবতাদের নানা রকম কীর্তি কলাপের কথা আছে। সেগুলি এতই বোকাবোকা যে আমি আর লিখলাম না, তবে লিখলে একটি পুরো বই হয়ে যেত।

এই মূর্তির অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হল প্রকাণ্ড আর চমৎকার একটি শোভা-যাত্রা। এতে অনেক মূর্তিকে দামী আর সুন্দর বিজয় রথে করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় ধর্মহীন বহু মেয়ে পুরুষ বহু দেশ থেকে ভীড় করে এখানে তীর্থ করতে আসে। বহু যোগী আর ভণ্ড ভক্ত যারা সংসার থেকে আলাদা থাকে, কিন্তু আসলে বেহদ পাজী তারা এই সময় নগ্ন সাধু সেজে আর সারা গায় লোহার শিকল আর হাতে হাত কড়া বেঁধে হাজির হয়। যেমনি তারা এই মিথ্যা মন্দিরগুলির দরজার সামনে পৌঁছায়, অমনি তারা নিজেদের শয়তানী যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে আর খুব গর্বের সঙ্গে নিজেদের শক্তি দেখিয়ে হঠাৎ তাদের সমস্ত শিকল থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই দেখে ধর্ম-হীন বর্বরের দল চিৎকার করে বাহবা দেয় আর তাদের প্রশংসা করে। তারা ভাবে যে এই সামান্য ফাঁকি বুঝি বা একটা অলৌকিক কাজ।

এই সব যোগী আর নরকের পথ প্রদর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানী উন্মাদনায় ভরে গিয়ে আর বর্বর ধর্মহীনদের চিৎকারে প্ররোচিত হয়ে নিজেদের জীবন এই রাক্ষসদের কাছে বলি দেয়। যে পথ দিয়ে মূর্তিগুলি নিয়ে রথের শোভাযাত্রা যাচ্ছে তারা সেই পথের উপর নিজেদের ফেলে দেয়। রথগুলি তাদের উপর দিয়ে চলে গেলে তাদের ভাঙা দুমড়ান শরীরগুলি পড়ে থাকে। এদের সবাই শহীদ বলে—আসলে কিন্তু এরা শয়তানের অনুচর। অনেকে আবার শহীদ হবার অন্য উপায় বার করে। এরা এই

পথের উপরই একটা লম্বা দণ্ড থেকে লোহার কাঁটা দিয়ে নিজেদের শরীর ঝুলিয়ে দেয় আর যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ শোভাযাত্রার উপর রক্ত ঢালতে থাকে। এমনি করে তারা নিজেদের আত্মা স্বর্গীয় স্রষ্টাকে সমর্পণ না করে শয়তানকে দিয়ে দেয়।

এই ধর্মহীনরা জুন মাসের অমাবস্যার দিন বড় বড় গাঁয়ে দুর্গা বলে এক মূর্তির নামে বড় একটা শোভাযাত্রা বার করে। দুর্গা এদের শাস্ত্র অনুসারে একজন দুষ্টা দেবী। এই দেবীকে এরা সুন্দর করে সাজানো বিজয়রথে করে নিয়ে যায়। এদের সঙ্গে নাচওয়ালী মেয়েদের একটা বড় দল থাকে। এই মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি করে রোজগার করে। নাচ-ওয়ালীরা আগে আগে যায় আর নানা রকম বাজনা বাজিয়ে উৎসবের গান গায়। এই ভাবে কিছু দূর চলবার পর হঠাৎ মূর্তিকে সম্মান দেখানো বন্ধ করে অসম্মান করা আরম্ভ হয়ে যায়। এই সম্মান আর জাঁক-জমকের সঙ্গে যে মূর্তিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাকে নদীর ধারে, বা নদী না থাকলে পুকুরের ধারে এনে মানুষের বিষ্ঠার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়, আর সেই সময় তাকে দুষ্টা বলে নানা রকম গালাগাল, ঠাট্টা, চিৎকার ইত্যাদি করা হয় আর ঢিল মারা হয়। এই ভাবে উৎসব শেষ করে তারা বেশ খুশী হয়ে আর তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরে আসে। (মনে হয় তাঁর বাঙ্গালা দেশে থাকার বহুদিন পরে মানরিক তার ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন বলে দুর্গার সঙ্গে অলক্ষ্মীকে গুলিয়ে ফেলেছেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ অনুসারে অলক্ষ্মী পূজা হয় দীপাবলীর (কার্তিক অমাবস্যা) রাত্রে। সেদিন প্রথমে লক্ষ্মীপূজা হয়, আর তার পর পূজারী বাড়ির বাইরে গিয়ে গোবরের মূর্তি বানিয়ে অলক্ষ্মীর পূজা করেন। তার পর বালকেরা তালি বাজিয়ে সমস্বরে বলে, "অলক্ষ্মী দূর হও, মা লক্ষ্মী ঘরে এস।")

নবম পরিচ্ছেদ

যাতে সাগর দ্বীপের বর্ণনা আছে। এক কালে এই দ্বীপ ধর্মহীনদের বহু সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সাগর দ্বীপ বাঙ্গালা সমুদ্রে অবস্থিত। হুগলি থেকে এই দ্বীপ বেশী দূরে নয়। এর বেড় হবে প্রায় কুড়ি লীগ। এই দ্বীপের জমি একেবারে সমতল, আর জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। পুরাকালে অনেক ব্রাহ্মণরা এখানে এসে থাকত। তারা এখানকার মন্দিরগুলির সেবা করে, সেই মন্দিরগুলির সম্পত্তির উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করত। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটি মন্দির দেখতে চমৎকার আর অন্য মন্দিরের চেয়ে আয়তনে বড় ছিল। আমি এর কিছু ঘর আর সুন্দর সুন্দর গম্বুজের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি। পোর্তুগীজরা বাঙ্গালাদেশে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দ্বীপের অবনতি আরম্ভ হয়, এখন সর্বদা কেউ এখানে থাকে না। অনেক তীর্থযাত্রী দূর দেশ থেকে এই সব ধ্বংস মন্দির দেখতে আসে। এরা পোর্তুগীজ আর মগদের ভয় সত্ত্বেও এখানে আসে। অনেক সময় পোর্তুগীজ আর মগদের জাহাজগুলি এই দ্বীপে এসে থামে, কখন বা বিশ্রাম করতে আর কখনও বা এই তীর্থযাত্রীদের বন্দী করে নিয়ে যেতে। এর কারণ এই যে এই সব তীর্থযাত্রীরা অত্যাচারী মুঘল ও অন্য শত্রু রাজার প্রজা। এই দ্বীপে

অনেক পুকুর আছে। তাদের জল খুব পরিস্কার। পুকুরের ধারে ধারে সুপারি গাছের সারি। গাছগুলিতে ছায়া হয়, আর যেমন আমি আগেই বলেছি গাছগুলি খুব সুন্দর দেখতে। এই গাছে খেজুর গাছের মত গোছা গোছা ফল হয়, আর সেই ফল থেকে সুপারি বলে এক রকম ফল বের হয়। প্রাচ্য দেশে প্রায় সবাই প্রত্যহ ভারতীয় পাতা অর্থাৎ যাকে দেশী লোকেরা বিটিল (betele) বলে তার সঙ্গে সুপারি দিয়ে খায়। বিটিল এক রকম সুগন্ধি পাতা। এগুলি মুখের দুর্গন্ধ দূর করে আর পেট ঠাণ্ডা রাখে। বিশুদ্ধ চুনের সঙ্গে খেলে দাঁত ঠিক রাখে।

পুরুষ যাত্রীরা এখানে পৌছলেই চুল আর দাড়ি কামিয়ে ফেলে, তার পর পুকুর গুলিতে স্নান করে। মেয়েরাও স্নান করে, তবে, চুল কাটেনা। স্নান হয়ে গেলেই তারা ভাবে যে তারা শুদ্ধ আর পবিত্র হয়ে গেছে আর সব পাপ এবং পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে। তারপর তারা নানা রকম প্রণাম করে আর নম্রতার চিহ্ন দেখিয়ে মন্দিরে ঢোকে। কিছু পুরুষ, এমনকি মেয়েরাও শয়তানের প্রেরণায় আর ভাবোন্মাদ হয়ে গিয়ে এই সব মূর্তিগুলিকে নিজেদের প্রাণ অবধি দান করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর মূর্তিদের সামনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাদের প্রাণ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করে। এই প্রতিজ্ঞা করবা মাত্র তারা সমুদ্রে বুক জল অবধি চলে যায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের একরকম ভয়ঙ্কর জীব যাকে হাঙর বলে তারা এদের খেয়ে ফেলে। এদের তিন সারি দাঁত। অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে আর মানুষের মাংস খেয়ে এরা এত রক্তলোলুপ হয়ে গেছে যে ছায়া দেখলেই এরা তেড়ে আসে। অনেক সময় এদের পেট ভরা থাকলে, বা সেই সময় কাছাকাছি না থাকলে এরা সেই মূর্তিপূজকদের শরীরকে অগ্রাহ্য করে। তখন এই মূর্তিপূজকরা এই মুক্তিকে আনন্দ আর সৌভাগ্যের কারণ না ধরে দুভার্গ্যের লক্ষণ বলে ধরে। তারা ভাবে যে তাদের আত্মবলিদান বুঝি ঐ সব মিথ্যা আর শয়তানী দেবতাদের গ্রহণ যোগ্য নয়, আর তারা চিরকালের জন্য অভিশপ্ত। তাই তারা কাঁদতে কাঁদতে জলে থেকে উঠে আসে। এই দ্বীপের কাছাকাছি যে সব ধর্মহীনরা, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণরা আছে তারা এই দ্বীপে খ্রীষ্টান বা অন্য কোন ধর্মের লোকেদের থাকতে দেয়না। এদের আটকাতে না পারলে তাদের কাছে অন্য উপায় আছে, যেমন জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া। ব্রাহ্মণরা এই ধর্মহীনদের শেখায় যে যদি তারা অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে কোন ব্যবসা বা অন্য সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তাদের দেবতারা তাদের ভীষণ শাস্তি দেবে। অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই তারা এখানে এসে থাকবে, আরা তারা থাকলেই এই পবিত্র জায়গা গুলি অপবিত্র হয়ে যাবে। এতে অবশ্য পোর্তুগীজদের উপর কোন প্রভাব হতনা, যদিনা তাদের অন্য জায়গায় আরও দরকারী কাজে লেগে থাকতে হত। বেশীর ভাগ ধর্মহীন লোকেরা গঙ্গার জলকে এত ভক্তি করে যে বহুদূর দেশে অবধি এই জল পবিত্র জিনিষ বলে বিতরণ করা হয়। যারা এই জল পায় তারা এর বদলে বেশী দামী জিনিষ দেয়। তাই কিছু লোক পুণ্য আর দানের নামে বেশ লাভ করে। লস্কর যারা পোর্তুগীজদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে তারা সাধারণতঃ হয় ধর্মহীন, নয়

মুসলমান। তারাই এই ব্যবসা করে। যখনই এরা এই সব দেশে আসে তখনই কিছু গঙ্গার জল নিয়ে যায় আর এই হতভাগ্য মূর্তিপূজকদের কুসংস্কার বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এমনি করে স্বর্গীয় স্রষ্টার আদেশ না মেনে তারা শয়তানের হয়ে কাজ করে। এই জন্তই পরম শ্রদ্ধেয় সিনিয়র ডন ফ্রে অ্যালেক্সো দে মেনেসেস যিনি অগষ্টিনীয় সম্প্রদায়ের একজন ফ্রায়ের ও সেই সময় প্রাচ্য দেশের প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন তিনি গোয়াতে ভারতবর্ষের সব ধর্মযাজকদের এক সভা ডাকেন আর জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মালিকদের ভীষণ শাস্তির ভয় দেখিয়ে বলেন যে তাঁরা যেন কাউকে এই জল নিয়ে যেতে না দেন। কারণ এই সব দেশের ধর্মহীন রাজারা, এমনকি মুসলমান রাজারাও যখন প্রথম রাজ্য লাভ করে মুকুট পরে তখন এই জল আনায়। তারা এই জলে স্নান করে আর অভিষেকের সময় যেসব অনুষ্ঠান হয় তাতে ব্যবহার করে। তাদের শিক্ষক আর পরিচালক ব্রাহ্মণরা তাদের এই বলে নিশ্চিন্ত করে যে এই জল ব্যবহার করলে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার হবে। যে সব ধর্মহীনরা গঙ্গার ধারে বাস করে, তারা মৃতকল্প রোগীদের খাটে করে জলের ধারে নিয়ে আসে যাতে তারা এই নদী দেখতে দেখতে সুখে মরতে পারে। তাদের আত্মাদের পবিত্র হওয়া সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহই না থাকে সেই জন্য তারা কিছু কিছু মন্ত্র পড়ে, অন্ত অনুষ্ঠান করে রোগীদের মুখে জল ঢালে আর তাদের পরকালের জন্য শুভ চিন্তা করে। অনেক সময় এই হতভাগারা স্বাভাবিক ভাবে মরবার আগেই বেশী জলের জন্য দম আটকে মারা যায়। মরবা মাত্রই তাদের পুড়িয়ে, ছাই গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের খাট আর কাপড়ও জলে ফেলে দেওয়া হয়। মৃতক যদি কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হয় তাহলে তাদের লাল বা সাদা চন্দন কাঠ বা ঈগল কাঠ বা অন্ত সুগন্ধি কাঠে পোড়ান হয়।

যদি মৃতক বিবাহিত হয় তাহলে তার স্ত্রীকেও তার সঙ্গে পোড়ান হয়। এই অনুষ্ঠানে সেই স্ত্রী ভাল গয়না পরে চন্দন বা অন্য সুগন্ধি জিনিষ মেখে, সারা শরীরে আসল বা নকল ফুলের মালা পরে আসে। এই গভীর শোকাবহ অনুষ্ঠানে সেই হতভাগ্য স্ত্রীলোকের নিজের ও স্বামীর আত্মীয় স্বজনেরা আনন্দ দেখাবার জন্ত খুব ভাল ভাল কাপড় পরে আসে, যেন তারা কোন বিয়েতে আনন্দ করতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে নাচিয়েরা গান বাজনা করতে করতে আসে। তাদের মাঝখানে পোড়াবার জন্ত সেই হতভাগ্য নারী থাকে। তাকে খুব ভাঙ খাইয়ে প্রায় অজ্ঞান করে রাখা হয়, যাতে সে মরতে না ভয় পায়। এই কাজের জন্য ভাঙ আর অন্য জিনিষ দিয়ে বিশেষ একটা পানীয় তৈরি করা হয়। তারপর তার নিকট আত্মীয়দের ওপর ভর করে তাকে চিতার চার পাশে কয়েকবার ঘোরান হয়। সেই সময় কয়েকজন লোক বাংলা ভাষায় গান গেয়ে তার প্রসংসা করে। আর বলে যে পরলোক তার স্বামীর সঙ্গে সে কি রকম সুখে থাকবে। এই সব অনুষ্ঠান হয়ে গেলে তাকে একটা বড় চিতার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় আর খুব চিৎকার আর হট্টগোল করা হয়। এই হট্টগোল যতক্ষণ না সব একেবারে শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ চলতে থাকে। তার ছাইগুলিকে গঙ্গার স্রোতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এমনি করেই অন্ধকারের রাজা এই সব হতভাগাদের আত্মাকে অনন্ত যাতনার মধ্যে নিয়ে যায়।

দশম থেকে চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

[এই পরিচ্ছেদ গুলিতে মানরিক তাঁর আরাকান যাত্রার ও সেখানে বাসের কাহিনী লিখেছেন। মানরিক মে মাসে হুগলিতে এসে পৌছান, আর সেপ্টেম্বর মাস অবধি হুগলিতেই থাকেন। এই কয় মাস তিনি বাঙ্গালা আর হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। এই সময় ডিয়াঙ্গা [চট্টগ্রামের কাছে একটি মিলিটারি বন্দর] থেকে একটি জেলিয়া করে কিছু পোর্তুগীজ হুগলিতে আসে। মানরিকের উপর হুকুম হয় যে তিনি যেন সেই জেলিয়া করে আরাকান যাত্রা করেন। হুগলি থেকে তিনি রওনা হন ১১ই সেপ্টেম্বর। মানরিক লিখেছেন যে হুগলি থেকে ডিয়াঙ্গা ৩০০ লীগ, কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে নদী বেয়ে তিনি চোদ্দ দিনেই ডিয়াঙ্গা পৌছে যান।

মানরিক প্রায় ছয় বছর আরাকানে ছিলেন। সেই সময় সেখানকার (মগ) রাজা ভাড়াটে পোর্তুগীজদের সাহায্যে বাঙ্গালা অঞ্চলে ডাকাতি করাতেন আর এখানকার লোকেদের দাস করে ধরে নিয়ে যেতেন। সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে মানরিক তাদের এই কাজ কে সমর্থন করেছেন। মানরিকের এরকম না করে উপায় ছিলনা, কারণ গোয়ার প্রধান ধর্মযাজক এই ডাকাতিকে উচিত বলে অনুমতি দিয়েছিলেন।]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ [প্রথম অংশ]

আমি এখন আমার অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ের ভ্রাতাদের আরাকান আর পেগু রাজ্যের ধর্মহীনদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার বর্ণনা করব। তার আগে এই রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলি। আমি আগেই বলেছি যে এই দুই রাজ্যে মহামুঘলের সাম্রাজ্যের চাটগাঁ ও আসাম প্রদেশের গায়ে। সেই মহাশক্তিশালী মুঘল এই দুই রাজ্য জয় করতে ও শ্বেত হস্তি আর টাজুর শঙ্খ অধিকার করবার ইচ্ছা রাখতেন। তাছাড়া তাঁর পেগু, শ্যাম আর কালমিনা (Calamina) রাজ্যেও অভিযান করবার ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু মূর্তিপূজক মগ রাজা মুসলমান মুঘলের উদ্দেশ্য ভাল করেই বুঝতেন, তাই দারোয়ানের মত রাজ্যের প্রধান দরজা, অর্থাৎ যেখান দিয়ে শত্রু ঢুকে পড়তে পারে, সেগুলি রক্ষা করবার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। স্থল পথে এই দরজা হল টিপারা আর আসামের দিকে যেখান দিয়ে চাটগাঁর মত প্রধান জায়গা আর মগ রাজ্যের কেন্দ্রে ঢুকে পড়া যায়। সমুদ্র পথেও এই রাজ্যে ঢুকে পড়া সহজ। শত্রু ইচ্ছা করলে ঢাকা বা ভুলুয়ার কোন বন্দর থেকে বেরিয়ে ছয় বা আট দিনে সাগর দ্বীপে (মানরিক ভূগোলের গোলমাল করে ফেলেছিলেন মনে হয়) পৌছতে পারে। এখানে থেকে খোলা সমুদ্র

ধরে সন্দ্বীপের খাড়ি যা প্রায় তিন লীগ চওড়া পেরিয়ে তারা পতঙ্গা [কর্ণফুলির ধারে] পৌছবে। পতঙ্গা একটি স্রোতস্বতী নদীর ধারে অবস্থিত। তার পর ডানদিকে পোর্তুগীজ বসতি ডিয়াঙ্গা নগর ছেড়ে তারা সোজা চাটগাঁর সামনে হাজির হতে পারে। আগেও কয়েকবার তারা এ রকম করেছে। ঢাকার নবাব বা ভাইসরয় আবদুল নবি আর ফতেহ জঙ্গ [নূরজাহান বেগমের মেসো] সত্য সত্যই এই সব পথে এসেছিলেন। দ্বিতীয় জন সমুদ্র পথে এসেছিলেন আর প্রথমজন স্থল পথে। সেই সময় দ্বিতীয় সালামিশা মগেদের রাজা। তাঁর কাছে যদি সেই সময় সাড়ে সাতশ জন মাইনে করা পোর্তুগীজ সৈন্য না থাকত তাহালে মুঘলরা নিশ্চয় চাটগাঁ জয় করে নিত।

এই দুই পথ ভাল করে রক্ষা করার জন্য মগ রাজা সব সময় পোর্তুগীজদের চাকরীতে রাখা ঠিক করেন। তাদের প্রধানদের তিনি ক্যাপ্টেন পদবী দেন, আর এই শর্তে কিছু জমিদারীও দেন যে তারা তাদের নিজেদের দেশের কিছু লোক সৈন্য হিসাবে রাখবে, আর কিছু জেলিয়া রাখবে। জেলিয়া একরকম দ্রুতগামী নৌকা আর গঙ্গাতে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ এগুলিতে আটত্রিশ জন করে দাঁড়ী লাগে। এরা ঐ ক্যাপ্টেনদের জমিদারীতে এই শর্তে থাকতে পায় যে দরকার পড়লেই কাজে এসে লাগবে। জমিদারীর আয় ছাড়া তাদের আর একটি অধিকারও আছে। তারা বাংলা রাজ্যে অর্থাৎ মহামুঘলের সাম্রাজ্যেও যেতে পারে। তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে যে তারা গঙ্গার ধারে দু তিন লীগ অবধি উজানে গিয়ে সব গ্রাম আর বসতি ধ্বংস করতে পারে, আর দামী জিনিষ পত্র আর তার সঙ্গে যত লোক পারে ধরে নিয়ে আসতে পারে। এই সব আক্রমণ গোয়ার প্রাদেশিক ধর্মীয় শাসক বর্গ উচিত বলে অনুমতি দিয়েছেন কারণ মুঘলরা অত্যাচারী আক্রমণকারী আর পরদেশ দখলকারী মাত্র নয়, তারা খ্রীষ্টান ধর্মের শত্রুও বটে। কারণ এদের ইচ্ছা যে প্রাচ্য দেশ থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম শেষ হয়ে যাক, আর এখানে যেন মুসলমান অর্থাৎ অলকোরানের অনুগামী বাদে কেউ না থাকে। কারণ তাদের বিশ্বাস যে তারা ছাড়া ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন আর কেউ নেই। তাই তাদের নাম মুসলমান বা মুসলীমান, যার অর্থ এদের অলকোরানের পণ্ডিত টীকাকারদের মতে "আমরা সত্যই নির্বাচিত জাতি, আমাদের রাজকীয় যাজক সম্প্রদায় পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের স্বনির্বাচিত মানুষ।"

এই মিথ্যা নীতিতে ডুবে আছে বলে যখনই তারা কোন খ্রীষ্টান বা ধর্মহীনের [হিন্দুর] কাছে নিজের বিশ্বাসের বা কাজের যুক্তি দেখাতে চায়, তখনই এরা খুব জাঁক আর গর্বের সঙ্গে বলে 'আমি মুসলমান'। যেন এই কুকুরেরা এই কথা বললেই যথেষ্ট যুক্তি হল। এই বর্বররা এতই অন্ধ যে আমাদের খ্রীষ্টানদের এরা কাফের বলে, যার মানে ধর্মহীন ব্যক্তি। তাই মগদেশের পোর্তুগীজরা সমানে এই সব লোকেদের উপর অভিযান করে, আর কিছু মগ জেলিয়াও প্রায়ই তাদের পিছু পিছু যায়।

সাধারণতঃ এরা বড় আক্রমণ বছরে তিন বা চার বার করে, তবে ছোট আক্রমণ তো সারা বছরই চলে। তাই যে পাঁচ বছর আমি আরাকান রাজ্যে ছিলাম সেই সময়

আঠার হাজার বন্দীকে এরা ডিয়াঙ্গা আর আঙ্গারকেল [Angaracale] বন্দরে আনে।

ঠিক মত উপদেশ ইত্যাদি দিয়ে আমি আর ফাদার ফ্রে মানুএল দেলা কনসেপ-সিওন আর ফ্রে ডিওগো কুলম এদের মধ্যে এগার হাজার চার শ সাত জনকে বাপ্টাইজ করি। আগে ফ্রে ডোমিঙ্গো এখানে প্রিওর ছিলেন। তাঁর সময় কুড়ি হাজারের উপর বন্দী এই বন্দরে আসে, আর বাপ্টিজমের রেজিস্টার অনুসারে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এদের মধ্যে ষোল হাজার নব্বই জন লোককে বাপ্টাইজ করেন।

[৩৪ পরিচ্ছেদ অবধি মানরিক তাঁর আরাকান বাসের কথা লিখেছেন এই সময় আরাকানের একটি বড় ঘটনা হল সেখানকার রাজা থিরি-থু-ধম্মর [শ্রীসুধর্ম] অভিষেক। এই সময়েই মানরিক গোয়া থেকে আদেশ পান যে তিনি যেন বাঙ্গালা-দেশে কিছু কাজ সেরে গোয়া চলে আসেন]

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে]

আরাকান থেকে ডিয়াঙ্গা রওনা হবার আর বাঙ্গালাদেশে আসবার পথে জাহাজডুবি হবার বিবরণ।

অনেক প্রাচ্য জাতির মধ্যে রাজা বা সম্রাটকে অভিষেকের সময় উপহার বা এদেশে যাকে আদিয়া (adia) বলে দেওয়া নিয়ম।

সেই অনুসারে আমিও রাজাকে আমার ভেট দিতে গেলাম। আমার সঙ্গে এস্টেভান ভেলেমোস নামে একজন পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনিও এই একই উদ্দেশ্যে ডিয়াঙ্গা থেকে এসেছিলেন। আমরা দুজনে এক সঙ্গেই আমাদের ভেট দিলাম। আমি এই সুযোগে রাজাকে অনুরোধ করলাম যে এখন যখন সব উৎসব শেষ হয়ে গেছে, তিনি যেন আমাকে ডিয়াঙ্গা যাবার অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করেন। রাজা উত্তর দিতে একটু দেরী করছেন দেখে আমার সাথী বলে উঠলেন যে ডিয়াঙ্গার খ্রীষ্টানরা বলাবলি করছে যে আমি নাকি আরাকানে বন্দী অবস্থায় আছি, আর তাই তারা এ বিষয়ে বেশ চিন্তিত আছে।

এই কথা শুনে সেই মহাশয় বললেন যে খ্রীষ্টানরা এই কথা বিদ্বেষের জন্য বলে কারণ তিনি যদি আমাকে বন্দী বলে ভাবতেন তাহলে তিনি কখনই আমাকে ভ্রাতার উপাধি দিতেন না। আমি তখন উঠে যথাবিহিত নমস্কার করে বললাম :

"সম্রাট বোয়াশাম (Boazam), ডিয়াঙ্গার খ্রীষ্টানরা আমাকে বন্দী বলে কারণ তারা জানে যে আপনি আমাকে কি রকম সম্মান আর কৃপা দিয়েছেন আর এখনও দেন। আর আপনার এই সব দয়ায় শুধু আমাকেই আপনার দাস করে রাখেননি, রাজ্যের অন্য সমস্ত খ্রীষ্টানদেরও বাধিত করে রেখেছেন।"

রাজা এই তোষামোদে সন্তুষ্ট হয়ে হেসে আমাকে প্রার্থিত অনুমতি দিয়ে দিলেন।

তার আগেই তিনি আদেশ দিলেন যে আমাদের দুজনকে যেন দুটি চুনি বসান আংটি দেওয়া হয়। আংটিগুলির দাম আমাদের টাকায় আশি পেসো করে। অবশ্য আংটির চেয়ে এই রাজ্য থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী।

তাই উৎসব শেষ হয়ে গেলে, আর প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট পাবার পর আমরা একটি দ্রুতগামী জেলিয়া করে কয়েকদিনের মধ্যেই ডিয়াঙ্গা পেঁীছে গেলাম। এখানকার ভ্রাতারা আর খ্রীষ্টান সম্প্রদায় আমাদের স্নেহের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন।

এখানে আমি বেশ ভাল করে কনফেস করবার জন্য তৈরি হলাম, কারণ প্রায় দুবছর কনফেস করাবার লোকের অভাবে আমি এই কাজ করতে পারিনি।

আমার কনফেশন হয়ে গেলে আমি ইণ্ডিয়াতে আমার অধ্যক্ষদের কাছ থেকে আর কাউন্ট লিয়্ঁারেস (Count Linares) যিনি তখন ভাইসরয় ছিলেন তাঁর কাছ থেকে যে আদেশ পেয়েছিলাম তাই পালন করবার জন্য যথা সম্ভব গোপনে কাজ আরম্ভ করলাম।

এই উদ্দেশে ফাদার একটি জেলিয়া তৈরি রাখার হুকুম দিলেন, যেন মনে হয় আমরা তাইতে করে লুটের খোঁজে যাব। এই কাজ ঠিক ভাবে হয়ে গেলে নৌকাটিকে শহরের দু লীগ নীচে পতঙ্গাতে নিয়ে যাবার হুকুম দেওয়া হল। এই খানে এক রাত্রে যখন সব একেবারে চুপচাপ, আমি নৌকাতে চেপে যথা সম্ভব বেগে রওনা হলাম আর ভোর হবার আগেই সন্দ্বীপে (Sundiva) পৌছে গেলাম।

তারপর সাবাসপুরের (Xabaspur, দক্ষিণ সাবাসপুর) দিকে এগিয়ে আমরা ডান দিকে প্রসিদ্ধ সোগোলদ্বীপ (Sogoldiva-এই নামে কোন দ্বীপ পুরানো ম্যাপেও নেই) পেরোলাম। বাংলা ভাষায় এই দ্বীপকে সবচেয়ে ধনপূর্ণ বলা হয়। মুঘল মগ আর পোর্তুগীজদের মধ্যে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলার দরুণ এই সব দ্বীপ এখন জনশূন্য হয়ে গেছে।

সাবাসপুর দ্বীপে বহু কাঁটাওয়ালা ফল পাওয়া যায়। অধিকাংশই লেবু জাতীয়। এখানে জমি এত উর্বর যে ভাল মালী ছাড়াই এই সব ফল জন্মায়।

এই দুই দ্বীপ ছাড়িয়ে আমরা সেই পুরানো আর বিশাল গঙ্গা নদীর একটি শাখায় ঢুকলাম। আমাদের পথ প্রদর্শক যে পথে বিশেষ নৌকা চলেনা সেই পথ দিয়ে আমাদের এগার দিন নিয়ে চলল। দুধারে শুধু ভীষণ জঙ্গল, আর গঙ্গার ধারে মাঝে মাঝে বড় বড় ভয়ানক কুমীরেরা রোদ পোয়াচ্ছে।

আমরা অনেক গণ্ডারও দেখলাম। এদের শিং যখন এরা বেঁচে থাকে তখন তাদের আক্রমণের কাজে লাগে আর এরা মরে গেলে মানুষের আত্মরক্ষার ওষুধ হিসাবে কাজে লাগে। (তখনকার দিনে মনে করা হত যে গণ্ডারের শিং বিষণাশক)।

নদীর শাখাগুলিতে আমরা এক রকম ছোট ছোট কুমীরও দেখলাম। এদের মধ্যে সব চেয়ে বড়গুলি দু মিটারের বেশী হবে না। এদের মুখ ছুঁচালো, আর বড়গুলির মত এরা হিংস্র আর মাংসভোজী নয়।

এগার দিনের দিন আমরা এই জনমানবহীন নদী ছেড়ে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ

এমন নদীতে ঢুকলাম যেখানে নৌকা চলাচল আছে। বেশ কষ্ট করে আমরা একটি প্রকাণ্ড চওড়া আর স্রোতস্বতী নদী পেরিয়ে হিজলি রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করলাম। এখান থেকে আরও দুদিনের পথ নিয়ে গেলেই ওরা আমাকে একটি খ্রীষ্টান বসতিতে পৌছে দিত। কিন্তু ঘটল এই যে আমার পাইকরা অর্থাৎ পেশাদার দাঁড়ীরা সকাল থেকে দুপুর অবধি দাঁড় টেনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা একটু নদীর ধারে নেমে বিশ্রাম করতে আর খেয়ে নিতে চাইল।

খাবার মানে শুধু ভাত। তবে তাদের অভ্যাস এই যে তীরে নেমে আগুন জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে নেয়। তাছাড়া এই বর্বরদের মিথ্যা ধর্মের একটা প্রধান নিয়ম এই যে আগে তেল মেখে স্নান না করে নিলে খেতে নেই। এতে তারা এক দুঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। তারা সবাই যখন এই কাজে লেগেছিল তখন একজন চৌকিদার গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল "বহর, বহর" (The fleet, the fleet)।

এই শব্দ শুনে পাইকরা যারা স্বভাবতই ভীরু, আমাদের ডাকাডাকি সত্বেও, কোন কথা না শুনে প্রাণের ভয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল। আমার দলে লুইস ট্রিগোরা বলে একজন পোর্তুগীজ আর তিন জন খ্রীষ্টান যুবক ছিল। এই অবস্থায় আমরা কিছুই করতে পারব না ভেবে আমরাও কয়েকটি বন্দুক তুলে নিয়ে সেই পাইকদের পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। ততক্ষণে দুটো হাল্কা কোশা (Cossa) খুব জোরে আমাদের দিকে এসে আমাদের নৌকা দখল করে নিল। তাদের কয়েকজন সৈনিক তীর ধনুক হাতে ডাঙায় নামল। সারা দেশটাই প্রায় জলের তলায় বলে, ওখানে ভীষণ কাদা। আমরা তাইতে আটকে যাচ্ছিলাম বলে তারা শীঘ্রই আমাদের কাছে এসে গেল। আমরা প্রাণ বাঁচাতে বা কমপক্ষে কষ্টকর আর দীর্ঘস্থায়ী বন্দীদশা থেকে বাঁচবার জন্ত যথা সম্ভব দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছিলাম।

অবশ্য শত্রু যখন প্রায় আমাদের ধরে ফেলেছে তখন আমরা ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁধে বন্দুক তুললাম। তারা যখন দেখল যে আমরা পোর্তুগীজ তখন তারা আমাদের আত্ম-সমর্পণ করতে বলল। তারা বললে যে যদি আমরা পালাতে সমর্থ হই তাহলেও বাঘের মুখ থেকে বাঁচব না। এই পুরো এলাকার বাঘেরা ভীষণ হিংস্র। আর যদি বা বাঘের মুখ থেকে বাঁচি তাহলেও এই জলা এলাকাতে পথ খুঁজে পাব না, আর আরও খারাপ ভাবে, অর্থাৎ না খেতে পেয়ে মরব। এই সব সদুপদেশের উত্তরে আমরা বললাম যে ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আমাদের এই সব বিপদ থেকে বাঁচাবেন। ইতিমধ্যে তারা যেন সময় থাকতে সরে পড়ে, কারণ তারা যদি না যায় তাহলে আমরা নিজেদের প্রাণ যত বেশী দামে সম্ভব বেচব, ঠিক করেছি। এই বিধর্মীরা (Pagans) আমাদের দিকে এগোতে সাহস করল না। শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা করল আমাদের পাইকরা কোন দিকে গেছে। এই প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিলাম না। তখন তারা আমাদের অনেক বার কাফের বা নাস্তিক বলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে অন্ত এক পথে পাইকদের খোঁজে চলে গেল। যতক্ষণ না তারা দৃষ্টির বাইরে যায়, আমরা সেইখানেই রইলাম। তারপর এই জলাভূমিতে যাতে চলা সহজ হয়, তাই আমরা সভ্যতা বাঁচাবার

জন্য যতটুকু না হলে নয় ততটুকু ছাড়া সব কাপড় খুলে ফেললাম। এমনি করে আমরা সন্ধ্যা অবধি চললাম। আমরা কোথাও পায়ের অর্ধেক অবধি, আর কোথাও বা এই জল আর কাদায় কোমর অবধি ডুবে যাচ্ছিলাম। আর তাছাড়া এই জলার অসংখ্য জেঁাক কামড়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে দিচ্ছিল।

শেষকালে একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে, আমরা পাঁচজন সবচেয়ে লম্বা গাছ যা দেখতে পেলাম তাইতে উঠে রাত কাটালাম। আমরা তখন ভিজে জবজবে আর আমাদের সারা গায়ে কাদা। তার উপর আরামের চূড়ান্ত করবার জন্ত ক্ষুধার্ত মশারা আমাদের ছেঁকে ধরল। এত বেশী মশা যে আমাদের যদি ব্রায়রিউসের (ইনি প্যাগানদের কাব্যে পৃথিবীর আর স্বর্গের সন্তান) মত একশটি হাত থাকত তাহলেও এই জ্বালাতনকারী পোকার হাত থেকে বাঁচতে পারতাম না। একদিকে ক্ষুধা আর এই মশার আক্রমণ আর অন্ত দিকে মানুষের সাহায্য পাবার কোন আশা না দেখে আমরা শেষে দৈবের শরণ নিলাম। যেমন প্রফেট বলেছেন "কষ্টে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে"। এই অতি সত্য বাক্যের উপর আমি আমার সঙ্গীদের ছোট একটি উপদেশ দিলাম। আমি তাদের মনে করিয়ে দিলাম যে আমাদের এই কষ্ট স্থির ভাবে সহ্য করা উচিত, আর এগুলিকে ঈশ্বরের করুণাময় হাতের আঘাত বলে মনে করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের পাপের জন্ত অনুতাপ করে তাঁর দিকে ফিরি। তিনি স্নেহময় পিতার মত আমাদের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন আর আমাদের কষ্ট থেকে বাঁচাবেন। আমাদের পেট্রন সেণ্ট পাপীদের কাছে শুধু এই টুকু চেয়েছিলেন যে তারা কষ্টে পড়লে যেন শুধু করুণাময় ঈশ্বরের দিকে তাকায়।

আমার এই ছোট উপদেশের পর আমরা যিনি সব কষ্টের শান্তি দেন সেই ঈশ্বরের মাতার ভজন গেয়ে দৈব সাহায্য চাইলাম। তারপর যে সব সেণ্টদের ভজন আমাদের মনে ছিল সেইগুলি গাইলাম। আমার একমাত্র জিনিষ যা আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম তা আমার ভজনের বইটি সেটি একেবারে ভিজে গিয়েছিল আর অন্ধকারে আমি সেটি পড়তে পারছিলাম না।

এই সব ধার্মিক আচার পালন করে, আর কিছু চোখের জল ফেলে আমরা সেই কষ্টের রাত্রি ভোর হবার আশায় কাটিয়ে দিলাম। আর যখন এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ভোর হয় না,—অবশ্য মরে না গেলে—তাই আলো ঝকমকে সুন্দর সকাল শেষ অবধি এল। কিন্তু আমাদের পক্ষে আগের দিনের দুঃখপূর্ণ ঘটনার জন্ত এ দিনটিও ছিল নিরাশায় ভরা। এই জঙ্গলের মধ্যে আমরা কি করব, আর জলায় ভরা এই জায়গা থেকে কি করে বেরোব সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। এই বিরাট বিরাট গাছের মধ্যে দিয়ে কোন দিকে যেতে হবে সে বিষয়ে আমাদের কারুর কিছু জানা ছিল না। তাছাড়া বাঘ, গণ্ডার আর অন্ত হিংস্র জানোয়ারে ভরা এই জায়গায় কোন লোকের দেখা পাওয়াও সম্ভব ছিল না। এই সব ভেবে আমাদের দুঃখ আর ভয় আরও বেড়ে গেল। কোন দিকে যাওয়া উচিৎ সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। দলের দুজন বলল যে যতক্ষণ না শুকনো জমি আর মানুষের বসতি পাওয়া যায় ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে চলা উচিত, আর পথে বেঁচে থাকবার জন্ত গাছে যথেষ্ট মধু

পাওয়া যাবে। আমরা আমাদের হাতিয়ার সব সময় হাতে তৈরি রেখে সাবধানে এগোব, আর আমাদের সঙ্গে যেহেতু পাঁচটি বারুদের বোতল আছে, আর থলি ভর্তি গুলি আছে, তাই বেশী গভীর জঙ্গলে বা কোথাও সন্দেহ হলে বন্দুক ছুঁড়ে যা কিছু আছে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াব, আর রাত্রে গাছের উপর ঘুমোব।

অন্য দুজন আর আমার মত ছিল ঠিক এর উল্টো। আমরা বললাম যে আমাদের ফিরে গিয়ে গঙ্গার ধার ধরে চলা অনেক নিরাপদ হবে, কারণ তাহলে হয়ত কোন নৌকা বা অন্য কিছুর দেখা পাব। আমাদের অবশ্য কুমীরের ভয় থাকবে। যেমন আগেই বলেছি কুমীরেরা রোদ পোয়াতে বা কোন হরিণ বা মোষ জলে নামল কিনা দেখতে জল থেকে বেরোয়। কিন্তু এদের এড়ান সহজ এরা সব সময়েই খোলা জমিতে থাকে। বাঘেরা বেশী চালাক। তারা লুকিয়ে থেকে শিকারের উপর পড়ে।

শেষ অবধি আমরা ঠিক করলাম যে যেখানে থেকে আমরা চলতে আরম্ভ করেছি সেখানেই ফিরে যাব। কারণ তাহলে আমাদের পাইকরা যে রান্না করা ভাত ভয়ে ফেলে পালিয়েছে তার মধ্যে কিছু পেয়ে যেতে পারি।

এই কথা ঠিক আমরা যে পথে আগের দিন এসেছিলাম সেই পথে ফিরে চললাম। ঘুম আর খাবারের অভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম বলে এই কষ্টকর জলা-ভূমি দিয়ে আমরা খুব ধীরে ধীরে চলতে পারছিলাম। পথ যদিও মাত্র এক লীগের কিছু বেশী হবে তবু সকালে বেরিয়ে গঙ্গা অবধি পৌছতে আমাদের বিকাল হয়ে গেল। তখন আবার দেখলাম যে যেখানে পৌছেছি সেটা আগের দিনের জায়গা নয়। আমরা তাই প্রায় হতাশ হয়ে পড়লাম। আমরা তখন শুধু দেহেই ক্লান্ত নয়, আমাদের মনও ভীষণ খারাপ। আমাদের সারা শরীরে জোঁকেরা রক্ত চুষে খাচ্ছে। তখন আর আমাদের এক পাও চলবার ক্ষমতা নেই। সকলেই তখন ঘাবড়ে গেছি, আর কেউ তো কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কোন রকমে নদীর ধারে কিছু শুকনো বালির জমি খুঁজে পেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করতে করতে আমরা জোঁক গুলোকে ধুয়ে ফেললাম। পুরো আধঘণ্টা আমরা কোন কথা না বলে শুয়ে রইলাম। তারপর আমি আমার সাথীদের কনফেস করে নিতে বললাম, যাতে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে যা কিছু করতে চান তার জন্য যেন আমরা তৈরী থাকি। সকলের কনফেস করা হয়ে গেলে আমি আমার নিজের পাপগুলি মনে মনে ভাবলাম আর ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলাম—অন্য পাদরির অভাবে আমার কনফেস করবার উপায় ছিল না। এই জরুরী কাজ হয়ে গেলে আমাদের মনে হল যে যদি আমরা মরবার জন্য ঐখানেই পড়ে থাকি তাহলে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা হবে। তাই আমরা উঠে পড়ে ঠিক করলাম যে যেমন আগে ঠিক করেছিলাম সেই মত আমরা যেখান থেকে হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই জায়গা খুঁজে বার করব। তাই নদী বরাবর চলে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আধলীগ মাত্র গিয়েই আগের দিন যেখান থেকে আমাদের বিপদ আরম্ভ হয়েছিল সেইখানে পৌছে গেলাম। এইখানে আমরা যা সবচেয়ে বেশী চাইছিলাম তাই পেয়ে গেলাম অর্থাৎ ভাত। তখন ভাত আমাদের কাছে সোনা, রুপা বা মণি মুক্তার চেয়েও

দামী। ভাত তখন প্রায় শুকিয়ে গেছে। আমাদের শত্রুরা ভাতগুলি পেয়েছিল তামা, মাটি, কাঁসার বা কাঠের থালায়। কাঁসা এক রকম ধাতু যাকে মুরিশ লোটন [Moorish loton] বলে, অনেকটা তামার মত। এগুলি খুব পরিষ্কার বলে খাবার জিনিষের বাসনের জন্য এদেশের লোকেরা খুব ব্যবহার করে। তারা মাটি, তামা বা কাঁসার বাসনে যা ভাত পেয়েছিল সেগুলি মাটিতে ফেলে বাসনগুলি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তাই আধশুকনো মাটি মেশান ভাত কুড়িয়ে নিয়ে দুটো কাঠের বাসনে রাখলাম। এগুলো সস্তার জিনিষ আর অতি সাধারণ ভাবে তৈরি বলে শত্রুরা ফেলে চলে গিয়েছিল।

কাঠের বাসন গুলিতে আমরা কিছু নুনও পেয়ে গেলাম। তাই তখন আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে—তখন আমাদের এই খাওয়াকেই ভোজ মনে হচ্ছিল —আমরা এই সঙ্কট সময় আমাদের এই সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। বাকি ভাত আমরা যথা সম্ভব পরিষ্কার করে নিয়ে আমাদের মধ্যে একজনের জামা দিয়ে বেঁধে নিলাম। ভাত ঠিকঠাক করে নিতে বেশ দেরী হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা বাকি রাত ঐখানেই কাটান ঠিক করলাম। এই জন্য আমরা সবাই মিলে অনেক শুকনো কাঠ জোগাড় করলাম। তার পর বন্দুকের ইস্পাতের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে খুব বড় একটা আগুন জ্বালালাম। যাতে আগে যে সব জন্তু জানোয়ারের কথা বলেছি তারা না আসে। এরা আগুন দেখলে পালিয়ে যায়।

এ সত্ত্বেও আমরা ঠিক করলাম যে আরও নিরাপদে থাকবার জন্য আমাদের মধ্যে দুজন করে হাতিয়ার হাতে সান্ত্রীর কাজ করবে আর বাকিরা ক্লান্ত প্রকৃতিকে তার দাবী মেটাবে।

এই ব্যবস্থা করে, ঈশ্বরকে আমাদের শরীর সমর্পন করে আর তাঁর পবিত্র মাতার ভজন গেয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করে, মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আর যদিও নরম তুলতুলে বিছানা ছিল না, বা পরিষ্কার চাদর পাতা ছিল না। তবুও এই শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসতে দেরী হল না। এই খানেই পালা করে ঘুমিয়ে আর পাহারা দিয়ে রাত কাটালাম, আর সকাল হলেই অনেকটা তাজা শরীরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিন আমরা নদীকে দৃষ্টিতে রেখে চললাম। পথে মাঝে মাঝে জলা ছিল। কোন মানুষের বসতি ছিল না। কিছু জোঁক যারা তাদের শুকনো শরীর আমাদের রক্তে ভরে মোটা করে নিচ্ছিল, তারা ছাড়া আর কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছিল না।

এমনি করে চলতে চলতে যখন দিন ফুরোতে কয়েক ঘণ্টা বাকি, তখন আমরা একটা খোলা জায়গায় পৌছলাম। জায়গাটা যদিও জলা মতন, তাহলেও দু একটা বড় গাছ সেখানে ছিল। এইখানেই আমরা রাত কাটান ঠিক করলাম। এর কারণ কতকটা এই যে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,আর কতকটা এই জন্য যে নদীর ওপারে একটা খোলা জায়গা দেখা যাচ্ছিল, যেটাকে বেশ শুকনো বলে মনে হচ্ছিল। নদী এখানে খুব চওড়া আর অগভীর বলে আমরা ঠিক করলাম যে পরদিন হেঁটে পার হয়ে ওপারে যাব। এই কথা স্থির করে আমরা আমাদের খাবারের পুঁজি খুললাম।

ভাত আমাদের কাছে আট দশ পাউণ্ড ছিল তাই স্থির করলাম যে কয়েকদিন একে চালাব। সেদিনকার যা বরাদ্দ তা খেয়ে নিলাম, কিন্তু এত শুকিয়ে গিয়েছিল যে জলে ভিজিয়ে তবে গিলতে পারলাম। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা একটা গাছে উঠে পড়লাম তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে তিনি যেন আমাদের ঐ জঙ্গলে মারা যেতে না দেন। এমনি করে আগের রাতের চেয়ে অনেক বেশী কষ্টে সেই রাত কাটালাম। কারণ খিদেতে পেট জ্বলছিল, আর ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আগের রাতে আমরা পালা করে পাহারা দিয়েছিলাম, কিন্তু এ রাত্রে আমাদের সমানেই সাবধান থাকতে হচ্ছিল পাছে গাছ থেকে পড়ে যাই।

সকাল হলে আমরা ওপারে যাবার জন্য তৈরী হলাম। যখন পার হতে যাচ্ছি তখন আমাদের মধ্যে একজন বলল যে প্রথমে দুজন ওপারে গিয়ে দেখে এলে ভাল হয় যে জায়গাটা সত্যই শুকনো কিনা, কারণ তা না হলে তো ওপারে যাবার দরকার নেই।

এই প্রস্তাব অনুসারে আমাদের সাথীদের মধ্যে দুজন পার হবার জন্য তৈরী হল। একজন লুইস ত্রিগেরোসের দাস, আর অন্যজন এলিপিও বলে একজন যুবক। এ সম্প্রতি খ্রীষ্টান হয়ে আমার সঙ্গে এসেছিল।

তারা জলে নামবার আগে আমরা সবকটি বন্দুক একসঙ্গে ছুঁড়লাম, কোন কুমীর এই শব্দে জেগে ওঠে কিনা দেখবার জন্য। জলে কোন নড়াচড়া না দেখে সেই দুই যুবক জলে নেমে পড়ল। তাদের বন্দুক গুলো তাদের কাঁধে ছিল, আর আমরা বাকিরা আমাদের বন্দুক হাতে পারে দাঁড়িয়ে রইলাম, যে দরকার হলেই ছুঁড়ব। এই সব সাবধান হওয়া একেবারে বৃথাই হল। কারণ ঐ দুজন জলে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, কোমরও ডোবেনি, তখন হঠাৎ একটা বিরাট কুমীর বেরিয়ে সেই দাস যে পিছু পিছু যাচ্ছিল তাকে লেজ দিয়ে আঘাত করল। সে লোকটি জলের উপর একটি রক্তের দাগ রেখে তলিয়ে গেল।

এই ব্যাপার দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে একেবারে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতে তৈরী বন্দুক অবধি ছোঁড়বার কথা আমাদের মনে হল না।

অন্যজন, এলিপিও প্রাণের ভয়ে বন্দুক ফেলে দিয়ে সাঁতরে পালিয়ে এলো। আমরা আমাদের সাথীর মৃত্যু আর আমাদের নতুন দুর্ভাগ্যে খুব শোকার্ত হলাম। আর ভাবলাম যে ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আমাদের যদি সাহায্য না করেন, তাহলে না জানি আমাদের ভাগ্যে আর কি আছে।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এই খারাপ সময়ে আর কি কি ঘটল তার বিবরণ।

আমাদের সাথীর এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা বাকি চারজন ভীষণ কাতর আর বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমরা ভাবলাম যে যদি প্রথম প্রস্তাব মত আমরা সকলেই জলে নামতাম তাহলে সকলেই এই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়তাম।

এই সব দুশ্চিন্তা ছাড়া আমরা আমাদের অন্য ভয়ের কথাও ভুলিনি। আমাদের চারিপাশের জমি জল এবং কাদায় ভর্তি আর যেখানে সে বিপদ নেই সেখানে বাঘ ও অন্য হিংস্র জন্তুতে ভরা। তাই আমরা ঠিক করলাম যে আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব। রাত্রে গাছে উঠে পড়ব আর দিনের বেলা গঙ্গার ধারে এসে দেখব যে কোন নৌকা ঐ পথে যায় কিনা। এমনি করে আমরা আড়াই দিন কাটিয়ে দিলাম। আমাদের সেই নিরাশার দিনে মনে হচ্ছিল যেন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এমনি করে আমরা না ঘুমিয়ে রাত কাটালাম। একদিকে খিদের কষ্ট, আর অন্য দিকে সেই মশার কামড় ছাড়া হাতি মাছির (Elephant fly) কামড়। এরা এক-রকম পোকা, আর এদের প্রতি কামড়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। (হাতি মাছি কাকে বলে তা জানা নেই।) এরা অবশ্য সংখ্যায় মশার চেয়ে কম, তবে আমরা অর্ধ উলঙ্গ ছিলাম বলে শুধু হাতে এদের কামড় এড়াতে পারছিলাম না। এই শয়তান পোকারা আমাদের কামড়ে এমন পাগল করে দিচ্ছিল যে কুমীরের ভয় না থাকলে আমরা জলের মধ্যে রাত কাটাতাম।

এই অবস্থায় আমরা শুধু এই কথাই ভাবছিলাম যে কখন মৃত্যু এসে আমাদের শেষ করে দেবে। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তো মৃত্যুর দেরী দেখে অস্থির হয়ে পড়ছিল। মানুষ যখন এমনিভাবে ভাবে, আর সাধারণ অবস্থায় যে জিনিষকে তারা সব চেয়ে বেশী ভয় পায় তাকেই আশীর্বাদ বলে মনে করে তখন তার কি ভয়ানক অবস্থা!

তবে ভগবান অসীম কল্যানকারী, তাই এমন কোন মরুভূমি নেই, এমন কোন দুর্গম জায়গা নেই যে পাপীর পাপ লুকান যেতে পারে। তেমনি এমন কোন জায়গা বা সময় নেই যেখানে ঈশ্বরের সাহায্য সর্বদাই না পাওয়া যায়।

তাই সেই স্বর্গীয় মহিমা আমাদের কষ্ট দূর করা ঠিক করলেন।

ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটল। তৃতীয় দিন, সূর্য যখন মাথার উপর, আমরা তিনজন নদীর ধারে বসে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম, তখন আমাদের বাকি সাথী যে গাছের উপর থেকে চারিদিকে নজর রাখছিল সে চিৎকার করে বলে উঠল, "ভাল খবর, ভগবান আমাদের ত্যাগ করেননি। দুজন লোক একটা ডিঙ্গি করে এই দিকে আসছে।"

ডিঙ্গি এদেশের এক রকম ছোট নৌকা।

আমাদের মতন অবস্থায় থাকলে এই খবর শুনে মনে কি ভাব হবে প্রত্যেকে নিজেরাই ভেবে দেখুন।

আমরা খুব খুশী হয়ে উঠে জলের ধারে যাবার জন্য তৈরি হলাম। ডিঙ্গিটা যেখানে আসছিল আমরা প্রায় সেখানে পৌঁছেছিলাম, এমন সময় আমাদের মনে হল যে আমাদের মধ্যে তিন জন লুকিয়ে থেকে শুধু এক জনই ওদের দেখা দিলে ভাল হয়। কারণ ওরা যদি আমাদের সকলকে বিশেষ করে পোর্তুগীজদের দেখে, তাহলে হয়তো পালিয়ে যাবে।

এই কথা ঠিক করে আমরা লুকিয়ে পড়লাম, আর একজন যুবক ডিঙ্গিটা যেদিকে আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল। তার ডাকে ওরা কাছে এল। সে বলল যে ভগবানের

দোহাই তাকে যেন নৌকাতে তুলে নেওয়া হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তুষ্ট হয়ে তারা তাকে তুলতে তাদের ছোট্ট নৌকা ডাঙ্গায় এসে লাগাল। সে যখন তাদের কথা বার্তায় ব্যস্ত রেখেছে, তখন সুযোগ বুঝে আমরা হঠাৎ সেখানে এসে পড়লাম। আমাদের দেখে তারা ঘাবড়িয়ে গিয়ে পালাতে যাচ্ছিল; কিন্তু আমরা কাধে বন্দুক তুলে বললাম যে নড়লেই গুলি করব। আমাদের মধ্যে দুজনকে পোর্তুগীজ দেখে তারা হতাশ হয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নেমে এসে আমাদের পায়ে এসে পড়ল। তারা ভেবেছিল যে আমরা চাটিগাঁয়ের (Chatigan) সেপাই আর আমরা তাদের দাস করে ধরে নিয়ে যাব। তাই তারা কেঁদে বলল যে আমরা যেন তাদের মগেদের হাতে না বেচি, তার চেয়ে বরং তারা পোর্তুগীজদের দাস হয়ে থাকবে। তাদের এই ভুল ধারণা দেখে আমরা তাদের নিশ্চিন্ত করবার জন্য বললাম যে তারা যা ভেবেছে আমরা তা নই; আমরা হুগলির সদাগর আর বন্জার বন্দরে যাচ্ছিলাম, সেই সময়ে মগেরা আমাদের নৌকা কেড়ে নিয়েছে। এই কথাও বললাম যে আমাদের মুঘল জলদস্যুরা আক্রমণ করেছিল। আমরা শুধু এই কথা চেপে গেলাম যে আমরা মগেদের রাজ্য থেকে আসছি।

আমাদের সব কথা শুনে আর আমরা বন্জা যেতে চাই শুনে তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে আর সাহস ফিরে পেয়ে আমাদের অনেক সেলাম করে বলল, "বাবুরা, এখন যখন আপনাদের কথা শুনে জানতে পারলাম যে আপনারা চাটগাঁ বা ডিয়াঙ্গার মগরাজার চাকুরে পোর্তুগীজ নন, তখন বন্জা যেতে হলে আপনাদের কি করতে হবে তা বলতে পারি। আপনারা যা হুকুম করবেন আমরা তাই করব, কারণ এখন আমরা আপনাদের হাতের মধ্যে। আপনারা নিজেরাই বুঝুন যে এই ছোট নৌকাতে আমরা সকলে বন্জা যেতে পারি না। আর যদি বা তা পারতামও তাহলেও আমাদের সঙ্গে অত চাল নেই। আর তাছাড়া আমাদের লুকিয়ে, যেখানে কোন মগ বা মুঘল যুদ্ধ জাহাজ নেই সেই পথে যেতে হবে, আর সে পথে কোন জনবসতিও নেই। তাই আপনারা যদি রাজি হন তাহলে এখান থেকে এক লীগেরও কম দূরে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। সেখানে আমরা আর আমাদের কিছু সঙ্গী গালা (লাক্ষা) বানাবার জন্য এই জঙ্গলে একটা গোলা বানিয়েছি। এই গালা আমরা হিজলি আর বন্জাতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি।"

"ছদিন হল দুটো বজরা গালা বোঝাই হয়ে হিজলি গেছে। তার মধ্যে একটা ফিরে এসে বাকি গালা নিয়ে যাবে। তখন আপনারা সেই বজরায় যেতে পারবেন। আপনাদের তিন চারদিনের বেশী অপেক্ষা করতে হবে না।"

এই খবর শুনে আমরা খুব খুশী হয়ে ভগবানকে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ধন্যবাদ দিলাম।

কিন্তু আমার পাপের জন্য তিনি এই আনন্দ বেশীক্ষণ থাকতে দিলেন না। কারণ যেই আমরা ভেবেছি যে আমাদের সব কষ্ট আর বিপদ বুঝি দূর হল অমনি গোলাতে এসে পৌছবার পর আমাদের আরও বেশী বিপদের মাঝখানে পড়তে হল।

আমাদের যারা এনেছিল এখানে তাদের আরও আটজন সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হল।

আমাদের যারা এনেছিল তারা এদের কাছে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা আর আমরা কি রকম না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছিলাম সেই সব কথা বলল। শুনেই তারা ভাত আর তরকারি সিদ্ধ করতে আরম্ভ করল। ভাত হয়ে গেলেই ওরা আমাদের সামনে ঘি আর মধু দিয়ে বেড়ে দিল। দারুণ খিদের মুখে সামনে খাবার দেখে আমাদের মনে তখন যেন স্বর্গের দরজা খুলে গিয়েছে। কিন্তু হায়, মানুষের দুর্বলতা আর দুঃখের যেন শেষ নেই।

পাছে অনিষ্ট হয় এই ভেবে আমরা পরিমিত ভাবেই খেলাম। আর তারপর ওদের বললাম যে যদি কিছু কাপড় থাকে তাহলে আমাদের পরতে দাও। আমরা বন্‌জাতে পৌছিয়েই তোমাদের ভাল দাম দেব। তারা বলল যে তাদের কাছে তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কাপড় নেই, তবে পরের দিন তারা নদীর ধারে দু লীগ দূরে একটা গাঁয়ে গিয়ে কিছু কাপড় নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তাদের কাছে যা ছিল তার মধ্যে থেকে দুটো কাপড় তারা আমাদের দিল। এগুলি ভীষণ নোংরা। এ দেশের লোক খুব তেল মাখে বলে কাপড়গুলি চিট্‌চিটে ছিল। তাহলেও এগুলি আমাদের বেশ কাজে এল। রাত্রে এই দিয়ে আমরা মশার কামড় থেকে পরিত্রাণ পেলাম আর আমাদের ক্লান্ত আর দুর্বল শরীর কিছু বিশ্রাম পেল।

এই কাপড়ের সাহায্যে মশার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা কয়েকটি তক্তার উপর শুয়ে পড়লাম। শুধু একজন অস্ত্র হাতে কেউ বুঝতে না পারে এমন ভাবে পাহারা দিতে লাগল। এমনিভাবে সাবধান থেকে আমরা রাত কাটালাম। সকালে সেই লোকেরা দরজা খুলে আমাদের ঘুম ভাঙাল, আর বলল যে তাদের সাথীদের ইতিমধ্যেই গায়ে আমাদের জন্ম কাপড় আর আমাদের খাবার জন্ম ছাগল যাকে এরা বকরী বলে তাই আনতে পাঠান হয়েছে। তারা তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আমাদের জন্ম খাবার বানাবে। তারা নিজেরা কাজে বেরোচ্ছে আর সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। এই সব মিষ্টি কথা বলে তারা আমাদের সন্দেহ দূর করল আর আমরাও বেশী সময় নষ্ট না করে দরজা বন্ধ করে এমন ঘুম লাগালাম যেন আমরাই বাড়ির মালিক। আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন ঐ দুজন লোক ফিরে এল, আর আমাদের জন্ম কাপড় না এনে নিয়ে এল মুগুর আর বন্ধন আর দুঃখ। কারণ এই দুই পাজি আমাদের খবর গাঁয়ের শিকদার অর্থাৎ আমরা যাকে আলকাল্‌দে মেয়র (Alcalde Mayor, গাঁয়ের ম্যাজিস্ট্রেট) বলব, তাকে দিয়ে এসেছিল। তারা গিয়ে বলে এসেছিল যে আমরা চারজন ফিরিঙ্গি, দুজন আসল আর দুজন কালো (এই ভাবে এরা পোর্তুগীজ বা সাদা খ্রীষ্টানদের আর এদেশী কালো বা ব্রাউন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তফাত করে)। কেমন করে আমাদের দেখতে পেয়েছিল আর তার পর আর কি কি হ'ল এ সব বলা ছাড়া তারা একথাও বলেছিল যে আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে।

শিকদার তাই সাব্যস্ত করল যে আমরা চাটগাঁয়ের জলসেনার লোক। তাই সারা এলাকায় নাম কেনবার জন্ম আর কটকের নবাবকে খুশী করবার জন্য সে ঠিক করল যে সে নিজে এসে আমাদের গ্রেপ্তার করবে। তাই প্রথমে সে সারা গাঁয়ে দামামা

(আমাদের কেটেলড্রামের মত একরকম বাজনা) বাজিয়ে দরকারী কাজ আছে জানিয়ে গাঁয়ের সব লোককে জড়ো করল। তারপর তাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান ষাট জনকে বেছে নিয়ে তাদের হাতে তীর ধনুক আর তলোয়ার দিয়ে দুটো বজরাতে চাপিয়ে আমাদের ধরে আনতে রওনা হল।

গোলাতে পৌঁছে প্রথমে তারা দুজন চর পাঠাল। তারা দুজন বাড়ির দরজায় পৌঁছে কোন শব্দ না পেয়ে বুঝল যে আমরা ঘুমোচ্ছি। শিকদার এই কথা শুনে হুকুম দিল যে সবাই নেমে গিয়ে যেন বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে কুড়ি জনকে বলা হল যে তারা যেন যথা সম্ভব শব্দ না করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমদের বন্দুকগুলো দখল করে নেয়। সেই চর দুজন সেই বাড়ির মালিক ছিল বলে তারা সহজেই দরজা খুলে দিল। আমরা এমনি গভীর ভাবে ঘুমোচ্ছিলাম যে যতক্ষণ না তারা সবাই আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে আমাদের দুর্দশা দেখে হেসে আর চেঁচিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছে ততক্ষণ আমরা কিছুই জানতে পারিনি।

আমরা চমকিয়ে জেগে উঠে যখন দেখলাম যে আমাদের বন্দুক নেই তখন আমরা ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেলাম। আমরা জেগেছি দেখে তারা আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ল, আমার আর অন্য দুজন যুবকের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। গোর্তুগীজ লুইস ত্রিগেরোসের কাছে একটা বড় ছুরি সব সময় থাকত। কোন রকমে দাঁড়াতে পেরে সে তাই দিয়ে তাকে যারা বাঁধছিল তাদের মধ্যে দুজনকে আহত করে দিল।

এই দেখে প্রায় ত্রিশ জন লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের উপর যদি হুকুম না থাকত যে আমাদের যেন প্রাণে না মারা হয়, তাহলে তারা তাকে টুকরো করে ফেলত। তাকেও এমনি পিছমোড়া করে বাঁধল।

এই একেবারে নিশ্চিত হয়ে তারা তাদের উল্লাস জাহির করা আরম্ভ করল, আর আমাদের গালাগাল দিতে ও আমাদের মুখে থুতু ফেলতে আরম্ভ করল। আমরা এও সইতাম যদিনা কুকুরগুলো আমাদের গালে চড় আর জুতো মারতে না আরম্ভ করত। এইখানে বলে রাখা ভাল যে যখন এই বিধর্মীরা কাউকে বিশেষ অপমান করতে চায়, তখন পা থেকে পুসার খুলে এই রকম ব্যবহার করে। এই পুসার এক রকম বড় জুতো আর এর তলা দু তিন ইঞ্চি মোটা। তার উপর যেগুলো সেপাইরা পরে তার তলায় পেরেক লাগান থাকে। এমনি ভাবে আমোদ করতে করতে তারা আমাদের শিকদারের কাছে নিয়ে গেল। এই লোকটি ডাঙ্গায় নেবে একটি কার্পেটের উপর জজ সাহেবের মত বসেছিল। আমাদের তার সামনে আনতেই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল আমরা কি ধরণের লোক। তাতে আমরা বললাম যে আমরা হুগলির লোক, আর বন্জা যাচ্ছিলাম। আমাদের কাছে সম্রাটের পরোয়াণা ছিল, আর আমরা মাল বেচতে যাচ্ছিলাম। সেই সময় আমাদের যা বিপদ ঘটে তা তাকে আগেই বলা হয়েছে। তাতে সে বলল যে সে পাকা খবর পেয়েছে যে আমরা চাটগাঁর জলসেনার লোক আর আমরা ডাকাত, আর আমরা সম্রাটের এলাকা লুট করতে এসেছিলাম। তারপর আমাদের কোন কথা না শুনে সে হুকুম দিল যে প্রাথমিক শাস্তি হিসাবে আমাদের পঞ্চাশ ঘা

করে চাবুক মারা হোক। হুকুমটা ছোট্ট আর পালন করা হল একেবারে চটপট। আমাদের চারটে গাছে বেঁধে দিল। তার পর মোষের কাঁচা চামড়ার চাবুক যাকে এরা গোরলা বলে তাই দিয়ে মারতে আরম্ভ করল। এমন নিষ্ঠুর ভাবে মারল যে আমাদের কাঁধের চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। এই চমৎকার কাজ হয়ে গেলে আমাদের পিছ-মোড়া করে বেঁধে তারা আমাদের দাঁড়ীদের পায়ের কাছে ফেলে দিল। তারপর ঢাক, ঢোল, বাঁশি বাজিয়ে তারা আমাদের হতভাগ্য দেহগুলিকে এমন ভাবে নিয়ে চলল যেন তারা মস্ত বড় জয়লাভ করে, শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাপতিকে ধরে নিয়ে চলেছে। এমনি পথে আনন্দ করতে করতে আমরা গাঁয়ে পৌছলাম। সেখানে প্রায় তিনশ লোকের বাস। এরা সবাই উত্তেজিত হয়ে আর ছোট ছোট দলে দাঁড়িয়ে শিকদারের ফেরবার অপেক্ষা করছিল।

খুব আনন্দ আর চিৎকার করে তারা তাকে অভ্যর্থনা করল। নৌকা থেকে নেমেই সে হুকুম দিল যে আমাদের যেন তার সামনে আনা হয়।

এই সময় সেখানে তিন জন কাজি মৌলানা এসে পৌছল। তারা শিকদারকে সেলাম করে আর তাদের প্রফেট মাওমেটের নামে তাকে আশীর্বাদ করে, আমাদের ধরে শিকদার যে কি রকম ভাল কাজ করেছে তাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে লাগল। তারা বলল যে আমরা কাফের অর্থাৎ ধর্মহীন আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত প্রফেটের শত্রু, আর ফোরকানে লেখা সত্যের বিরোধী। এই হাগারের (Hagar) বংশধরেরা তাদের কোরান কে ফোরকান বলে। তারা একথাও বলল যে এই কাজের জন্য সে পরকালে সেই সব সুখ পাবে যা কখন শেষ হয় না আর যার কথা পবিত্র প্রফেট খাঁটি মুসলমান-দের বিষয়ে বলেছেন।

এই ছোট বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে তিনজন হাত ধরাধরি করে যে দিকে অন্য লোকেরা ছিল সেই দিকে ঘুরে দাড়াল আর একজন দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল :

"হে সুখী মুসলমানেরা যারা আল্লা করিমের (যার মানে দয়ালু ঈশ্বরের) নির্বাচিত লোক আর আমাদের মহান প্রফেটের দয়ায় পবিত্র নিয়মের অনুবর্তী হয়েছো।" তার পর আমাদের দিকে হাত দেখিয়ে সে বলল, "তোমরা সবাই জানো যে এই কাফেরেরা স্বর্গ আর পৃথিবীর শত্রু। এরা স্বর্গের শত্রু কারণ যে নিয়ম পবিত্র আল্লা আমাদের পয়গম্বর মহম্মদকে দিয়েছেন এরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে। আর এরা পৃথিবীর শত্রু, কারণ, এরা এদের হতভাগ্য জীবনের দিনগুলি শুধু খারাপ কাজ করে কাটায়। এরা শুধু আমাদের লুট করে আর খুন করে, আর আমাদের রক্তে স্নান করে। এরাই আমাদের বন্দী করে আর হত্যা করে। এদের জন্তই আমরা বাপ, ছেলে, ভাই, স্ত্রী আর বন্ধুদের হারাই আর আমাদের বুকের রক্ত চোখের জল হয়ে আমাদের গালে ঝরে পড়ে।"

এই অবধি বলে সেই নীচ কুকুর আর শয়তানের অনুচর চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল।

এই কথা শুনে লোকে এত উত্তেজিত হয়ে গেল যে তারা আমাদের দিকে এগিয়ে

এল, আর তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের মেরেই ফেলত যদি না সেই শিকদারের হুকুমে সেপাইরা তাদের আটকাত। শিকদার এই মারমুখী উন্মাদ জনতাকে এই বলে শান্ত করল যে আমাদের নবাবের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার যাতে আমরা আমাদের পাপের শাস্তি যেন অনেকদিন ধরে যন্ত্রণা পেয়ে পুরোপুরি ভোগ করি।

এখানে হে দয়ালু পাঠক, আমি একটু অন্ত কথা বলেনিচ্ছি। যখন কোন বেচারা মিশনারী এই রকম বা অন্ত কোন রকম কষ্ট পেয়েছেন বলে বর্ণনা করেন তখন এমন বহু লেখককে দেখা যায় যে যারা বলেন যে পাদরিরা মঠের কষ্ট আর সংযমের চেয়ে বরং এই সব কষ্ট করতে বেশী ভালবাসে। মিশনগুলিকে ঠাট্টা করেন এমন অজ্ঞানী পাদরিও আছেন, এই কথা লেখা আমি যত কষ্টের কথা লিখেছি তার চেয়েও কষ্টকর।

শিকদারের কথায় গাঁয়ের লোকেদের উত্তেজনা একটু কমল। তারপর তারা বাজনা বাজাতে বাজাতে আর উৎসব করতে করতে আমাদের গাঁয়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে চলল। যদিও সত্তর জন সেপাই আমাদের পাহারা দিচ্ছিল, আর আমাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল, আমাদের কাঁধে রক্ত মাখা দাগ পড়ে ছিল, আমাদের মুখ ছড়ে গিয়েছিল আর জুতোর ঘায়ে তাতে কালশিটে পড়েছিল, আর তাছাড়া মুখের উপর এত কফ আর থুতু পড়েছিল যে অতি বড় শত্রুরও আমাদের দেখলে করুণা হবে, তবু এই বর্বর মুসলমানরা ভাবছিল যে আমাদের আরও কষ্ট দিলে তারা তাদের পাপের থেকে একেবারে মুক্তি পাবে। তাই তারা সেপাইদের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের তীর দিয়ে খোঁচাচ্ছিল বা লাঠি দিয়ে মারছিল। মেয়েরা আর ছোট ছেলেমেয়েরাও আমাদের মাটি বা অন্ত নোংরা জিনিষ ছুঁড়ে মারছিল। এমনি করে প্রায় আধমরা অবস্থায় আমরা শিকদারের বাড়ি পৌছলাম। এখানে এসে আমাদের এইটুকু আরাম হল যে আমাদের একটা আস্তাবলে দুটো হাতি আর সাতটা ঘোড়ার সঙ্গে রেখে দেওয়া হল। এখানে আমরা চার দিন ছিলাম। ছ জন তীরন্দাজ আমাদের পাহারা দিত। দিনে চারবার প্রহরীদের বদলে দেওয়া হত।

দিনের বেলা, কাছাকাছি লোকালয় থেকে লোকে ভীড় করে আমাদের দেখতে আসত, যেন আমরা কোন অদ্ভুত রকমের মানুষ। যখন তারা দেখত যে সেপাইরা থাকাতে তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তখন তারা আমাদের চেঁচিয়ে গালাগাল দিত। সন্ধ্যা বেলা চার থালা কালো কালো ভাত আসত, সেগুলি আবার মাছিতে ঢাকা। লোকগুলি এমন ভীতু যে আমাদের এই অবস্থাতেও তারা আমাদের ভয় পেত। তাই অতিরিক্ত সাবধান হয়ে আমাদের একজন একজন করে খেতে দিত। প্রথমে একজনের হাত খুলে তার খাওয়া হয়ে যাবার পর তার হাত আবার পিছমোড়া করে বেঁধে আর একজনকে খেতে দিত। এত সাবধান হয়ে তারা সারা দিন রাত্রে মাত্র এক বার আমাদের এই জঘন্ত খাবার খেতে দিত।

খাওয়া হয়ে গেলে খালি মাটিতে আমরা শুয়ে পড়তাম। এই রকম সব কষ্টের মধ্যে দিয়ে শিকদারের বাড়ি আমাদের চারদিন কাটল।

পঞ্চম দিন ভোর বেলা আট জন সেপাই অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সেজে এল। তারা আমাদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে আমাদের হাত খুলে দিল। তার পর আমাদের গলায় লোহার বেড়ি লাগিয়ে তার সঙ্গে লোহার শিকল লাগিয়ে আমাদের চারজনকে জুড়ে দিল। তারপর তারা আমাদের দুপাশে দুই সারি বানিয়ে আমাদের চলতে বলল। যখন আমরা গাঁ থেকে বেরোচ্ছি সেই সময় তাদের মধ্যে একজন আমরা তার ইচ্ছামাফিক জোরে চলছিনা দেখে রেগে চেঁচিয়ে বলল, "বোলাও 'বে···'"। বোলাও (বোধহয় 'চলাও' হবে) মানে তাড়াতাড়ি হাঁট। আর দ্বিতীয় শব্দটি এত খারাপ আর ক্যাথলিক-দের শোনবার পক্ষে এত অনুপযুক্ত যে এ বিষয়ে কিছু আর না বলাই ভাল। এই শব্দগুলি বলবার সময় সে হাতের ছড়িটা আমাদের মারবার জন্য তুলেছিল। ওদের নায়ক কাছেই ছিল। সে দেখতে পেয়ে তাকে খুব বকে দিল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে যেখানে অনেক খারাপ লোক আছে সেখানে অন্ততঃ একজন ভাল বা কম খারাপ লোক পাওয়া যাবেই।

আমরা নিঃশব্দে আর হতাশ ভাবে হেঁটে চলেছি দেখে এই লোকটির আমাদের উপর দয়া হল। আমাদের এই হতভাগ্য অবস্থা দেখলে বিজয়ীরও করুণা হবে। সে তাই আমাদের কাছে এসে বলল যে আমরা যেন শান্ত হই আর ভয় না পাই। কারণ যতক্ষণ আমাদের ভার তার উপর আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ না সে আমাদের মেদিনীপুর শহরে অন্যের হাতে দিয়ে দেয় ততক্ষণ আমাদের কোন ক্ষতি হবেনা। আমরা তার সহানুভূতির জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম আর বললাম যে ভগবান তার ভাল কাজের পুরস্কার দেবেন, কারণ তারা যা ভাবছে আমরা তা নই। আমরা হুগলির পোর্তুগীজ সদাগর আর কালো ফিরিঙ্গিরা আমাদের চাকর। একথাও বললাম যে যখন শিকদারের কাছে আমরা সম্রাটের নামে বিচার চেয়েছিলাম তখন সে আমাদের কথা কানে তোলেনি। তারা সবাই শুনেছে যে আমরা বিচার চেয়েছিলাম। সম্রাটের ফরমানে আমাদের রক্ষা করবার কথা লেখা আছে। তা সত্ত্বেও শিকদার আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছে।

আমাদের এ সব কথায় অবশ্য আমাদের প্রহরীরা খুশী হলনা। তারা বললে যে তাদের কোন দোষ নেই। তারা যা কিছু করেছে তা শিকদারের হুকুম মাফিক করেছে, আর সেই হুকুম মানতে তারা বাধ্য। তাই তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তারা আমাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করবে। আর তাদের সাথীরা যে আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে তার কারণ এই যে তারাও অন্যদের মতন ভেবেছে যে আমরা মগ জলসেনার লোক। মেদিনীপুর যদিও ওখান থেকে চারদিনের পথ, তবে আমরা যদি চাই তাহলে আরও সময় নিতে পারি, কারণ দু এক দিন বেশী হলে কিছু যায় আসেনা।

এই সব কথা বলে তারা আমাদের দুশ্চিন্তা খানিক দূর করল। আমাদের আরও অনেক প্রশ্ন করে তাদেরও বিশ্বাস হল যে তারা আমাদের যা ভেবেছিল আমরা তা নই।

সারাদিন এই সব কথা বলে সন্ধ্যার দুঘণ্টা আগে আমরা একটি ছোট গাঁয়ে

পেঁছিলাম। এইখানে আমাদের প্রহরীরা রাত্রে বিশ্রাম করার কথা স্থির করল। এখানে তারা আমাদের বেশ ভাল খেতে দিল। তখন এই জিনিষেরই আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল। খাওয়া হয়ে গেলে তারা কিছু নারকেলতেল আনাল যাতে আমাদের ঘায়ে লাগাতে পারি। আমরা কিন্তু তেল লাগাতে অস্বীকার করলাম আর বললাম যে আমরা এই অবস্থাতেই কটকের নবাবের কাছে যেতে চাই যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর শিকদার কি রকম অন্যায়ী লোক। আসলে অবশ্য আমরা আমাদের শরীরে এই তেল লাগাতে সাহস করিনি। পাহারাদারও যখন দেখল যে আমরা তাদের দয়া গ্রহণ করছিনা, আর তাও আবার এই জন্য যে আমরা রাজ প্রতিনিধির কাছে নালিশ করতে চাই তখন তারা একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেল যে আমরা সত্য কথাই বলছি। এর পর থেকে তারা আমাদের পোর্তুগীজ দুজনকে ঠাকুর আর সাহেব (Tacur and Saib) বলে ডাকতে লাগল। এ দুটি শব্দ আমাদের মহাশয়ের (Sir) মত। আমরা যখন শুতে গেলাম তখন তারা আমাদের জন্য দুটো মাদুর আর দুটো কাঁথা যাকে এদেশের পোর্তুগীজরা গুদরিন (gudrin) বলে তাই এনে দিল। এর উপর আমরা আগের রাত্রির চেয়ে একেবারে অন্য রকম ভাবে রাত কাটালাম।

এমনি করে আমরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম। আমাদের সঙ্গে এখন অনেক বেশী সদয় ব্যবহার করা হচ্ছিল। আমাদের ঘা গুলোর জন্য অবশ্য আমরা বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম। তাই যখন ষষ্ঠ দিনে আমরা মেদিনীপুর পেঁছিলাম তখন একে অন্যের মুখ দেখে যেন আমরা নিজেদের কষ্টের চেহারা আয়নায় দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের কষ্টের জন্য আমরা খুব কাঁদলাম। আমাদের মুখ ছড়ে তাতে ঘাম আর কাদা ভরে গিয়েছিল। আমাদের সারা শরীরে ঘা আর অন্য আঘাতের চিহ্ন ছিল, আর সেই সব ঘায়ে ময়লা ভরে ছিল।

এমনি করে এগারটার সময় আমরা মেদিনীপুর পেঁছিলাম। এখানে ত্রিশ হাজার লোকের বাস, তাই লোকে একে নগর বলে। তখন আমাদের গলায় বেড়ি, আর তাতে শিকল বাঁধা, আর আমাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। এই চেহারা নিয়ে আমরা শহরের লোকেদের আমোদের পাত্র হলাম। একটু এগিয়ে যখন আমরা একটা বেশ বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমি রাস্তা থেকে একটা ভগ্নপ্রায় বাড়ির উঠান দেখতে পেলাম। আমি নায়ককে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললাম যে আমাদের নজরের মধ্যে রেখে আমাদের যেন ঐ উঠানে কিছুক্ষণের জন্য যেতে দেওয়া হয়।

এখানে আমি আমার সাথীদের যারা হতাশ হয়ে পড়েছিল তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম :

"ভাই আর প্রিয় বন্ধুগণ, আমি এই উঠানে আসতে চেয়েছিলাম শুধু একটি কারণে। আমি দেখলাম যে আমাদের পূর্ব পাপের জন্য আমাদের অবস্থা কত কষ্টকর, আর আমাদের আরও কত অপমান সহ্য করতে হবে। কিন্তু যখন লজ্জায় অপমানে আমরা ভেঙে পড়ছি তখন এই কথা মনে রাখলে আমাদের উপকার হবে যে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিই যে আমাদের প্রভু আর সৃষ্টি কর্তা

শুধু আমাদের প্রতি প্রেমের জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অপমান আর কষ্ট পেয়েছিলেন যখন তিনি জেরুজালেমের বড় রাস্তাগুলি দিয়ে হেঁটে যান।

"তিনি শুধু এই কথা শেখাতে চেয়েছিলেন যে স্বর্গের দ্বার যা আমাদের পাপের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই সব কষ্ট করলে তবেই তা খুলবে।"

"তাই নিজেরাই বোঝ যে শান্ত হয়ে কত কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেলে তবে আমরা সেই দ্বার খোলা পাব। আর এই কথাই চার্চের স্বর্গীয় জ্যোতিস্বরূপ আমার প্রভু সেণ্ট অগস্টিন আমাদের শিখিয়েছেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যাতে লেখক তাঁর বন্দীদশার পরবর্তী ঘটনার কথা, তাঁর মুক্তি পাবার আর বন্‌জা রওনা হবার কথা বর্ণনা করেছেন।

তারা যা ভেবেছিল যে আমরা করব তা করছিনা দেখেত আমাদের প্রহরীরা আমাদের ডেকে বলল যে এখনও অনেক কিছু করা বাকি আছে। আর নগরের কোটাল (Cataul) এখনই আমাদের ভার নেবেন। আমরা যাকে নগরের শাসক (City Magistrate) বলি মুঘলরা তাকে কোটাল বলে।

তাই আমরা সেই রাজপথ দিয়ে আবার হেঁটে চললাম। শিকল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা কয়েকজন মানুষ যাচ্ছে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাস্তায় নানা রকম লোকের ভীড় জমে গেল। ছেলেরা আমাদের ডাকাত বলে চেঁচাতে লাগল। চারিদিকে ঘর, দোকান, কারখানা, ইত্যাদি থেকে ভীড় করে আমাদের এত লোক দেখতে এল যে প্রহরীরা অতি কষ্টে তার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পারছিল। সবাই প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি আর কেনই বা আমাদের শিকল বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রহরীরা যদিও কোন কথার জবাব দিচ্ছিল না আর লাঠি দিয়ে ভীড় সরাবার চেষ্টা করছিল তবু ভীড় তাতে কমছিল না। লোকে সমানে আমাদের হেসে ঠাট্টা করে গালাগালি দিচ্ছিল। এমনি মুশকিলের মধ্যে দিয়ে আমরা কোটালের বাড়ি পৌছলাম। সেখানে যাতে ভীড় ঢুকে পড়তে না পারে তাই প্রহরীদের উঠানের দরজা বন্ধ করে দিতে হল।

ভিতরে ঢুকতেই আমাদের কোটালের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি একটা সুন্দর কার্পেটের উপর লাল ভেলভেটের তাকিয়ার মধ্যে বসে ছিলেন। সেই কার্পেটেই অন্য কয়েকজন লোক বসেছিল। বোধহয় উচ্চ পদস্থ লোক হবে। তাদের মধ্যে দুজন দাবা খেলছিল।

যেই আমরা সেখানে পৌছলাম, আমাদের প্রহরীদের নায়ক বলল যে আমরা যেন মাথা নত করে কোটালকে সেলাম করি। সে নিজেও যথাবিহিত সেলাম করে তাঁকে শিকদারের দেওয়া চিঠি দিল। চিঠিটা পড়ে তিনি হুকুম দিলেন যে আমাদের যেন তাঁর

সামনে নিয়ে আসা হয়। আর, একজন কর্মচারীকে চিঠিটা চেঁচিয়ে পড়তে বললেন। চিঠিতে সেলামের পর লেখা ছিল যে আমরা দস্যু, আর চাটগাঁর জলসেনার লোক, আর সম্রাটের এলাকায় ডাকাতি করবার সময় ধরা পড়ি। এই বর্ণনার মধ্যে অজস্র মিথ্যা কথা ছিল। আর শেষে এতে লেখা ছিল যে আমরা বিদেশী বলে আমাদের নবাবের দরবারে পাঠান হচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ পড়া হয়ে গেলে কোটাল আমাদের জবাব চাইলেন। পোর্তুগীজ লুইস ত্রিগেরোস আমার চেয়ে ভাল হিন্দুস্থানী জানত, এত সুন্দর ভাবে সে এই ভাষা বলত যে এদেশের লোক আশ্চর্য হয়ে যেত। সেই আমাদের তরফ থেকে বলতে আরম্ভ করল। প্রথমে সাধারণ নমস্কারাদি করে সে বলল,

"হুজুর, এই সামনে যাঁকে (আমার দিকে দেখিয়ে) দুর্ব্যবহারের জন্য এই হীন অবস্থায় দেখছেন ইনি একজন পাদরি। এই থেকেই প্রমাণ হবে যে চিঠিতে এঁকে যা বলা হয়েছে ইনি তা নন। আমি নিজে হুগলির একজন সদাগর, আর এই দুজন কালা ফিরিঙ্গি আমাদের চাকর।"

"আমরা একটা বজরায় করে হুগলি থেকে বনজা যাচ্ছিলাম। সেই সময় আমাদের মগ জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়। তখন আমাদের বজরা তীরে এনে বন্দুক ([Bunducos]—মাস্কেট [Musket] কে এরা বন্দুক বলে)—হাতে পালান ছাড়া উপায় ছিলনা।"

তারপর সে বলল যে সম্রাটের আজ্ঞা যে চুক্তি অনুসারে সব পোর্তুগীজ পাদরিদের আর সদাগরদের যথেচ্ছ ভাবে আসতে দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও আমাদের ধরা পড়ার পর কি অবস্থা হয় সে তার বর্ণনা করল। সে এই কথাও বলল যে এই চুক্তিরই ভরসায় আমরা শিকদারের কাছে বারবার সম্রাটের নামে বিচার চেয়েছি। কিন্তু সে কোন কথা শোনেনি, সে আমাদের চোরের মার মেরে কি অবস্থা করেছে আমাদের শরীরের ঘাই তার প্রমাণ। তাই আমরা শুধু নবাবের কাছ থেকে নয়, এমনকি সম্রাটের কাছে নালিশ করে বিচার চাইব। কোটাল সহানুভূতি দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন আর বললেন যে আমরা সুবিচার পাব। আমরা বসলে পর তিনি দুজন কেরানিকে ডেকে পাঠালেন। তারা আমাদের নাম, আর লুইস ত্রিগেরোস যা যা বলেছিল সব লিখে নিল। আর তাছাড়া আমাদের সারা শরীরে দুর্ব্যবহারের জন্য ঘা ছিল আর আনবার সময় আমাদের হাত পিছ মোড়া করে বাঁধাছিল আর গলায় বেড়ি আর শিকল বাঁধা ছিল, সে কথাও লিখে নিল। এই সব হয়ে গেলে তারা আমাদের প্রহরীদের নায়ককে একটা চিঠি দিয়ে বিদায় করল। এতে নিশ্চয় ওর আনা চিঠির জবাব ছিল। প্রহরীরা যাবার আগে খুব নম্র ভাবে আমাদের কাছ থেকে বিদায় আর ক্ষমা চেয়ে গেল। আমরাও তাদের দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম আর বললাম যে যদি আমাদের আবার কখন ভাল অবস্থায় দেখা হয় তাহলে এর ঋণ শোধ করব। তারা চলে যেতেই কোটাল আমাদের হাত খুলিয়ে দিলেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন যে শহরে আমাদের কোন চেনা লোক আছে কিনা। আমরা বললাম কেউ নেই। তিনি তখন বললেন যে শহরে কিছু মুসলমান ব্যবসায়ী আছেন যারা হুগলির পোর্তুগীজদের সঙ্গে কারবার করেন। তিনি তাঁদের ডেকে

পাঠিয়েছেন। তাঁরা শীঘ্রই এসে হাজির হলেন। তিন জনই মুসলমান আর তাঁদের পোষাক দেখে মনে হল যে তাঁরা ধনী আর অভিজাত।

নিজেদের মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলবার পর তাঁদের মধ্যে একজন এসে পোর্তু-গীজ ভাষায় আমাদের অভিবাদন করলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি পাদরি কিনা। আমি হ্যাঁ বলাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি বন্‌জার পাদরিকে জানি কিনা। আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর তিনি হুগলির পাঁচ ছজন পোর্তুগীজের নাম করে বললেন যে তাঁরা তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি আরও বললেন যে যদিও এরা সবাই তাঁর বন্ধু তবে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করেন পাদরি ফ্রে দিগো দিলা কনসেপসিওন কে। এঁর সঙ্গে তাঁর কুড়ি বছরের অন্তরঙ্গতা আর এঁকে ইনি নিজের পিতার মত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর উপর তাঁর খুব বিশ্বাস আর এই জন্যই তাঁর ছেলেকে পোর্তুগীজ ভাষা শেখবার জন্য তাঁর কাছে দিয়েছিলেন। তাই আমি যদি সত্যই পাদরি হই তাহলে তাঁকে আমার চিঠি লেখা উচিত আর সে চিঠির জবাব ন'দিনের মধ্যেই এসে যাবে। যদি ফাদার তাঁকে লেখেন যে আমি পাদরি তাহলে তিনি আমার ও আমার সাথীদের জন্য উত্তরদায়ী হবেন, আর যতদিন না নবাব পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ছেড়ে দিচ্ছেন ততদিন তিনি আমাদের নিজের বাড়িতে রাখবেন। আমরা এই রকম অবস্থায় ফাদার দিগোর এত বড় একজন বন্ধুর দেখা পেয়ে আনন্দোল্লাসিত হলাম; আর একে ঈশ্বরের বিশেষ দয়া এই কথা মনে করে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিলাম। আমরা সেই মুসলমান ভদ্রলোককে বললাম যে ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় আমাদের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য আমাদের এই বিপদে পোর্তুগীজদের একজন বন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমরা তারপর তাঁকে বললাম যে তিনি যেন কোটালকে আমাদের এমন জেলখানায় পাঠাতে বলেন যেখানে আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা হয়, কারণ এখন আমাদের এমন দুর্দশা আর আমরা এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে আর কষ্ট সহ্য করতে পারব না।

আমাদের এই অনুরোধে সেই সদাগর বললেন যে যেহেতু আমরা চাটগাঁর জল-সেনার পোর্তুগীজ বলে ধরা পড়েছি তাই কোটালের আমাদের সাধারণ জেলখানা যাকে এদেশে বন্দীখানা [Bundicana] বলে সেখানে পাঠান ছাড়া উপায় নেই। তবে তিনি নিজে আমাদের খাবার, বিছানা, আর ঘায়ের ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন।

তিনি একথাও বললেন যে গলার বেড়ি আর শিকল খোলান এখন শক্ত হবে তবুও তিনি আর তাঁর বন্ধুরা চেষ্টা করবেন যে শিকলগুলি অন্ততঃ যেন খুলে ফেলা হয়, যাতে আমরা একজন আর একজন থেকে আলাদা হতে পারি। আমরা তাঁকে এই কথা বলার জন্য যথা সম্ভব নম্র আর বিনয়ী হয়ে জবাব দিলাম, কারণ প্রয়োজন সবাইকে বিনয়ী করে।

এই সব কথাবার্তা হয়ে গেলে তিনি কোটালের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন। কোটাল তখন আমাদের বন্দীখানা অর্থাৎ সাধারণ জেলখানায় পাঠিয়ে

দিলেন, আর বললেন যে আমরা যদি যা বলছি তাই হই তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই।

আমাদের মুসলমান বন্ধু মহাবত খান [Moboto Kan]—ফাদার দিগোর বন্ধুর নাম এই ছিল,—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। কোটালের সেপাইরা আমাদের প্রধান জেলারের কাছে হস্তান্তরিত করে দিলে পর তিনি পাশে গিয়ে তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। জেলার তার কিছু পরেই লোক পাঠিয়ে আমাদের শিকল খুলিয়ে দিল। এই সাহায্যের জন্ম আমরা আমাদের বন্ধুকে আবার ধন্তবাদ দিলাম। তিনি তখন চিঠি লেখবার সরঞ্জাম আনালেন, আর আমরা চিঠি লিখে দিলাম। আমি লিখলাম ফাদারকে আর আমার সাথী লিখল বন্‌ডার ক্যাপ্টেন তোম ভাস গারিদো কে। আমরা আমাদের যা যা ঘটেছে লিখলাম, আর কি করলে আমরা ছাড়া পাব তাও লিখলাম। আমাদের লেখা হয়ে গেলে তিনি আমাদের আর আমাদের চাকরদের জন্ম বিছানা আনালেন, আমাদের ঘায়ের জন্ম ডাক্তার [Surgeon] কে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে ঘা পরীক্ষা করে বললেন যে সেগুলি বেশ গুরুতর, তবে ইনশা আল্লা [En xala] তিনি সেগুলি সারিয়ে ফেলবেন। এই শেষ কথাটির বিষয়ে খ্রীষ্টানরা নোট করবেন, এটা অনেকের পক্ষে শিক্ষণীয় হতে পারে। এদেশের মুসলমানরা যদিও বর্বর আর অবিশ্বাসী তবু তারা যে কাজ এখনই করবে বা ভবিষ্যতে করবে বলে ঠিক করে তাতে তারা ঈশ্বরকে সব সময় সামনে রাখে। তখনই কোন কাজ করতে হলে তারা বলে বিসমিল্লা [Bisimila] যার মানে "ঈশ্বরের নামে"; আর ভবিষ্যতে যদি কোন কাজ করতে হয় তাহলে বলে ইনশা আল্লা অর্থাৎ যদি 'ঈশ্বর ইচ্ছা করেন'।

ডাক্তার যখন বললেন যে আমাদের ঘা সারিয়ে দেবেন তখন আমরা তাঁকে চার টাকা দেব বললাম। তাই দিয়ে তিনি ওষুধ আনতে গেলেন। আমাদের শুভাকাঙ্খী ভদ্রলোক তখন এই বলে চলে গেলেন যে তিনি প্রতিদিন আমাদের দেখতে আসবেন; আর এখনই একজন চাকর খাবার নিয়ে আসবে, আর আমাদের দেখাশোনা করবার জন্য থাকবে। মহাবত খান চলে যেতেই আমরা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন আমাদের বিশ্রামেরই সব চেয়ে বেশী দরকার ছিল। বিছানাগুলি তক্তার উপর পাতা ছিল কারণ মুঘলদের নিয়ম অনুসারে জেলে বন্দীদের খাট ব্যবহার করা বারণ। এই সময় ডাক্তার একটা বাটিতে নারিকেল তেলে ভেজান গুঁড়ো ওষুধের পাতা নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু কাপড়ের টুকরাও ছিল। প্রত্যেকের জন্ম যতখানি দরকার ততখানি কাপড় ছিঁড়ে সেই ওষুধ মলমের মত করে তাতে লাগিয়ে নিলেন। এগুলি দিয়ে আমাদের ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তিনি আমাদের আবার শুতে পাঠিয়ে দিলেন। সকলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে, আমাদের জন্ম যা খাবার পাঠান হয়েছিল আমরা সে গুলি শেষ করতে বসলাম। যা খাবার বাঁচল তাতে আরও কয়েকবার খাওয়া চলত।

আমাদের দুর্বল শরীরকে তার প্রথম প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে আমরা দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্থাৎ বিশ্রামের জন্ম তৈরী হলাম। কিন্তু ওষুধগুলি শরীর থেকে এত তেজের সঙ্গে বিষ বার করতে লাগল যে ব্যথায় চোটে আমরা সারারাত ঘুমোতে

পারলাম না। সকালে ডাক্তার এসে যখন আমাদের ব্যাণ্ডেজ খুললেন তখন আমরা দেখলাম যে আমাদের ঘা গুলি যদিও তাজা আছে, কিন্তু একেবারে পরিষ্কার। আমরা যে কষ্ট পেয়েছিলাম সে কথা বলতে তিনি আমাদের এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে সব চেয়ে খারাপ যা হবার তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর আমাদের ঘায়ের উপর খুব পুরু করে একটা পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে তিনি আমাদের নতুন কাপড় দিয়ে আবার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

পঞ্চম দিনে তিনি যখন এসে আমাদের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিলেন তখন দেখলাম যে আমরা একেবারে সেরে গেছি। আমাদের ঘা শুকিয়ে গিয়ে একেবারে মিলিয়ে গেছে। চিকিৎসার শেষ হিসাবে তিনি আমাদের গরম জলে স্নান করে নিতে বললেন। এই স্নানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি যে কি পাউডার ব্যবহার করেছিলেন তা জানবার জন্য আমরা তাঁকে ভাল দাম দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তবে তিনি বললেন যে তিনি আমাদের আধ বিস্সা [bissa] অর্থাৎ দু পাউণ্ড এই পাউডার বেচতে রাজি আছেন। আমি আর লুইস ত্রিগেরোস চারটাকা দিয়ে পাউডার কিনে ভাগাভাগি করে নিলাম। এই পাউডার পরে দামাস্কাসের তুর্কীরা আমার অন্য সম্পত্তির সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই ঘটনার কথা আমি যথাসময় বলব।

বন্জার ফাদার আর ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জবাব আসতে যে কদিন লাগল সে কদিন আমাদের মুসলমান বন্ধু রোজ আমাদের দেখতে আসতেন আর আমাদের যা কিছু দরকার তা খুব যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। ন দিন এমনি করে কেটে গেল। আর শেষ দিন ঠিক সময় ডাক এল। তাতে আমাদের চিঠির জবাব ছিল আর বন্জার ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নবাব আর কোটালের নামে আর ফাদারের কাছ থেকে মহাবত খানের নামে চিঠি ছিল। মহাবত খান ফাদার ক্রে দিগোর চিঠি পেয়ে আমার কাছে এসে আমার হাত চুম্বন করলেন, আর বললেন যে তিনি তখনই কোটালের কাছে চিঠি আর আমাদের জন্য জামিন নিয়ে যাচ্ছেন যাতে তিনি আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। আর নবাবের জন্য যে চিঠি সেটা তিনি তখনই তাঁকে দেবেন না, কারণ চিঠিটা দেওয়া উচিত হবে কিনা তা তিনি ভেবে দেখবেন। তিনি তারপর চলে গেলেন, আর আমরা তখন আমাদের চিঠি গুলি পড়লাম। সেগুলির মোট কথা এই ছিল যে মহাবত খানকে আমাদের সব রকম সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পরদিন ভোর বেলা মহাবত খান চবুতরার বেদী বা উঁচু জায়গা যেখানে বসে বিচার করা হয়—কাছারি অর্থে, দুজন কর্মচারী কে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তাঁরা আমাদের জামিন স্বীকার করলেন, আর আমাদের গলার বেড়ি খুলে দিয়ে আমাদের মহাবত খানের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি আগেই চারটি পর্দা দিয়ে ঢাকা ডুলি আমাদের জন্য আনিয়ে রেখেছিলেন। যেমন আমি আগেই বলেছি ডুলি এক রকম পালকি [litter]। এই গুলিতে তিনি আমাদের চুপিচুপি তাঁর বাড়িতে সরিয়ে ফেললেন। এখানে এসে আমরা স্নান করলাম এরই আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার

ছিল। তারপর তিনি ওষুধ ইত্যাদি দিয়ে, এত ভাল ভাবে দেখা শোনা করলেন যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের স্বাস্থ্য আর শক্তি ফিরে পেলাম।

ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম যে সেই শিকদার যে আমাদের ধরেছিল সে এই কথা জানতে পেরেছে যে সে যা অভিযোগ করেছিল আমরা তা নই, এই কথা জেনে সে নিজের কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে কোটাল আর মহাবত খানের কাছে এই অনুরোধ করতে লাগল যে আমরা যেন কটকের নবাবের কাছে নালিশ করার সংকল্প ছেড়ে দিই। আমরা জানতাম যে এতে তার বেশ কিছু খরচ হচ্ছে আর আমাদের বন্ধুর তাতে বেশ দু পয়সা লাভ হচ্ছে। তাই আমরা চুপ করে রইলাম আর নবাবকে লেখা চিঠি কোন কাজে লাগালাম না। কোটাল নবাবকে আমাদের বিষয়ে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন; তাতে তিনি শিকদারকে যথা সম্ভব বাঁচিয়ে এই কথা লিখেছিলেন যে সে আমাদের ভুল খবর পেয়ে গ্রেপ্তার করে। তবে তাঁর রিপোর্টে তিনি এই কথা চেপে গিয়েছিলেন যে আমি একজন পাদরি। তাছাড়া আমাদের যে ভীষণ অপমান করা হয়েছিল সে কথাও তিনি লেখেননি।

এই সব কৈফিয়ত সত্ত্বেও নবাব তাকে আমাদের যাত্রার খরচের জন্য দু'শ টাকা জরিমানা করলেন, আর হুকুম দিলেন যে ছয়জন সেপাই তারই খরচে আমাদের বন্জা বা হুগলি অবধি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা জেল থেকে বার হবার চোদ্দ দিন পরে এই হুকুম এসে পৌছল। হুকুম পেয়ে কোটাল আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমাদের তাঁর কাছে যাবার জন্য তিনি দুটো ঘোড়া আর চারজন লোক পাঠিয়েছিলেন। তখন আমাদের বন্ধু আর জামিনদারের দেওয়া মুঘল পোষাক পরে আমরা খুব জাঁক জমক করে তাঁর সঙ্গে চবুতরাতে গেলাম। সেখানে কোটাল দরবার করে বসেছিলেন। সেখানে তিনি নবাব আমাদের শত্রু শিকদারকে শাস্তি দিয়েছেন তা তার প্রতিনিধিকে পড়ে শোনালেন। আমরা কোন জবাব দিলাম না—জবাব না দেবার কারণ আগেই বলেছি। কোটাল এই কথা লক্ষ্য করে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা কি শিকদারকে যা শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হইনি। তাতে আমার সাথী বলল যে এত বড় ক্ষতির পক্ষে শাস্তি অত্যন্ত সামান্য হয়েছে। তবে সে এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে সে একজন পাদরির সঙ্গে এই ক্ষতি ভোগ করেছে। আর পাদরিদের পেশায় তো এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়। এছাড়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হিসাবে তারও ঈশ্বরের জন্য এটা সহ্য করা উচিত। আর তা ছাড়া একমাত্র পবিত্র সত্য ধর্মের অনুসারী বলে সে শুধু ঈশ্বরের নিযুক্ত পুরোহিতের কাছেই বিচার চাইতে পারে।

এই জবাবে কোটাল বিশেষ খুশী হলেন না। তাঁর মুখ শুকিয়ে যাওয়াতে একথা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। তখন আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন: "পাদরি জিউ [Padre giu-অর্থাৎ আমাদের ভাষায় শ্রদ্ধেয় মহাশয়] আপনি কি চান যে আমরা শিকদারের বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করি ?"

আমি বললাম, "না"। আর তাছাড়া একথাও বললাম যে বরং আমি আর আমার

সাথীরা চাই যে নবাব তাকে যা শাস্তি দিয়েছেন তা থেকেও তাকে রেহাই দেওয়া হ'ক। আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রেমের জন্ত আমরা তাকে, সে আমাদের যে অপমান আর কষ্ট দিয়েছে তার জন্তও ক্ষমা করতে চাই। আমার কথা শেষ হতেই কোটাল হেসে বললেন "সাবাস পাদরি জিউ [Xabas Padre giu]"; আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যত লোক ছিল তারা বার বার এই 'সাবাস' কথাটি বলতে লাগল। কৌতুহলী পাঠকদের বোঝবার জন্ত বলে দেওয়া উচিত যে 'সাবাস' একটি প্রশংসা-সূচক শব্দ আর কেউ কোন বীরত্বের বা বাহাদুরীর কাজ করলে এই শব্দ বলে তার খুব প্রশংসা করা হয়।

এইবার সবাই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে তারা আমাদের দু'শ টাকা আর ছয় জন সেপাইর মাইনে দিল। কিন্তু আমরা এগুলি কিছুতেই নিতে রাজি হলাম না—এমন কি কোটাল আমাদের নিজে অনুরোধ করা সত্ত্বেও। তাঁকে আমি এই জবাব দিলাম যে পোর্তুগীজরা নিজেদের রক্ত বিক্রি করে না, তবে ঈশ্বরের প্রেমের জন্য নিজে তা থেকে দান করে। এই বলার পর ব্যাপারটা শেষ হল, আর কোটাল বিচারকের আসন থেকে উঠে পড়লেন। তিনি তখন আমাদের বললেন যে তিনি আমাদের মেহমানী [Memane] করতে চান, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে খেতে বলতে চান, আর আমরা যেন মহাবত খানকে নিয়ে তাঁর বাড়ি যাই।

এই সব অবিশ্বাসীরা এই বিষয়ে কোন আপত্তি বা ওজর করাকে অভদ্রতা বলে মনে করে, তাই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর নিমন্ত্রণকে এদেশী কায়দা মত যথা সম্ভব সম্মান দেখিয়ে গ্রহণ করলাম। তারপর আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম।

আমরা সেখানে পৌছলে পর আমাদের একটা বাগানে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে চারিদিকে খোলা আর গাছের ছায়া ঘেরা একটা সুন্দর বাড়ি ছিল। বাড়িতে সমস্ত মেজেতে একটা কার্পেট পাতা আর টেবিল ক্লথগুলি এদেশী নিয়ম অনুসারে তার উপর পাতা। বাড়িতে ঢোকবার আগে আমরা কয়েকটি পাথরের বেঞ্চিতে বসলাম। এগুলি বাড়ির চার ধারে দরজার সামনে পাতা ছিল। কয়েকজন চাকর তখন বড় বড় গামলা আর রূপার বদনা নিয়ে এল। এগুলিতে গরম জল ছিল। আমাদের পা ধুয়ে দেবার পর তারা নিজেদের কোমরবন্ধ [Comarabandos]—অর্থাৎ কোমরে তারা যে কাপড় বাঁধে—খুলে আমাদের পা মুছে দিল (একটি বর্বর আচার)। আমাদের পা মুছে, গামলা গুলি সরিয়ে, তারা বদনা থেকে সুগন্ধি জল ছড়িয়ে আমাদের পা দ্বিতীয়বার ধুয়ে দিল। এই দ্বিতীয় বার পা ধোয়া হয়ে গেলে আমরা খালি পায়—ওদের এই নিয়ম—বাড়িতে ঢুকলাম।

আমরা বসতেই কয়েকজন বুড়ো লোক নানা রকম বাজনা বাজাতে লাগল, আর তার সঙ্গে এমন গলায় গান গাইতে লাগল যে ছোট ছেলেরা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। এই বাজনা, যাকে সুখকর না বলে বরং কষ্ট পীড়াদায়ক বলা উচিত, বাজবার সঙ্গে সঙ্গে থালায় করে খাবার আসতে লাগল। এতে যত রকম কল্পনা করা যেতে পারে সব রকম খাবার ছিল, আর অনেক ঘণ্টা ধরে এই ভোজ চলল। জল ছাড়া অন্ত কোন

পানীয় এদেশে চলে না। তাই ইউরোপের লোকেদের মধ্যে যেমন এই ধরণের খাওয়াতে গেলাস গেলাস মদ খাওয়ার নিয়ম আছে তা না করে, এরা সময় কাটাবার জন্ম বড় বড় আলোচনা আরম্ভ করে যাতে অনেক রকম খাবারের নূতনত্ব আর স্বাদ পাবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই সব কারণে ভোজ অনেকক্ষণ ধরে চলে। তবে সময়টা বেশ ভাল ভাবে কাটে, কারণ এদের ভদ্রতা আর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্ম এরা বর্বর হলেও অন্য জাতির মত মদ খেয়ে বাড়াবাড়ি করেনা। অর্থাৎ এরা মানুষের মতন হয়ে থাকে, অন্ত জাতির মত শুয়োরের মত ব্যবহার করেনা।

এই প্রাচ্য জাতিরা এই সব মেহমানীর শেষে, ভোজের পর মিষ্টান্নের মত, এক দল নাচওয়ালীর ব্যবস্থা করে। নাচওয়ালী হল এক রকম মেয়ে যাদের এই খারাপ কাজ করাই পেশা। এরা স্বচ্ছ কাপড় পরে থাকে, বা বলা চলে যে কাপড় না পরে থাকে, এদের গায়ে সোনা রূপার গয়না থাকে। এরা এত অসভ্য ভাবে নাচে যে যাদের কিছু মাত্র শ্লীলতা জ্ঞান আছে তাদের চোখ বুঁজে থাকতে হয়।

ভোজের যা কিছু অঙ্গ সব নিয়মমত হয়ে গেলে যখন আমরা চলে আসছিলাম তখন কোটাল আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন। একে এরা শিরোপা [Siripau] বলে। উপহার মানে দুটি পামুরীন [Pamurine-বোধহয় কাশ্মীরী শাল]। এগুলি বেশ ভাল নানা রকম রঙের হয়। দুটির দাম হবে ষাট টাকা। এই পামুরীন বা যাকে এদিকের পোর্তুগীজরা কাম্বুলীন [Combulines] বলে, খুব ভাল পশমের তৈরি। এই পশম কেউ বলে শ্রীনগর [Sirinagar] রাজ্য, কেউ বা বলে ভুটান [Botente] বা চীন [Cathay] থেকে আসে। এই পশমকে প্রথমে জলে ভিজিয়ে নিলে তারপর যত ইচ্ছা সরু সুতা কাটা যায়। এই সুতা দিয়ে এমন সুন্দর আর দামী পামুরীন বোনা হয় যে তার অনেক ডুকাট [এক ডুকাট তিন বা চার টাকার সমান] দাম হবে। বড় বড় রাজা, ওমরাহ ও বড়লোকরা ও তাদের বাড়ির মেয়েরা এগুলি গায় দেয়। এগুলি খুব গরম তবে খুব হালকা আর উৎসব ইত্যাদিতে পরবার উপযুক্ত। এগুলি চাদরের মত করে বানান হয় আর পাড়গুলিতে সোনা রূপা বা রেশমের কাজ করা থাকে। এগুলি ক্লোকের [cloak] মত করে পরা হয়। হয় একেবারে গায় মুড়ে নেওয়া হয়, নয়তো হাতের তলা দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই শৌখিন কাপড় গুলি যখন তাঁত থেকে বেরোয় তখন এগুলি সাদা রঙের থাকে। পরে এদের ইচ্ছা মত রঙ করে এদের উপর ফুল তোলা বা অন্য কিছু কাজ করা হয়। তখন এগুলিকে চমৎকার দেখায়। লাহোর আর কাশ্মীর থেকে অনেক পামুরীন কান্দাহার, খোরাসান, বা পারস্য রাজ্যে রপ্তানি করা হয়।

এই উপহার পেয়ে আমরা ঐ দেশী নিয়ম অনুসারে যতরকম কৃতজ্ঞতার শব্দ আছে তাই দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর আমাদের খেতে দেওয়া হল। যতটুক রাত বাকি ছিল আমরা ঘুমিয়ে নিলাম। পরদিন আমরা মহাবত খানের কাছে বন্দ্রা যাবার অনুমতি চাইলাম। আমি বললাম যে ইণ্ডিয়াতে মনসুন বইতে আরম্ভ করেছে, আর সেখানে যেতে হলে আমাকে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বললেন যে

তিনি শুধু আমাদের ভাল চান আর আমাদের সাহায্য করতে চান ; তবে তাঁর অনুরোধ আমরা যেন দু তিন দিন আরও থেকে যাই। ইতিমধ্যে তাঁর শ্যালক ফিরে আসতে পারেন। এই শ্যালক তখন বিদেশে ছিলেন আর আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়া যাবেন। মহাবত খানেরও সেখানে যাওয়া দরকার তবে ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তাঁর ব্যবসাগত অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে যেতে পারবেন না। এই জন্য আমাদের আরও তিন দিন সেখানে থাকতে হল। মহাবত খানের এত আতিথেয়তা সত্ত্বেও আমরা খ্রীষ্টান দেশে ফেরবার জন্ম এত ব্যগ্র ছিলাম যে ঐ তিন দিনই আমাদের কাটতে চাইছিল না।

তাঁর শ্যালক এসে পৌছতেই ভোর বেলা মহাবত খান আমাদের জাগিয়ে দিলেন, আর আমরা রওনা হলাম। সব কিছু তৈরী ছিল বলে আমরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। তিনি শহর থেকে দুলীগ অবধি আমাদের পৌছে দিলেন। সেখানে মিষ্ট আর পরিষ্কার জলের সুন্দর একটা পুকুর ছিল। কয়েকটি বড় বড় ছায়াতরু যাকে এদেশে প্যাগোডা গাছ [অশ্বথ গাছ] বলে তাই দিয়ে পুকুরটি সুন্দর ভাবে ঘেরা।

এই সব প্যাগোডা গাছকে ধর্মহীনরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সব জায়গায় লাগায়। এগুলি এদের দেবতাদের [idols] উৎসর্গ করা। দেবতার মূর্তি গাছের তলায় থাকে। যদি মূর্তি না পাওয়া যায় তাহলে সিন্দুর [sindul] দিয়ে লেপে দেওয়াই যথেষ্ট। সিন্দুর লাল রঙের এক রকম জিনিস। গাছে সিন্দুর লাগান থাকলে বুঝতে হবে যে গাছগুলি ওদের অদ্ভুত সব দেবতাদের উৎসর্গ করা। এখানে পৌছে দেখলাম যে মহাবত খানের চাকরেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। (কিছু চাকর আমাদের সেবার জন্ম সঙ্গেও ছিল)। এরা সকলের জন্য এত খাবার এনেছিল যে আমাদের দুপুরে বা রাত্রে আর খাবার দরকার হল না। খাওয়া হয়ে গেলে মহাবত খান আমাদের দুটি কাঁথা দিলেন। এগুলিতে কালো রেশমী সুতার কাজ করা ছিল। এদেশের লোকেরা একে দালগরি [dal-garis ?] বলে। পোর্তুগীজরা এর নাম দিয়েছে শিকারীর কাঁথা [hunting quilt]।

এই সব অনুগ্রহ ছাড়া এই মুসলমান এর আগেও আমাদের জন্ম যা কিছু করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা আমাদের ছিল না। কিন্তু শুধু এইটুকু আন্দাজ দেবার জন্ম যে আমরা তাঁর প্রতি কত কৃতজ্ঞ, আমি হাটু গেড়ে বসে আকাশের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে তিনি যেন আমার প্রতি তত কৃপা না করেন যত তাঁর কৃপা আমি মহাবত খানের জন্ম চাই।

এর পর আমরা আলিঙ্গন করলাম আর তিনি শহরের দিকে আর আমরা আমাদের পথে রওনা হলাম। পঞ্চম দিনে আমরা বনুজায় পৌছে আমাদের স্বর্গীয় করুণাময় পিতাকে আমাদের এত বিপদের মধ্য থেকে উদ্ধার করে আনার জন্ম ধন্যবাদ দিলাম।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কেমন করে আমি বন্‌জা থেকে পিপলি রওনা হলাম তার ও পিপলি ছাড়বার আগে সেখানকার কিছু ঘটনার বিবরণ।

বন্‌জা পৌঁছিয়েই আমি ফাদার দিগো দেলা কনসেপসিওনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বাত আর অন্য রোগে কাতর হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। তাঁর বয়স তখন উনসত্তর বছর। এর মধ্যে একান্ন বছর তিনি পাদরির কাজ করেছেন, আর তার মধ্যে আঠাশ বছর বাঙ্গালা রাজ্যে মিশনারী হিসাবে। এই সময়ে তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বরের অনেক সেবা করেছেন, আর যদিও তাঁকে একাধিকবার ডিফিনি ডোর [Diffinidor] আর ইণ্ডিয়ার খ্রীষ্টান সমাজের ভিজিটর [Visitor of the India Congregation] নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হননি। কারণ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অনুগত কৃষক হিসাবে তিনি সুসমাচারের লাঙ্গল যা তিনি মূর্তি পূজকদের আত্মার অনুর্বর জমিতে চালাচ্ছিলেন তা তিনি ছেড়ে যেতে চাননি। তাঁর অবিশ্রাম কাজ আর শিক্ষার দরুণ এই কঠোর হৃদয়গুলি কিছু নরম হয়ে তাতে শিকড় ধরছিল। পরে এর থেকেই ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে সুসময়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাল কাজের আর ভাল জীবনের ফল ধরে আমাদের প্রভুকে মহিমান্বিত করেছিল।

বন্‌জাতে আমাকে, আমি আগে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী দিন থাকতে হয়েছিল। এর প্রথম কারণ জায়গাটির আবহাওয়া বিশ্রী আর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। তাছাড়া আমি ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় কাউণ্ট লিঁয়ারেসের [Count of Linares (1629-35)] কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিলাম সে কাজ গুলিও করবার ছিল। অবশ্য কয়েকদিন আমাকে এই কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। কারণ এই সময়ে আমাকে কিছু ধার্মিক কাজ করতে হয়। এই কাজে ফাদার কিম্বা অন্য কোন পাদরির উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ছিল। ফাদার আমাকে এই কাজ করতে বলেন। তাছাড়া তিনি বলেন যে তমলুকের [Tambolin] খ্রীষ্টানদের একটা কাজে সাহায্য করা বিশেষ দরকার। তারা কটকের নবাবের কাছে ঐ বসতিতে [Bandel] একটা গির্জা বানাবার অনুমতি বহুদিন ধরে চাইছিল। সম্প্রতি মহাবত খানের সাহায্যে খুব গোপনীয় ভাবে তিনি ঐ অনুমতি জোগাড় করেছেন। কথাটা যেন ঐ অঞ্চলের যে রাজা বা মালিক তার কানে না যায়। কারণ যদিও মহামুঘলের করদ রাজা হিসাবে সে এই নবাবের অধীন, তবুও ফর্মান পালন করার ব্যাপারে সে অনেক বাধা দিতে পারে। তাই সেখানে গিয়ে তমলুকের প্রধান খ্রীষ্টানদের জড়ো করে চুপচাপ কাজে লেগে পড়া খুব দরকার। দেওয়ালগুলি যদি প্রথমে মাটির বানানো হয় তাহলেও ক্ষতি নেই। পরে এগুলি পাকা করে নিলেই হবে।

এই খবর পেয়ে আমি বন্‌জাতে পৌঁছবার তৃতীয় দিনে তমলুক রওনা হলাম। সঙ্গে একজন শিক্ষক [catechist] আর মাসের [mass] অনুষ্ঠানের জিনিষ নিয়ে নিলাম।

গঙ্গা বেয়ে যাওয়া তাড়াতাড়ি আর কম ক্লান্তিকরও হত। কিন্তু আমার মারের ঘাতে তখনও ব্যথা আছে, আর যে কষ্ট আমি পেয়েছি তা তখনও ভুলিনি। তাই আর বেশী বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে আমি স্থল পথেই রওনা হলাম। এই পথ অবশ্য অনেক বেশী লম্বা আর কষ্টকর।

পথের অসুবিধার মধ্যে একটি হল কিছু নদী পেরোন। এগুলি পেরোতে হয় শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলে আর মাটির পাত্রে চেপে। পাত্রগুলি গোল আর এদের মুখ মিহি কাপড় দিয়ে বাঁধা।

কলসীগুলির উপর উপুড় হয়ে শুতে হয় যাতে পেট দিয়ে এদের মুখ ঢেকে যায়, আর তারপর হাত আর পা দিয়ে জল কেটে নদী পার হতে হয়। যদি বেশী স্রোত থাকে তাহলে একটা দড়ি বাঁধা থাকে আর তাহলে নিরাপদে পার হওয়া যায়। বাঙ্গালা আর হিন্দুস্থানের [Indostan] অনেক জায়গায় কাঠ পাওয়া যায় না। তাই বাদশাহী সড়ক [Imperial roads] আর যে পথে বেশী যাত্রী চলে সেগুলিতে ছাড়া নৌকা পাওয়া যায় না।

এই সব ছোটখাটো অসুবিধা ভোগ করে আমরা সাতদিনের পর ঈশ্বরের অনুগ্রহে তমলুক বন্দরে পৌছলাম। এখানকার খ্রীষ্টানরা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর আমার জন্য একটা বাড়ি খুজে রেখেছিল। নিয়ম মত নমস্কারাদি হয়ে গেলে গাঁয়ের প্রধানরা রয়ে গেলেন আর আমি তাঁদের ফর্মান পড়ে শোনালাম। বন্‌জার ফাদার ক্রে দিগোর কি মত তাও বললাম। কি করা উচিত সেই বিষয়ে দেখলাম মতভেদ আছে। অধিকাংশের মত ছিল যে রাজাকে জানতে না দিয়ে এই কাজ করা অসম্ভব। সে মাত্র তিন লীগ দূরে থাকে। তাই আমার সঙ্গে সব খ্রীষ্টানরা তার কাছে গিয়ে তার অনুমতি চাওয়াই বেশী ভাল হবে। অনেকের আবার অন্য মত ছিল। তাই সেদিন কোন কথাই স্থির হল না। ঠিক হল যে কি করা উচিত তা পরদিন আবার ভেবে দেখা হবে। বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই এই কথার পর সবাই নিজেদের বাড়ি চলে গেল।

পরদিন আমরা একত্র হবার আগেই রাজার দুজন লোক তার তরফ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা আদিয়া বা উপহার হিসাবে দুটো খাসি, বা ওরা যাকে বকরী বলে তাই আর রান্নার সামগ্রীর জন্য দু টাকা এনেছিল। যেমন আগেই বলেছি এই রকম জিনিসের সঙ্গে আনুষাঙ্গিক উপকরণ না দেওয়া ভদ্রতা বিরুদ্ধ। রাজার এই রকম ভদ্র ব্যবহার দেখে আমি তার সঙ্গে দেখা করাই ঠিক করলাম।

তাই ঠিক করলাম যে পরদিন যথারীতি উপহার নিয়ে তার কাছে যাব। উপহার হিসাবে আমরা সঙ্গে দু প্রস্থ চীনের দামাস্ক [রেশমী কাপড় যার দু দিকেই নকশা থাকে] নেওয়া ঠিক করলাম। এই উপহার আর ফর্মানটি নিয়ে আমরা রওনা হলাম। আমরা যখন আধ লীগ আন্দাজ গেছি তখন দুজন খ্রীষ্টানের সঙ্গে দেখা হল। তারা বলল যে রাজা তখন তার একজন আত্মীয়ার পারলৌকিক কাজ করছে, তাই দেখা করবার জন্য সময়টা তখন ভাল নয়। এই খবর পেয়ে আমরা বন্দরে ফিরে এসে অন্য কোন ভাল দিনের অপেক্ষায় রইলাম। এই ধর্মহীনরা শকুন ইত্যাদি হাস্যকর

জিনিস খুব মানে। তাই আমরা যদি সেই দিনই যেতাম তাহলে রাজা আমাদের আসাটা অমঙ্গলসূচক মনে করে আমরা যা বলতাম তার ঠিক উলটো করত।

এই সব অনুষ্ঠানে ছয় দিন নষ্ট হল। এই সময়ের মধ্যে আমি একটি বেদী বানিয়ে নিয়ে মাস [Mass] পালন করলাম আর খ্রীষ্টানদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলি করিয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে সেই মৃতকের অন্য ছয়দিনের অদ্ভুত অনুষ্ঠানগুলি শেষ হল। আমরা তখন আবার যাত্রা করলাম। পৌছবার পর আমরা উপহারগুলি দিলাম। আমাদের খুব ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করা হল। কিছু সাধারণ কথাবার্তা হবার পর আমি বুকের কাছ থেকে কটকের নবাবের ফর্মানটি বার করলাম আর সেটিকে চুম্বন করে রাজার হাতে দিলাম। সে এটিকে তার একজন অনুচরকে পড়তে দিল। পড়া হয়ে গেলে আমি রাজাকে বললাম যে তার অনুমতি ছাড়া বন্দরের খ্রীষ্টানরা গির্জা বানাতে চায়না। তাছাড়া একথাও বললাম যে খ্রীষ্টানরা সেখানে বাস করলে কি লাভ হয় তা রাজা শুধু নয়, তমলুকের সব অধিবাসীরা জানে।

যদি খ্রীষ্টানরা জানতে পারে যে তমলুকে গির্জা আছে তাহলে আরও বেশী খ্রীষ্টানরা সেখানে আসবে ; আর বন্জা এবং হুগলির পোর্তুগীজরাও তাকে বন্ধু বলে মনে করবে। তাতে রাজা জবাব দিল যে সকলেই জানে তার পিতা আর পিতামহ পোর্তুগীজদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই তার এই বন্ধুত্ব উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। তাছাড়া যদিও পোর্তুগীজদের অবহেলাই তারএলাকার, এমনকি সারা বাঙ্গালার, দুর্দশার জন্য দায়ী, তবু তার আশা আছে যে সে তাদের কাছে থেকে তেমনি সাহায্যই পাবে যা তার পিতামহ পেয়েছিলেন। আর নবাবের ফর্মান সম্বন্ধে এই টুকু বলাই যথেষ্ট যে সেটি ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে। কারণ সে সম্রাটের কাছ থেকে ফর্মান পেয়েছে যাতে এই নবাবদেরই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে তার [রাজার] রাজ্যে যেন নতুন কোন জিনিষ আমদানি না করা হয়। তবে সে আমাদের প্রস্তাব তার পারিষদদের সঙ্গে বিচার করে দেখবে, আর আমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। তারপর রাজা অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল আর খাবার সময় হয়ে গেলে অন্দরে চলে গেল। যাবার সময় সে তার কাকাকে (এক বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ) আমাদের একটি ফলের বাগানে নিয়ে যেতে বলল। সেখানে ছোট একটি পুকুরের পাশে বেশ সুন্দর একটি চত্বর ছিল। এখানে আমাদের ব্রাহ্মণদের খাবার দেওয়া হল। এরা মাছ, মাংস, বা ডিম খায় না। তাই এদের খাবার হল নানা রকম লতাপাতা আর ভাতের ঝোল, বা দুধ, তরকারি আর অনেক ঘি দিয়ে রান্না সবজি। এ ছাড়া অনেক মিষ্টান্নও ছিল। খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের এদেশী নানা রকম বজনা বাজিয়ে আপ্যায়ন করা হল। আর তাছাড়া পান তো ছিলই। দু ঘণ্টা কোন রকমে এরকম ভাবে কাটালাম। তার পর আমাদের ডেকে পাঠান হল। রাজা তখন আমাদের বলল যে পোর্তুগীজদের প্রতি তার শুভেচ্ছা থাকাতে, আমাদের কোন অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই সে খ্রীষ্টানদের তমলুক বন্দরে গির্জা বানাবার অনুমতি দেবে। খ্রীষ্টানরা নিজেরাই যেখানে ইচ্ছা জমি বেছে নিতে পারে। কোন রকম শর্ত বা বাধা দেওয়া হবেনা।

আমরা প্রথমে প্রভু ঈশ্বরকে এই ধর্মহীনের আমাদের অনুরোধ রক্ষা করবার জন্ত ধন্যবাদ দিলাম। তারপর রাজাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্তবাদ দিলাম। কারণ যদিও আমাদের কাছে নবাবের ফর্মান ছিল, তবুও সে ইচ্ছা করলে আমাদের কাজ কয়েকমাস পিছিয়ে দিতে পারত। আর যদি সে ব্যাপারটা সম্রাটের নজরে আনতো তাহলে হয়তো তিনি [শাহজাহান] খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ থাকার জন্ত নবাবের অনুমতি আর ফর্মান বাতিল করে দিয়ে হুকুম পাঠাতেন।

আমাদের কাজগুলি সব ঠিক হয়ে গেলে আমরা বন্দরে ফিরে এলাম। আমরা সেখানে পৌছলাম সন্ধ্যার সময়। পরদিন সকালে আমরা যে জায়গায় গির্জা বানান হবে সেখানে গেলাম আর রোমান [ক্যাথলিক] ধর্মের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে একটি প্রকাণ্ড কাঠের ক্রসকে পবিত্র করে ধর্মহীনদের ভীড়ের সামনে তখনই পুঁতে দিলাম। এই সময় খুব শব্দ করে বন্দুক আর ছোট কামান ছোঁড়া হল। সেখানে অনেক ধর্মহীন জড়ো হয়েছে দেখে এই স্বর্গীয় পতাকা লাগিয়ে দেবার পরই আমি একটা বেঞ্চ আনিয়ে সেই ক্রসের পাশে রাখলাম তারপর সেই বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমি এই ধর্মহীনদের একটা বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতার বিষয় হিসাবে আমি আমাদের মহান পেট্রন ফাদার অগষ্টিনের এই বাণীটি বেছে নিই—"একে ধন্তবাদ যে আমরা আর একলা ঘুরে বেড়াচ্ছিনা—কারণ এখন আমরা সত্যকে জানতে পেরেছি। তাছাড়া আমরা রাজ্যের বাইরেও নই কারণ আমরা রাজ্যের প্রবেশ দ্বারের মধ্যে এসে গেছি। এখন আর আমাদের শয়তানের অগ্নিময় তীরের ভয় নেই।"

এই বাণীর উপর বলতে বলতে আমি অনেক সংকেতও করেছিলাম। কিন্তু আমার আত্মার শক্তির অভাবের জন্ত বা আমার পাপের জন্যই হয়তো, আমি এই অবিশ্বাসীদের কোন রকমেই প্রভাবিত করতে পারলাম না। তাই যদিও তারা খুব মনোযোগ দিয়ে আর একেবারে নিঃশব্দে আমার কথা শুনল তবু তাদের মধ্যে এক জনও ধর্মান্তরিত হতে বা এই স্বর্গীয় পতাকার তলায় ভর্তি হতে চাইল না।

আমার বক্তৃতা হয়ে গেলে আমরা গির্জা স্থাপনের কাজে লেগে গেলাম। গির্জাটিকে আমরা দেবদূতদের রানীর [মাতা মেরী] নামে উৎসর্গ করলাম, আর এর নাম রাখলাম করুণাময় দেবী [Our Lady of Pity]।

আমরা যখন গির্জা বানাবার কাজে লেগেছিলাম তখন একদিন ক্যাপ্টেন সালভাদের দাস্তেস আমাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি হুগলির রাজা মসন্দলীমের [মসনদ-ই-অলি] অধীনে চাকরী করতেন। ইনি তাঁর পরিবার নিয়ে মহিষাদল [Mozodol] বন্দর বা বসতিতে বাস করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে আমি তাঁর এক মেয়েকে বাপ্টাইজ করাই আর মহিষাদলের খ্রীষ্টানদের কনফেস করিয়ে দিই। সেখানে যাবার একমাত্র পথ গঙ্গা বেয়ে, তাই আমি একটা ভাল বজরা [bore] আনতে দিলাম। নৌকাতে ওঠবার সময় আমার মনে স্বস্তি ছিলনা, কিন্তু উপায় নাই দেখে আমি নিজের মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম।

তাঁরই পরম করুণায় আমি নিরাপদে মহিষাদলে পৌছলাম। এখানে আমাকে নয় দিন থাকতে হয় আর আমি সেখানকার খ্রীষ্টানদের প্রয়োজনীয় স্যাক্রামেণ্টগুলি পালন করিয়ে দিই। এই কর্তব্য হয়ে গেলে আমি তমলুকে ফিরে এসে আরও সাতদিন থাকি। তার মধ্যে অবশ্য গির্জাটি সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি, তাহলেও পূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার প্রথম মাস [mass] পালনের মত তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন যখন দেখলাম যে আর কিছু করবার নেই আর ইণ্ডিয়ার দিকে মনসুন বইতে আরম্ভ করেছে [বোধ হয় ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস], আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথে বন্‌জা ফিরে গেলাম।

তমলুক আর মহিষাদলের বন্দরে, ঈশ্বরের কৃপায়, সাতাশ জন লোককে বাপ্টাইজ করা হয়। এদের মধ্যে ছয় জন সাবালক। এদের ধর্মহীনতা [হিন্দুত্ব] থেকে আমাদের মহাপবিত্র ক্যাথলিক ধর্মে আনা হয়।

বন্‌জায় পৌছে দেখলাম যে ফাদার ফ্রে দিগোর বাত সেরে গেছে। এখান থেকে আমি দেড় দিনের পথ হিজলি যাত্রা করলাম। ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়ের হুকুমে আমার সেখানকার রাজার সঙ্গে কিছু সরকারী কাজ ছিল। আর তা ছাড়া তাঁকে একটা চিঠিও দেবার ছিল।

অনেকবার দেখা করবার পর পঞ্চম দিনে আমার কাজ শেষ হল। আমাকে জানান হল যে মসনদ-ই-অলী চিরকালের জন্য পোর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য শপথ গ্রহণ করবেন, আর তিনি পোর্তুগালের রাজার যুদ্ধের সাথী [brother-in-arms] হবেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি পোর্তুগালকে কাজুরিম দ্বীপ [হিজলি আর কাজুরিম দ্বীপ যেখানে বোধহয় নুন তৈরি হত, বহুদিন হল সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে] কয়েকটি শর্তে দেবেন। এই গুলি হল এই যে ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় এই দ্বীপকে পোর্তুগালের রাজার হয়ে গ্রহণ করবেন ; আর সেখানে একটি কেল্লা বানাবেন ; আর তার কাছাকাছি, মগ ও মুঘলদের নৌসেনাকে ঠেকাবার আর ধ্বংস করবার জন্য, কিছু যুদ্ধ জাহাজ রাখবেন। এই ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাঁর প্রজারা আর অন্যরাও নিরাপদে সেই দ্বীপে ব্যবসা করতে পারবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে পোর্তুগালের রাজা সেখানে হুগলির পোর্তুগীজরা যে দরে নুন সরবরাহ করে তার চেয়ে শতকরা তিন ভাগ কম দরে নুন সরবরাহ করবার ঠিকা নেবেন। এই কাজ দেখবার জন্য ভাইসরয় একজন ম্যানেজার [Factor] নিযুক্ত করবেন, আর ইনি হিজলি শহরে থাকবেন।

এই জবাবের সঙ্গে তিনি আমাকে ভাইসরয়ের জন্ম একটি চিঠিও দেন। তিনি আমাকে যথা সম্ভব সম্মান দেন ও আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন।

এই দলিলে যে সব শর্ত লেখাছিল সেগুলির সব কটিই পোর্তুগালের মহামহিম রাজার ইণ্ডিয়াতে যে সব এলাকা ছিল সেগুলির পক্ষে বিশেষ লাভজনক। শুধু নুনের ঠিকাটারই তো দাম হবে দশ লক্ষ ডুকাটের বেশী। অন্ত যে সব সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সে গুলির বিষয়ে আর বললাম না, কারণ এ গুলি গোপনীয় জিনিষ, সর্বসমক্ষে বলবার নয়।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা কোন দিনই কাজে লাগান হয়নি, কারণ যখন আমি গোয়া পৌছলাম তখন লিয়ঁারেসের কাউণ্ট ইণ্ডিয়া ছেড়ে [৩রা ডিসেম্বর ১৬৩৫] পোর্তুগাল চলে গেছেন, আর নতুন একজন ভাইসরয় পেদ্রো দে সিলভা তাঁর জায়গায় এসে গেছেন। আমি তাঁকে চিঠিটি দিয়ে সব প্রয়োজনীয় কথা বললাম। তিনি কাজটা হাতে নিতে খুবই উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তবুও নিতে পারেন নি। কারণ, প্রথমতঃ তাঁর হাতে অন্য বেশী দরকারী কাজ ছিল, আর দ্বিতীয়তঃ সেই সময়কার ক্যাথলিক মহামহিম [পোর্তুগালের রাজা] তাঁকে চিঠিতে যে সাহায্য করবেন বলে লিখেছিলেন তা শেষ অবধি তিনি করেননি। এই সব কাজ হয়ে গেলে, যেমন আমি আগেই বলেছি, আমি হিজলি থেকে বন্‌জা রওনা হলাম। এখান থেকে আমি ফাদার ক্রে দিগোর কাছে বিদায় নিয়ে পিপলি যাত্রা করলাম। শুনেছিলাম যে সেখান থেকে একটা জাহাজ পনের দিনের মধ্যে কোচিন যাত্রা করবে।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কেমন করে আমি পিপলি থেকে ইণ্ডিয়া যাত্রা করলাম ; আর রওনা হবার আগে আর পরে কি কি ঘটল। [ফেব্রুয়ারি, ১৬৩৬]

তারপর আমি পিপলি এসে পৌছলাম। পিপলি উড়িষ্যা [ourixa] রাজ্যে সমুদ্রের ধারে একটি শহর। এই শহরে বাঙ্গালার বারটি রাজ্য থেকে অনেক পণ্যদ্রব্য আসে বলে এশিয়ার বহু জাতির লোক এখানে ব্যবসার জন্য আসে। এখানে আমার ফাদার ক্রে সেবাস্তিয়ান দে লেস মারতিবেসের সঙ্গে দেখা হল। ইনি ঢাকা [Daca], বা মুঘলদের উচ্চারণে ডাক [Daack] থেকে এসেছিলেন। ইনিও আমার মত ইণ্ডিয়া যাচ্ছিলেন। এই সময় এঁকে সহযাত্রী রূপে পাওয়া আমার পক্ষে একটা বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ এই লম্বা আর বিপজ্জনক পথে দরকার হলে আমি এঁর কাছে কনফেস করতে পারব। ইনি, তা ছাড়া, আমার সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। এই পারমার্থিক আবিষ্কার ছাড়া আমি একটা সাংসারিক আর দরকারী ব্যাপারও খুঁজে পেলাম। এখানকার শিকদার অনেক মাল বোঝাই করে একটা বড় জাহাজ কোচিন পাঠাচ্ছিলেন। তার ক্যাপ্টেন ছিলেন তিউতোনিও ভিগাস বলে বড় ঘরের একজন পোর্তুগীজ। তিনি তাড়াতাড়ি কোচিন পৌছবার জন্য এই মাল নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। আমরা যে তাঁর জাহাজে যাব এটা তিনি একটা বড় পাওয়া বলে ধরলেন। এদেশের লোকেরা জাহাজে ধর্মযাজক যাওয়াকে একটা সৌভাগ্যের কথা বলে ধরে। আর কোন কেবিন ছিলনা বলে ইনি আমাদের জাহাজের পিছনের কেবিনটি দিলেন। আমাদের পছন্দমত সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর আমরা আশা করছিলাম যে কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজে উঠব। কিন্তু সদাগরেরা সবাই তখনও জাহাজে মাল তোলেনি বলে আমাদের

সেখানে আরও চোদ্দ দিন অপেক্ষা করতে হল। আমাদের দেরী হবে এই কথা শুনেই ফাদার ক্রে সেবাস্টিয়ান বনজাতে ফাদার ক্রে দিগোর সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। ঠিক সেই সময় ফাদার বালতাসার দে সেণ্ট উরসুলা ডিয়াঙ্গা থেকে পিপলির কাজে সাহায্য করবার জন্য এসে পৌছলেন।

শিকদারের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি জেলিয়া অর্থাৎ বড় নৌকা বন্দরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ইনি তার মধ্যে একটিতে ছিলেন। এই জেলিয়াদের পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেনদের এই সর্তে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া হয় যে তারা বন্দরের কোন ক্ষতি করবেনা। আর তারা বন্দরের পাওনা দিয়ে আর তাদের দরকারী কাজ শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র আবার সমুদ্রে চলে যাবে।

কিন্তু নিয়তির বিধানে তারা যখন পিপলি ছেড়ে আট বা দশ লীগ গিয়েছে তখন তাদের একটা বড় জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়। জাহাজটি পিপলি থেকে কিছু লীগ দূরে বালাসোর বলে একটি বন্দর থেকে আসছিল আর বাতাস ছিল না বলে দাঁড়িয়ে ছিল। বড় জাহাজটিকে দেখে এরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল। তারা দেখল যে জাহাজটি মুসলমানী। সেই জাহাজের নাবিকরাও জেলিয়াদের চিনতে পেরে লাল নিশান অর্থাৎ যুদ্ধের চিহ্ন, তুলে দিল। পোর্তুগীজরা তখন আক্রমণের জন্য তৈরি হল। বাতাস ছিলনা বলে বড় জাহাজটি তার পাল ব্যবহার করতে পারছিলনা, আর তাই তার কামান ব্যবহার করবার উপায় ছিলনা। আর তাছাড়া জেলিয়াগুলি পুরো দমে দাঁড় বেয়ে এসে জাহাজটিকে ঘিরে ফেলল। জেলিয়ার বন্দুকধারীরা তখন বন্দুক ছুঁড়ে সাথীদের পথ পরিষ্কার করে দিল, আর তারা তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। মুসলমানদের সঙ্গে একটা জোর মুখোমুখি লড়াইর পর তারা হটে গেল, আর দেড় ঘণ্টা যুদ্ধ করেই পোর্তুগীজরা জাহাজ দখল করে নিল। নাবিকরা তখন প্রাণ ভিক্ষা চাইল। এই আবেদন তখনই মঞ্জুর করা হল, আর তাদের কর্তাদের ডেকে পাঠান হল। তাদের বলা হল যে তাদের বিজেতারা তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি আছে; আর সেই চুক্তির সর্ত দু পক্ষেরই সুবিধাজনক। জাহাজে যে চাল ভরা আছে তা পোর্তুগীজদের কোন কাজে লাগবে না, আর জাহাজটিও পোর্তুগীজদের দরকার নেই। অতএব ঠিক করা হল যে কিছু টাকা (ঠিক কত তা আমি ভুলে গেছি) দিতে হবে, আর তাহলেই জাহাজটির কোন ক্ষতি না করে ফেরত দেওয়া হবে। জাহাজের সদাগরদের মধ্যে দুজন যে বন্দর থেকে জাহাজ যাত্রা আরম্ভ করেছিল সেখানে টাকা আনতে ফেরত গেল আর বাকিরা তাদের বিজেতাদের অধীন সেখানেই রইল। বালাসোরে পৌছে এই দুজন তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করল। এখন, মুসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে কোন সর্ত বা রাজীনামা তারা তখনই পালন করে যখন তার থেকে তাদের কোন সুবিধা হয়। তাই তারা যে টাকা দেবে বলেছিল তা না দিয়ে কি করে জাহাজটি ফেরত পেতে পারে তার চেষ্টা করতে লাগল, বা অন্ততঃ পক্ষে সর্তগুলির মধ্যে যত কমগুলিকে মানতে হয় তার চেষ্টা করতে লাগল।

তারা জানত যে জেলিয়াগুলি পিপলি থেকে এসেছে আর সেখানকার শিকদার

তাদের, যে সব সর্তের কথা আমি আগে বলেছি সেগুলি অনুসারে বিনা শুল্কে বন্দরে ঢুকতে দিয়েছিল, আর পিপলিরই কিছু মুসলমান বিশেষ করে মিরজা শরিফ বলে একজন উচ্চপদস্থ মুঘলের এই জাহাজে কিছু স্বার্থ ছিল। এই লোকটি ছিল খুব জবরদস্ত আর রাগী আর তা ছাড়া খ্রীষ্টানদের বিশেষ শত্রু। এই কথা জানত বলে তারা পিপলিতে গিয়ে মিরজাকে সব কথা বলল। মিরজা তখনই শিকদারকে এই বলে দোষ দিতে লাগল যে সে এই চাটগাঁয়ের পোর্তুগীজদের বন্দরে ঢুকতে দিয়েছিল বলেই তারা জাহাজটির সম্বন্ধে খবর পেয়েছে। আর এছাড়া সে এমন সব মতামত জাহির করতে লাগল যে শিকদার ভয় পেয়ে গেল যে সে কটকের নবাবকে চিঠি লিখে তার সর্বনাশ করে দেবে। এই সব ভেবে ঘাবড়ে গিয়ে সে মিরজার কথার জবাব দেওয়া আরম্ভ করল। জাহাজটি ধরা পড়া সম্পর্কে সে বলল যে তার কাছে সমুদ্রে যুদ্ধ করবার যে শক্তি আছে তাইতে সে ঐ জেলিয়াদের ঠেকাতে পারত না। তাই সে তাদের বন্দরে ঢুকতে দিয়ে যথা সম্ভব ভদ্র ব্যবহার করেছে। আর তাছাড়া ঐ জেলিয়াদের নাবিকরা যদি ওখানকার গির্জা, পাদরি আর খ্রীষ্টানদের শ্রদ্ধা না করত তাহলে তার বন্দরে জবরদস্তি ঢুকে বন্দরের সব জাহাজ জ্বালিয়ে দিত, আর অন্য অনেক অপূরণীয় ক্ষতি করত।

কিন্তু এই সব সাফ আর ভাল উত্তরে সেই বর্বর মিরজার রাগ কমলনা, বিশেষ করে খ্রীষ্টান নাম শুনেই সে আরও রেগে ছিল বলে। সে শিকদারকে বলল যে সে যেন তার ব্যাপার থেকে দূরে থাকে, কারণ সে পোর্তুগীজ জেলিয়াদের জাহাজ ফেরত দিতে বাধ্য করবে! বেচারা শিকদার এই জবাব পেয়ে, তার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করল না। সে শুধু বলল যে মিরজা যা ইচ্ছা করতে পারেন। সেই অবিশ্বাসী মুসলমান তখন পাদরিদের ডেকে পাঠাল। আমি আর ফাদার বাল্‌তাসার ওর বাড়ি গেলাম। যখন আমরা ওর বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম তখন সে ফারনানদো লোপেজ পেরেরাকে ডেকে পাঠাল। একে নবাব এই বন্দরের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করেছিলেন। ক্যাপ্টেন এসে পৌছলে আমাদের মিরজার সামনে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে সে বলল যে যেসব পোর্তুগীজরা মগ রাজত্বে বাস করে আর সেখান থেকে এসে সম্রাটের এলাকায় ক্ষতি করে তাদের জন্ম পাদরিরাই দায়ী। এদের তারা আটকাতে পারে কিন্তু ইচ্ছা করেই আটকায় না। তারপর সে বলল যে আমরা যদি ঐ পোর্তুগীজদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদের জাহাজ ফেরত দেবার কথা না বলি তাহলে সে এখনই আমাদের তিন জনের মাথা কেটে ফেলবে। তাতে ক্যাপ্টেন বলল যে তার কাছে তো তলোয়ার নেই যে তাই দিয়ে সে পাদরিদের বা তার মাথা কেটে ফেলতে পারে। এই জবাবে সেই বর্বর এত রেগে গেল যে সে নিজের হাত খপবাহর [Capua] (খপবাহ এক রকমের ছোরা) উপর রেখে এমন ভাব করল যে তখনই সেটি ক্যাপ্টেনের বুকে বসিয়ে দেবে। তিন জন মুসলমান মাননীয় লোক মধ্যস্থ হয়ে যদি না তাকে বলতে বলতেন তাহলে হয়তো সেটা বসিয়েই দিত। ক্যাপ্টেনও খুব রেগে ছিল আর সম্রাটের নাম করে "দোহাই পাদশাহ" [Doay Padcha] বলে কিছু বলতে চাইছিল।

কিন্তু ঐ মুসলমানরাই আবার মধ্যস্থ হয়ে তাকে চুপ করতে বলে আমাদের এক জনকে কথা বলতে বললেন।

আমাকেই জবাব দিতে হল। যথাবিহিত সেলাম করে আমি বিনীত ভাবে তাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে দেখালাম যে আমাদের এ ব্যাপারে কোন দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা জেলিয়াদের ক্যাপ্টেনকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য অনুরোধ করব। কিন্তু এর জন্য আমাদের একজনকে গিয়ে তার সঙ্গে দরদস্তুর করতে হবে। তাতে সে বলল যে আমার সাথী অন্য পাদরি এই কাজের জন্য যেতে পারেন, আর আমাকে যতদিন না তিনি ফিরে আসেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জামিন হিসাবে থাকতে হবে। আমি বললাম যে এরকম ব্যবস্থার কোন কারণ নেই আর এটা ন্যায্যও নয়, আর তা ছাড়া সে নিজেই বুঝতে পারছে যে এটা সম্রাটের ফরমানের অনুযায়ী নয়। সে বলল যে সম্রাটকে যা জবাব দেবার সে দেবে। আমি কিছু বিরক্ত হয়ে বললাম যে "ঈশ্বরের কাছে তো জবাবদিহি করতেই হবে—তিনি সব অন্যায়ের শাস্তি দেন"। সে আমার দিকে রেগে তাকিয়ে আমাকে কাফির বা ধর্মহীন বলল, আর আমাদের কোন কথা না শুনে চলে গেল।

এই কথাবার্তা শেষ হয়ে গেলে আমরা শিকদারের বাড়ি গেলাম। সে আমাদের ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করল, আর আমাদের বসতে বলল কারণ আমাদের কিছু অপেক্ষা করতে হবে। তারপর সে একটা নৌকার ব্যবস্থা করে তাইতে ফাদার বাল্‌তাসার আর নিজের একজন আত্মীয় মুসলমানকে জাহাজে পাঠিয়ে দিল। এই আত্মীয়ের সঙ্গে সে জেলিয়াদের ক্যাপ্টেনকে একটা সুন্দর উপহার আর অনেক অনেক সেলাম পাঠিয়েছিল।

যখন এই সব ব্যাপার চলছিল, তখন আমি বেশ ঘাবড়িয়ে গেলাম, কারণ যে জাহাজে আমার যাবার কথা সেটা তখন রওনা হবার মুখে, আর এক বছর বাংলায় থাকা মানে অনেক বিপদ। তাছাড়া একথাও ভাবছিলাম যে এ বছর না যাওয়া হলে আমি কাউন্ট অফ লিঁয়ারেসকে ইণ্ডিয়াতে পাবনা। আর তাছাড়া আমি মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম। আমি যখন এই দুর্ভাবনার মধ্যে ছিলাম তখন দেশের ভিতর থেকে রপ্তানির জন্য কিছু মাল এল। দুজন স্থানীয় লোক এর মালিক। এদের ইচ্ছা ছিল যে সেগুলি তাড়াতাড়ি রপ্তানি করে; কিন্তু জেলিয়াদের জন্য এরা রপ্তানি করতে ভয় পাচ্ছিল। আমার ঐ জাহাজে যাবার কথা শুনে তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তারা বলল যে তারা শুনেছে যে আমি সেই বছরই ইণ্ডিয়া পৌঁছতে চাই, কিন্তু যে সব অসুবিধা ঘটেছে তার জন্য হয়তো আমার যাওয়া হবে না, যদিও আমার জাহাজ ছাড়বার মুখে। তারা বলল যে শিকদার আর মিরজা শরিফ যাতে আমাকে যেতে দেয় সে ব্যবস্থা তারা করবে, কিন্তু আমাকে দু বজরা মালের ভার নিতে হবে। এগুলি তারা আমার হাতে দেবে আর আমার রক্ষণাধীনে থাকবে। মালগুলি জাহাজে তুলে মাথন দাস [Macunda] বলে একজন হিন্দু সদাগর যে ঐ জাহাজে যাচ্ছে তার হাতে সঁপে দেওয়া অবধি আমাকে ঐ দায়িত্ব নিতে হবে। এই সুযোগ আমার একটা অদ্ভুত সৌভাগ্য বলে মনে হল। ঐ অঞ্চলের

খ্রীষ্টানরা পাদরিদের যে শ্রদ্ধা করে তার উপর নির্ভর করে আমি বললাম যে আমি ঐ সর্তে রাজি আছি। আমি বরং আর একটু বেশী বললাম যে যদি সে রকম হয় আর আমার জেলিয়াদের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে আমি সময় বাঁচাবার জন্য ওদের বজরাগুলি টেনে নিয়ে যেতে বলব। মুসলমানরা আমার কথা শুনে খুব খুশী হয়ে মাল পাঠাবার অনুমতি-পত্র [Licence] নিতে চলে গেল। এই সব, আর এর চেয়েও বেশী অনেক কিছু কাজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করা যায়, আর স্বার্থ অতি বড় শত্রুকেও সাহায্য করতে বাধ্য করে।

তাই, তারপর দিন ভোরে ভাল করে আলো হবার আগেই ঐ মুসলমান দুজন খুব খুশী হয়ে আর অনুমতিপত্র সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। তখনই তারা আমাকে আমার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল আর যাবার আগে বলে গেল যে সন্ধ্যার প্রায় দু ঘণ্টা পরে পুরো জোয়ার আসবে। তারা তখন আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবার জন্য আসবে।

আমি যখন আমাদের বাসায় পৌছলাম তখন শুনলাম যে ফাদার ফ্রে সেবাষ্টিয়ান ইতিমধ্যেই জাহাজে উঠেছেন। আমাদের কি ঘটেছে তা তিনি বন্‌জাতেই শুনতে পেয়ে একেবারে সেইখানেই জাহাজে উঠেছেন। ঘণ্টাগুলি আমার মনে হচ্ছিল শেষ হবে না, মিনিটগুলি যেন এক এক বছর লম্বা আর সেকেণ্ডের আর শেষ নেই। এমনি ভাবে আমি আমার যাবার মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কারণ আমি আর কোন নতুন বিপদের আশঙ্কা আর মুসলমানদের বিরক্তিকর ব্যবহার সহ্য করতে পারছিলাম না।

শেষ অবধি নির্দিষ্ট সময় এল, আর মুসলমানেরা আমাকে নিয়ে যেতে এল। আমি তখনই গিয়ে বজরায় উঠলাম। আমরা নিরাপদে জাহাজে পৌছলাম, আর জাহাজের লোকটিকে মালের ভার দিয়ে আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলাম। আমার জাহাজ চড়-বার পর আমার বন্ধু ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেনের আর সেখানে অপেক্ষা করবার কোন কারণ ছিল না। তিনি তখন নোঙ্গর তুলতে বললেন। অনুকূল বাতাসে পাল তুলে পরিষ্কার আকাশ আর শান্ত সমুদ্রে আমার যাত্রা মনে হল সফল আর নিরাপদ হবে। তাই আনন্দিত মনে আমরা যাত্রা আরম্ভ করলাম। সেদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৬৩৬ সাল।

কিন্তু সমুদ্রের একটি দুর্নাম আছে যে তার সব ব্যাপারই অনিশ্চিত। রাত হবার আগেই হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আর নাবিকরা একে ভীষণ ঝড়ের সঙ্কেত ভেবে বেশ ভয় পেয়ে গেল। তাই আমাদের পাইলট আর ক্যাপ্টেন বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা পালগুলি নাবিয়ে নিয়ে ছোট মাস্তলগুলিকে নাবিয়ে দিতে হুকুম দিলেন আর হালে আরও লোক লাগিয়ে দিলেন। তারা যখন এই সব হুকুম তামিল করছিল তখন আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল আর ভীষণ উত্তর পশ্চিমে হাওয়া সমুদ্রকে উত্তাল করে দিল। মনে হল যে জলের উপর কখনো গলানো কাঁচের পাহাড় আর কখনো গভীর খাদ তৈরি হচ্ছে। জাহাজটিও অসহায় ভাবে কখনো এদিক আর কখনো অন্য দিকে মাথা নীচু করতে লাগল যেন এমনি ভাবে নতি স্বীকার করলে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র কিছু রাগ কম করবে। পাইলট আর নাবিকরা বলছিল ভীষণ দোলন

খুব বিপজ্জনক। যাত্রীদের পক্ষে তো খুব কষ্টকর ছিলই, তবে নাবিকরা ভয় পাচ্ছিল যে যদি দোলা সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে জাহাজ মাথা নীচু করে ডুবে যাবে, আর আমরা স্থলের প্রাণীরা মাছ হয়ে যাব।

এই বিপদ কাটাবার জন্য পাইলট হুকুম দিলেন যে সামনের মাস্তুলটি অর্দ্ধেক নাবিয়ে দেওয়া হ'ক। এই ভাবে হাওয়া পিছনে রেখে আমরা কোন রকমে একই জায়গায় থাকবার চেষ্টা করছিলাম। আমাদের ভয় ছিল যে হাওয়া আমাদের চন্দেখানের চড়ার উপর নিয়ে যাবে। আমি এই ইতিবৃত্তের গোড়ার দিকে বলেছি যে এই খানে আমার একবার জাহাজ ডুবি হয়েছিল। এই বিপদ হতে পারে বলে আমাদের পাইলট হালটি তুলে নিলেন। যাতে জাহাজ কোন বিশেষ দিকে না যায়। তিনি তার চেষ্টা করছিলেন। এমনি ভাবে আমরা সকাল অবধি ঐ খানেই অর্থাৎ আমাদের যাবার পথেই থাকবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সকালেও দেখলাম বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই বিপদের মধ্যে আমাদের করুণাময় পিতা হঠাৎ বৃষ্টি নামালেন, আর বাতাস কমে এল। কিন্তু তখনও ভীষণ ঢেউ উঠছিল আর আমাদের জাহাজের গায়ে এত জোরে এসে পড়ছিল যে ভয় হচ্ছিল যে বুঝি বা জাহাজের জোড় খুলে যাবে। যাহোক, জাহাজটি নতুন ছিল বলে ভাঙ্গল না, আর আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবার পঞ্চম দিনে করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় এমন সুবাতাস পেলাম যে তিন দিনের মধ্যেই গঙ্গার উপসাগর [বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগ] থেকে বেরিয়ে গেলাম। এখানে আবার বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, আর সাধারণের চেয়ে বেশী দিন আমাদের সেখানে থেমে থাকতে হল। এই জন্য আমরা আমাদের খাবার জল র‍্যাশন করতে বাধ্য হলাম, বিশেষ করে এই জন্য যে আমাদের জাহাজে আশি জন দাস ছিল। এরা গরম দেশের লোক বলে এই কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত নয়। তাই তারা অনেক জল খেয়ে ফেলেছিল। পরীক্ষা করে দেখলাম যে সঙ্গে যত জল আছে ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম আছে। আমরা তাই যাত্রীদের নিজেদের কাছে বোতলে বা কলসীতে যে জল ছিল তা নিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। সব জল সকলের জন্য যে ট্যাঙ্ক ছিল তাইতে ঢালা হল। তারা চাবিগুলি আমাদের দিয়ে দিল আর এই অনুরোধ করল যে ভবিষ্যতে যাতে কোন গোলমাল না হয় তাই আমরা যেন জল বিতরণে সাহায্য করি। আর প্রত্যেক লোককে যেন দিনে এক লিটার জল দিই। কিন্তু বাতাস চলল না, আর জল কমে যেতে লাগল দেখে আমরা জলের রেশন আধ লিটার করে দিতে বাধ্য হলাম। শেষ অবধি এমন অবস্থায় পৌঁছলাম যে দিনে আমরা প্রত্যেককে শুধু এক পোয়া জল দিতে পারতাম। জলের অভাবে আমাদের বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। চারিদিকে বিশেষ করে দাসেদের মধ্যে অনেক করুণ দৃশ্য দেখতাম। কয়েকজন তৃষ্ণায় পাগল হয়ে সমুদ্রের জল খেতে আরম্ভ করল। আর যখন আমরা তা বন্ধ করবার চেষ্টা করলাম, তখন তারা নিজেদের প্রস্রাব খেতে আরম্ভ করল। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ষোল জন দাস মরে গেল। হয়তো আমরা সবাই সেই একই পথের যাত্রী হতাম যদি না ঈশ্বর তাঁর পরম করুণায় এমন সুবাতাস বওয়াতেন যে চার দিনের মধ্যেই আমরা সেই প্রসিদ্ধ সিংহল [ceilan] দ্বীপ দেখতে

পেতাম। এই দৃশ্য দেখে মৃতপ্রায় ব্যক্তি হঠাৎ রোগ থেকে সেরে গেলে যে আনন্দ পায় আমরা তাই পেলাম।

এই স্বাস্থ্যকর, উর্বর, মনোরম আর সম্পদে পূর্ণ দ্বীপকে প্রাচীনেরা তাম্রপর্ণী [Taprobane] বলতেন। স্বাস্থ্যকর বলতেন এখানকার নাতিশীতোষ্ণ আর সুন্দর আবহাওয়ার জন্য ; উর্বর কারণ এখানে বিশেষ করে কালানে [Calane = কলম্বো ?] অঞ্চলে অনেক সুন্দর নদী আছে ; মনোরম কারণ এই দ্বীপের অধিকাংশ পাহাড় আর মঙ্গল সুগন্ধ দারচিনির গাছ আর একরকম বড় বড় পাতাওয়ালা ফলের গাছ ভরা। এই গাছ ব্রেডফ্রুট গাছের মত আর এতে বড় আপেলের মত ফল হয়। একে জ্যাক ফ্রুট [কাঁঠাল] বলে। এই ফলের বাইরে ছোট ছোট কাঁটা থাকে কিন্তু তাতে ভিতরের শাঁসে পৌঁছতে কোন অসুবিধা হয়না। শাঁস হলদে আর মিষ্ট, আর এর স্বাদ খুব ভাল। শাঁস আর বিচি দিয়ে অনেক রকম স্বাদু তরকারি বানান হয়। প্রকৃতি মাতা তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখেছেন যে এত বড় আর ভারী ফল রাখবার সামর্থ্য এই গাছের ডালের নেই, তাই এই ব্যবস্থা করেছেন যে ফলগুলি গাছের গুঁড়ি থেকে বেরোন শিকড়ে বা ডাঁটাতে জন্মাবে। এই ডাঁটাগুলি এত শক্ত যে সঙ্গে ছুরি বা অন্য ধারালো কিছু না থাকলে ফলগুলি পাড়া শক্ত।

দ্বীপটি সুপারি গাছে ভরা। যেমন আগেই বলেছি এগুলি ছায়াপ্রদ গাছ আর এদের পাতা উজ্জ্বল সবুজ। গাছগুলি দেখতে সুন্দর। গাছের নাম এর ফলের নামে অ্যারেকা [Areca] হয়েছে। এই ফল পানের সঙ্গে খেতে হয়। এই ফল এদেশে এত বেশী হয় যে জাহাজ ভর্তি করে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় পাঠান হয়। এই দেশে আরও অনেক রকম ফসল উৎপন্ন হয়। গমের চাষ অবশ্য হয় না। তাছাড়া এই দ্বীপে অনেক দামী পাথর যেমন, নীলা, চুনি, গোমেদ, স্ফটিক, ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানকার হাতিদের কথাও ছাড়া উচিত হবে না। প্রাচ্যের সব হাতির মধ্যে এই দেশের হাতিই সব চেয়ে ভাল আর শক্তিশালী। সব চেয়ে বেশী দামে এই হাতি বিক্রি হয়। এদেশের লোকেরা বলে যে সিংহলী হাতিদের মধ্যে কিছু জাতিগত শ্রেষ্ঠতা আছে, আর অন্য দেশের হাতিরা এদের দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। আমি কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সিংহলী হাতি আর অন্য দেশের হাতিদের এক সঙ্গে দেখে এ কথার কোন প্রমাণ পাইনি। পোর্তুগালের রাজার কর্মচারীর অনুমতি না পেলে এই হাতিগুলিকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না।

আমাদের কথার সূত্রে আবার ফিরে আসা যাক। সেই আমরা এই উচ্চ-প্রশংসিত দ্বীপটি যাকে এই দ্বীপের অধিবাসীরা আদমের স্বর্গ বলে, দেখতে পেলাম, অমনি ধীরে ধীরে এর কাছে যেতে লাগলাম আর তীরের পাশে পাশে গিয়ে গল্লে [Galle] বন্দরে পৌঁছলাম। এখানে আমরা জল নেবার জন্য তিন দিন ছিলাম। এখানে সব যাত্রীদের আর দাসেদের নাবিয়ে দিলাম, আর আমাদের দুর্বল আর ক্লান্ত শরীরকে কিছু বিশ্রাম দিলাম। যদিও আমাদের খাবার কম পড়েনি কিন্তু জলের অভাবে মনে হচ্ছিল যেন খাবারও নেই আর আমাদের জীবন সঙ্কট হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ নেওয়া

হয়ে গেলে আমরা গল্লে ছাড়লাম আর ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিপজ্জনক কেপ কমোরিন পেরিয়ে যাওয়া অবধি সু বাতাস ছিল। এই অন্তরীপ ঘুরে নয় দিন পরে আমরা কোচিন বন্দরে নোঙর ফেললাম। বর্ষাকালটা আমাদের এখানেই কাটাতে হল কারণ গোয়া যাবার শেষ জাহাজগুলি আগেই ছেড়ে গিয়েছিল।

প্রথম যাত্রা সমাপ্ত

———

[গোয়াতে কিছুদিন থাকার পর মানরিক সেখান থেকে বেরিয়ে চীন, ফিলিপিন ইত্যাদি পূর্বদেশে ভ্রমণ করেন। ফেরবার পথে তিনি মাকাসার বন্দর (সেলিবিস বা সুলাবেসী দ্বীপে) থেকে জাহাজে গোয়া ফেরবার জন্য ওঠেন। মানরিক গোয়া যাচ্ছিলেন সেখান থেকে দেশে ফেরার জন্য। তাঁদের জাহাজ জাভাতে কিছুদিন থেমে যখন আবার বঙ্গোপসাগরে এসেছে তখন ঝড়ের মুখে পড়ে পুরীর কাছে হর্ষপুর বলে একটি জায়গায় থামে। সেখানে তখন জন ইয়ার্ড বলে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি সেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ। জাহাজটি দেখে তিনি নৌকা করে জাহাজে এসে ওঠেন। তিনি মানরিককে বলেন যে তখন শীতকালীন মনসুন শেষ হয়ে গেছে। জাহাজের পক্ষে আর গোয়ার দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। মানরিকের তাই হেঁটে স্থলপথে দেশে ফেরা উচিত। মানরিক তাই স্থলপথেই ভারতবর্ষ থেকে ইয়োরোপ যাওয়া স্থির করেন।]

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

[১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

কেমন করে আমি উড়িষ্যা রাজ্যের আরপুর [হর্ষপুর] বন্দরে পৌঁছে স্থলপথে ইয়োরোপ যাওয়া স্থির করলাম।

জুয়ান ইয়ারদাদ [জন ইয়ার্ড] নামক ইংরেজ ভদ্রলোকের নৌকাতে দাঁড় টেনে আর পাল তুলে চারলীগ গিয়ে আমরা একটি নদীর মুখে পৌঁছলাম। নদীর মুখে বালির চড়া, আর সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ থাকাতে আমরা অতি কষ্টে নদীতে প্রবেশ করতে পারলাম।

বন্দরে নামামাত্র সেই ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানকার শাহ বন্দর [Xabandar, বন্দরের অধ্যক্ষ] আমরা কোন মাল এনেছি কিনা দেখতে এলেন। তিনি যখন দেখলেন যে আমি যে কাপড় চোপড় এনেছি তার উপর কোন শুল্ক লাগবেনা, তখন তিনি চলে গেলেন। পরদিন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন যে আবার জাহাজটিতে ঘুরে আসা যাক। কিন্তু দেখলাম জাহাজটি চলে গেছে। পরে শুনলাম যে পিপলির মোহনায় ঢোকবার অনুকূল বাতাস পাওয়াতে জাহাজটি সেখানে চলে গেছে। তিনি তখন আমাকে বললেন যে কিছু কাজ শেষ করবার জন্য

তাঁকে তিন চার দিন থাকতে হবে, কিন্তু তারপর আমাদের হর্ষপুর [Arcepur, হর্ষপুরগড়, কটকের প্রায় সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে] যাওয়া উচিত। সেখানে গিয়ে তিনি আমার যাবার ব্যবস্থা করবেন। এই সময় পিপলি থেকে খবর পেলাম যে জাহাজটি যখন মোহানায় ঢুকছিল তখন হঠাৎ আবহাওয়া বদলে যায়। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আর বাজ পড়া আরম্ভ হয়। আর যদিও তাদের যতগুলি নোঙ্গর ছিল সবগুলি তারা ফেলেছিল, তবুও ঝড়ের এমনি বেগ ছিল যে জাহাজটিকে কতগুলি পাথরের উপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে হাজার টুকরায় ভেঙে ফেলে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে নিয়ে সাতাশ জন লোক মারা যায়। এই কথা শুনে আমি কম চমকিয়ে উঠিনি। আর এ কথাও ভেবে-ছিলাম যে আমাকে এইবার এর আগের অন্য বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমার ঈশ্বরের করুণার কাছে কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইংরেজ ভদ্রলোকের কাজ হয়ে গেলে আমরা হর্ষপুর শহরে গেলাম। এটি দেশের মধ্যে আট লীগ দূরে। নদী বেয়ে যেতে হয়। নদীর দুধারে বড় বড় ছায়াতরু। এগুলি একে অন্যের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে মনে হয় দু পাশে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে। এই বনে সুন্দর সুন্দর ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবুজ টিয়ারা চিৎকার করছে, ঘুঘুরা লুকিয়ে আছে। এরা সংখ্যায় এত বেশী যে ডায়না দেবীর উপাসকরা দেখলে খুশী হবে। [ডায়না শিকারের দেবী]

ইংরেজ ভদ্রলোকেরও এই নেশা ছিল। তাই তিনি শিকারের জন্য চকমকে অনেক অস্ত্র সঙ্গে এনেছিলেন। পথের অধিকাংশ সময় তিনি এই কাজে লাগালেন। আর দিনের শেষে তিনি তাঁর পরিশ্রমের মূল্য এক বোঝা শিকার জোগাড় করলেন।

হর্ষপুর শহরে পৌছে, আমার কোন পথে যাওয়া উচিত সেই বিষয়ে খোঁজ আরম্ভ করলাম। অনেক আলোচনার পর গোয়া হয়ে পোর্তুগালে যাবার পথটি বাতিল করলাম। কারণ এতে আমার হাতে যে অন্য কাজ ছিল তার সুবিধা হবেনা, আর তাছাড়া পথটি লম্বা। দ্বিতীয়বার ইণ্ডিয়া হয়ে যেতে হবে বলে একটু ঘোরা পথ। তাই ঠিক করলাম যে যখন এত দূর এসে গেছি তখন স্থল পথেই যাওয়া ভাল। বাংলার বারটি রাজ্য পেরিয়ে হিন্দুস্থানে [Industan] ঢুকে পাটনা [Patna] প্রদেশে আর নগরে যাব, আর সেখান থেকে সোজা পথ ধরব।

এই পথে যাওয়া ঠিক করে আমি আমার পোশাক বদলিয়ে মুঘল পোশাক বানিয়ে নিলাম। একটা ঘোড়া কিনলাম আর সঙ্গে চলবার জন্য পেয়াদা বা চাকর রাখলাম যাতে সদাগরের ছদ্মবেশে যেতে পারি। ১৬৪০ অব্দে আমি রওনা হলাম। তখন ওদেশে বর্ষাকাল। কটকের নবাব বা ভাইসরয়ের শাসনাধীন উড়িষ্যা প্রদেশের হর্ষপুর নগর ছেড়ে ঠিক অষ্টম দিনে আমি সেই প্রদেশেরই বালাসোর শহরে পৌছলাম। ভীষণ বৃষ্টির জন্য, আর বারবার নদী পেরোতে হচ্ছিল বলে আমরা একেবারে ক্লান্ত অবস্থায় পেঁৗছেছিলাম। বেশীর ভাগ জায়গাতেই কোন নৌকা বা পুল ছিলনা, তাই আমাদের হাঁটু জল, কখন ও বা কোমর জল, এমন কি বুক জল অবধি হেঁটে পার হতে হয়েছিল। একদিন তো আমাদের বেশ বিপদের মুখে এগারবার নদী পেরোতে হয়েছিল। নদীতে

খুব জল আর খুব স্রোত ছিল। সব সময়ে আমরা জবজবে ভিজে থাকতাম। তাই এখানে পাঁচদিন থেকে কিছু ফেল্টের কোট বানিয়ে নিলাম, যাতে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারি। পথ জেনে নিয়ে, আমরা বালিঘাটার দিকে চললাম। এই শহর ওখান থেকে এক শ সাইত্রিশ লীগ দূরে। শহরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সেখান থেকে আমাদের পাটনা যেতে হবে।

এই স্থির করে আমরা বালাসোর শহর ছেড়ে একটা নদী পেরিয়ে রামচন্দ্রপুর (Ramacandrapur) শহরে রাত কাটালাম। এখান থেকে পরদিন ভোরে রওনা হয়ে আট লীগ গিয়ে সন্ধ্যায় সময় আমরা জলাসর (Jalasar) শহরে পেঁছলাম। এটি একটি জনবহুল বাণিজ্য কেন্দ্র। সুতী কাপড়, রেশম, গাছগাছড়া, প্রচুর আফিম আর পোস্ত, অর্থাৎ সেই সব জিনিষ যার বর্ণনা আমি আগেই করেছি, এখানে ব্যবসার প্রধান সামগ্রী। এই শহরে মাঝারি সাইজের একটা সরাই (Caramosora) আছে, তাতে তেত্রিশটি কামরা। আমরা এখানেই উঠলাম। শুধু বাংলার এই অংশে নয়, সারা মুঘল সাম্রাজ্যে এমন কি খোরাসান আর পারস্যেও এই সরাইগুলিই হল পথিকদের আশ্রয় নেবার জায়গা। শ্রান্ত পথিক বা যখন ভাষণ তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ চলে আসে, বা সমুদ্রের দারুণ ঝড়ে যখন তাদের পাগল করে দেয়, তখন তারা হাঁপাতে হাঁপাতে এইখানেই ছুটে আসে। পাঠকদের কৌতুহল মেটাবার জন্য আমি আমার নিজের কাহিনী স্থগিত রেখে এই সরাইগুলির চেহারা আর ব্যবস্থার একটা বিবরণ দেব।

রাজপথগুলি যেখানে পথিকদের যাতায়াত, বেশীর ভাগ সরাই সেইখানেই অবস্থিত। কখন কখন কাছাকাছি গাঁয়ের লোকেদের খরচে এগুলি বানানো হয়। আবার অনেক সময় কোন রাজা বা ধনীলোক নিজেদের স্মৃতি রেখে যাবার জন্য বা প্রায়শ্চিত্তের জন্য এগুলি বানিয়ে দেন। এরা এগুলি চালাবার জন্য অনেক টাকা রেখে যান। তাঁরা ভাবেন এগুলি পুণ্যের কাজ আর এই কাজ ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

এগুলি সাধারণতঃ চারকোণা বাড়ি, অনেকটা মঠের বাড়ির মত। বাড়িতে অনেকগুলি ঘর থাকে। দেখা শোনা করবার জন্য পুরুষ বা স্ত্রী পরিচারক থাকে। এই পরিচারকদের মেথর বা মেথরাণী [Metras and Metranis] বলা হয়। এদের কাজ হল ময়লা ফেলা, ঘরগুলিকে পরিষ্কার রাখা আর ঘরে খাট তৈরি রাখা। এরা কিন্তু বিছানা দেয়না। এ দেশের পথিকেরা নিজেদের বিছানা সঙ্গে নিয়ে চলে।

খাটগুলি দু তিন ইঞ্চি চওড়া নেয়ার দিয়ে, আর কখনও বা নানারকম জিনিষের দড়ি দিয়ে বানান হয়। এতে এগুলি এত নরম হয় যে ইয়োরোপের তুলতুলে নরম তোষকের চেয়ে অনেক বেশী আরাম। লোকে সাধারণতঃ গোডরিম [godorim] বা তুলোর তোষক সঙ্গে নিয়ে চলে। এগুলি হালকা, আর বেশী জায়গা নেয় না। এই চাকররা অতিথিদের খাবার বানায়, আর তাছাড়া তাদের আরামের জন্য যা কিছু এমন কি পা ধোবার জন্য গরম জল অবধি বানিয়ে দেয়। তাই কোন সরাইতে পৌছে শুধু বাজার থেকে খাবার জিনিষ আনান ছাড়া আর কিছু করতে হয় না। বাকি সব কাজ

এই কর্মিতকর্মা চাকরদের উপর ছেড়ে দিলেই চলে। এই সব কাজ ছাড়া যদি পথিক-দের সঙ্গে ঘোড়া থাকে তাহলে তাদের জন্য মুগ বা ছোলা বানানোর কাজও এদের। ইয়োরোপে আমরা ঘোড়াকে যব দিই। এরা তার বদলে মুগ দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ জায়গায়, বিশেষ করে বাঙ্গালা আর হিন্দুস্থানে তারা ঘোড়াকে একরকম শস্য খাওয়ায়। এগুলি খুব পুষ্টিকর আর ভাল। এই শস্যের নাম মুগ। এগুলি সাধারণ মসূরের চেয়ে অনেক ভাল। খুব ভাল করে সিদ্ধ করে একে ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর মেখে গুলি বানিয়ে ঘোড়ার মুখে দেওয়া হয়। দামী ঘোড়া বিশেষ করে যেগুলিকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় তাদের এই খাবারের সঙ্গে ঘি আর গুড় [Jagra] অর্থাৎ ফুটিয়ে প্রায় শুকনো করা চিনি, মিশিয়ে দেওয়া হয়। যব পাওয়া যায় না বলেই যে ঘোড়াকে এই খাবার দেওয়া হয় তা নয়। আসলে ঘোড়াকে মোটা আর চটপটে করবার জন্য তাদের এই সব জিনিষ খাওয়ান হয়, কিন্তু ফলে ঘোড়ারা থলথলে হয়ে যায়। আসলে এরা গৃহপালিত জন্তুদের খুব ভালবাসে বলে এ সব খাওয়ায়। এরা বলে যে এরা ভগবানের জীব, তাই যারা আমাদের সেবা করে আর আমাদের কথা শোনে তাদের প্রতি আমাদের দয়ালু হওয়া উচিত। অনেকে আবার এত দূর যায় যে শীতকালে কুকুরকে তুলো ভরা কোট পরায়। গুজরাট রাজ্যে আমি দেখেছি [মানরিক কখনও গুজরাটে গিয়েছিলেন বলে জানা নেই] যে গরু আর বাছুরের গায় এই রকম ভাল কোট পরান, বুকে বোতাম লাগান আর পেট ঘেরা।

এখন মেথর আর মেথরাণীদের কথায় ফিরে আসা যাক। যেমন আগেই বলেছি এরা এই সব সরাইয়ের পরিচারক। এরা এত বেশী সেবাপরায়ণ যে এক ঢেবুয়া [Debua] বা বড় জোর দু ঢেবুয়া পেলেই খুশী। এই ঢেবুয়া এত ছোট মুদ্রা যে আধখানা আটের রিয়ালে [Real of eight] ছাপ্পান্নটা ঢেবুয়া বা পয়সা হবে। [আটের রিয়াল প্রায় তিন টাকার সমান, অর্থাৎ দেড় টাকায় ছাপ্পান্ন ঢেবুয়া হত। তাই বর্বর আর ধর্মহীন হলে কি হবে, এরা ইয়োরোপের সরাইওয়ালা বা আস্তাবল রক্ষকদের চেয়ে অনেক বেশী ভাল লোক। তারা খ্রীষ্টান, তাই ভিতরে বাইরে সব ভাবেই তাদের নম্র হওয়া উচিত, কিন্তু অনেকে ঠিক এর উলটো। তাই মনে হতে পারে যে হয়তো তারা ভাবে যে যে সব হতভাগ্য পথিক তাদের হাতে পড়ল তাদের লুটে নিতে না পারলে তাদের কর্তব্য ঠিক করে করা হল না। [এর পর মানরিক ইয়োরোপের সরাইওয়ালাদের হৃদয় হীনতার বিষয়ে দুটি গল্প বলেছেন।]

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

লেখক এই পরিচ্ছেদে জলাসর থেকে নরাঙ্গর শহর অবধি পথের বর্ণনা করেছেন।

জলাসর শহর ছেড়ে আমরা খুব কষ্টকর পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পথে এত কাদা আর জল৷ যে যদিও জলাসর থেকে নরাঙ্গর মাত্র সাত লীগ দূরে তবু আমরা সন্ধ্যা অবধি

সেই শহরে পৌছতে পারলাম না। সে রাত্রে আমাদের পথ থেকে একটু দূরে একটা ধর্মহীনদের [হিন্দুদের] গাঁয়ে কাটাতে হল। তবে, যেহেতু আমরা অন্য ধর্মের লোক, আর তাছাড়া মুর্গী আর গরু শুয়োর খাই তাই আমাদের ঘরে ঢুকতে দিতে রাজি হল না, কারণ তাহলেই নাকি ওদের ধর্মের মতে ওরা অপবিত্র হয়ে যাবে। আমাদের তাই একটা গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে হল। জায়গাটা বিশেষ পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু আমাদের আসল নালিশ তা নয়, কারণ হাজারে হাজারে মশা আমাদের শ্রান্ত শরীরকে বিশ্রামের কোন সুযোগই দেয়নি। এখানকার লোকেরা অবশ্য চাল, ঘি আর দুধের তৈরী অন্য খাবার আমাদের খুব সস্তায় দিয়েছিল। এই খাবার খেয়ে আমরা যে নতুন রক্ত বানিয়েছিলাম এই পাজি মশারা তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের পুরান রক্ত খেয়ে ফেলেছিল। এ ছাড়া সারারাত তাদের কর্কশ সঙ্গীতের জন্য আমাদের না ঘুমিয়েই কাটাতে হল, আর কখন ভোর হবে সেই আশায় বসে থাকতে হল। কিন্তু সকালে আবার আরও দুঃখের ব্যাপার ঘটল। সকাল হতেই বজ্র বিদ্যুতের সঙ্গে এত জোরে বর্ষা নামল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সমতল ভূমি দেখতে দেখতে জলে ঢেকে গেল। আমাদের তাই ধৈর্য ধরে আর একদিন সেখানে থাকবার জন্য তৈরী হতে হল। ভাবলাম যে পরদিন হয়তো এমন লোক পাওয়া যাবে যে শুকনো রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। ইতিমধ্যে দিনের আলোতে মশাদের আক্রমণ কমে গিয়েছিল বলে আমরা ভাবলাম যে কিছু ঘুমের সুযোগ পাব। কিন্তু অদৃষ্টের বিধান ছিল এরকম যে আমাদের আরামের ব্যাঘাত দ্বিগুণ হবে। আমরা যে গোয়ালে ছিলাম তার দরজা বা জানলা প্রায় কোন দিনই মেরামত হয়নি। তাই ময়ূর, ঘুঘু, পায়রা ইত্যাদি পাখীরা এই ধর্মহীনদের বন্য জন্তুদের প্রতি দয়ার সুযোগ নিয়ে, এই সব জায়গায় একেবারে পোষা জন্তুর মত ঢুকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সব জন্তুদের নির্ভয়ে ঢোকা দেখেই বোঝা যায় যে এই বর্বররা তাদের মিথ্যা ধর্ম কি রকম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে।

এই দিন কিন্তু এই পাখীদের ভুল হয়ে গিয়েছিল কারণ সে দিন সেই গোয়ালে অন্য ধরণের মানুষ ছিল, কিছু সত্য ধর্মের পালনকারীরা আর কিছু অলকোরানের বিশ্বাসীরা। তবে এই দুটি দলই এই বিষয়ে একমত ছিল যে এই প্রাণীদের মেরে এদের মাংস খেলে কোন পাপ হবে না। প্রথম যার ঘুম ভাঙল সে ছিল মহম্মদের অনুগামী। সবার আগে তার চোখ এবং তার হাত পড়ল সব চেয়ে বড় ময়ূরটার উপর। পাখীটা নিশ্চয় এই সরল ধর্মহীনদের কাছে আদর খেতে অভ্যস্ত ছিল, তাই সে সহজেই ধরা দিল। এবার কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে নরম হাতের জায়গায় যে হাত ওর গায় পড়ল সে তার ঘাড় দুমড়ে দিল। সে তার গভীর বিশ্বাসের দাম দিল চিরকালের শান্তির বদলে। যখন এই প্রায় আত্মহত্যা আর অন্য একটা এ রকম হত্যা হয়ে গেছে, তখন সেই লোকটা অন্য পাখীদের দিকে দৌড়ল। এই শব্দে আমার আর অন্য কয়েকজনের ঘুম ভেঙে গেল। দুটো মরা পাখী দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যখন দেখলাম যে আমাদের কেউ দেখছেনা, তখন খানিক নিশ্চিন্ত

হলাম। কিন্তু আমি সেই লোকটাকে বকুনি দিতে ছাড়লাম না। তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে সে জেনে শুনে ঐ রকম দেশে কি বিপদের কাজ করেছে। তার পর আমরা বললাম যে ময়ূর দুটোকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে রাত্রে যখন সব চুপচাপ হয়ে যাবে তখন এই দুটিকে খেয়ে ফেলতে হবে। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা পালক আর হাড়গুলিকে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললাম, যাতে ব্যাপারটা একেবারে গোপন থেকে যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আর অসাবধনতার দরুণ কয়েকটি খুব ছোট পালক বাইরে থেকে যায়। পরের দিন যখন ঐ গোয়ালের মালিকরা জায়গাটা পরিষ্কার করতে এল তখন ঐ পালকগুলি দেখে তারা পুরো ব্যাপারটা জেনে গেল। এই দুষ্কৃতি আর পাপ দেখে তারা সেই চিরাচরিত "বাবরে" [Babara] ডাক ছাড়ল। এই লেখায় আমি আগেই বলেছি যে ওরা এই ভাবে বিচার চাই বলে জানায়। এই ডাকে গাঁয়ের সব লোকেরা ছুটে এল। আর আমরা যে পাপ আর দোষ করেছি তা স্পষ্টই বুঝতে পেরে এই অন্যায়ের শোধ নেবার জন্য তৈরি হল। কয়েকজন তীর ধনুক আর কয়েক-জন বর্শা নিয়ে এল। তারপর ভীষণ রেগে তারা আমাদের খুঁজতে বেরোল। আমাদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা আমাদের ধরে ফেলল। খোলা ময়দানে এই ব্যাপার হচ্ছিল বলে আমরা তাদের দূর থেকেই দেখতে পেয়ে-ছিলাম। অনেক আগে ভুলে যাওয়া সেই ময়ূরের ঘটনা মনে করে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওরা আমাদের দোষের শাস্তি দিতে আসছে। যে কোন পদের লোকই হোক না কেন, নিজেদের রক্ষা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই দুটো বন্দুকে গুলি ভরা আরম্ভ করে, যে বন্দুকগুলিতে আগে থেকেই গুলি ভরা ছিল সেগুলিকে সামনে রেখে, আমরা আমাদের পথ প্রদর্শক কে কিছু না বলে, যতক্ষণ সেই পাগল লোকেরা কাছে না এসে পড়ে এগিয়ে চললাম। ধনুকের পাল্লার মধ্যে এসে তারা আমাদের দিকে এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে আমাদের যাচ্ছে তাই করে গালাগাল দিতে আরম্ভ করল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অসীম করুণায় ঠিক করলেন যে আমাদের কারো আঘাত লাগবেনা। আমাদের পথ প্রদর্শক যেই পুরো ব্যাপারটা শুনল অমনি সে আমরা ধর্মহীন বলে আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমরা একবার বন্দুক ছুঁড়ে ঐ তীরের ঝাঁকের জবাব দিয়েছিলাম যাতে ওরা ভয় পেয়ে যায় আর কাছে না এগোয়।

যদিও বন্দুক ছোঁড়া হয়েছিল শুধু ওদের ভয় দেখানোর জন্য, তবুও আমাদের পথ প্রদর্শক ওদের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে এই শব্দে এত ঘাবড়িয়ে গেল যে সে ধপ করে মাটিতে মড়ার মত পড়ে গেল। এতে সেই লোকেরা এই ভেবে নিল যে সে সত্যই মরে গেছে এবং দৌড়ে আরও দূরে চলে গেল। কিছু দূর গিয়ে তারা থামল। আমার মনে হয় তারা ভেবেছিল যে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই লোকটিকে দেখতে যাবে তখন তাদের তারা ধরবে। পরে যখন দেখলাম সবাই পালিয়ে গেছে তখন আমরা নিজেদের পথে রওনা হলাম। কিন্তু তার আগে আমরা পথ প্রদর্শক কে দেখতে গেলাম। সে তখনও ভয়ে ভ্যাবা চাকা খেয়ে ছিল। আমরা তার হাত ধরে, মিষ্টি কথা বলে তাকে সাহস দিলাম যাতে সে আমাদের নিরাপদে নারাজোর [নারায়ণগড়-মেদিনীপুরের

৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে] পৌঁছে দেয়। এই কাজ সে ভয়ের চোটে করল, কোন লাভের আশায় বা নিজের ইচ্ছায় নয়।

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে লেখক নারায়ণগড় [Narangor] অবধি নিজের যাত্রার আর সেখানে কি ঘটল তার বর্ণনা করেছেন।

যেখানে ধর্মহীনরা আমাদের তীর ছুঁড়ে আক্রমণ করেছিল সেখান থেকে চলে আমরা নারায়ণগড় শহর পৌঁছলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা সেখানে পৌঁছলে আমাদের পথ প্রদর্শক আমাদের সরাইতে নিয়ে গেল। সেখানে আমাদের বেশ পরিষ্কার ঘর দেওয়া হল। আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে সে আমার কাছে বিদায় আর নিজের কাজের বেতন চাইতে এল। আমাদের প্রতি তার বিদ্বেষ সে বেশ হাসি মুখে লুকিয়ে ছিল। আমি তাকে নির্ধারিত বেতনের ওপর কিছু বেশী দিলাম, আর আদেশ দিলাম যে তাকে কিছু গোলমরিচও দেওয়া হ'ক। এই জিনিষ এই ধর্মহীনরা খাদ্যের স্বাদ বাড়াবার জন্য খুব পছন্দ করে। আমি ভাবলাম যে এর পর সে ময়ুর মারার কথা ভুলে যাবে।

কিন্তু পাজিটা ঠিক তার উলটো করল। সে সোজা শিকদার বা নগরের শাসকের বাড়ি গেল। শিকদার বাড়ি ছিলেন না তাই সে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে যে ধর্মহীনরা আমাদের দিকে তীর ছুঁড়েছিল তারা এসে পৌছল, আর এই লোকটা আমরা কোথায় আছি সে কথা তাদের বলে দিল।

যেই শিকদার বা নগরের শাসক ফিরে এলেন অমনি এরা সবাই তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বিচার চাইল। তারা বলল যে কয়েকজন বিদেশী তাদের গাঁয়ে এসেছিল, আর তাদের তারা খুব যত্ন করে গাঁয়ে রেখেছিল, কিন্তু তারা উলটে তাদের ধর্মে আর আচারে আঘাত দিয়েছে। অভিযোগ আরও বাড়াবার জন্য তারা বলল যে আমরা ডাকাত, আর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে চলি, আর আমরা ভয়ানক লোক, ইত্যাদি। অর্থাৎ যতটা বাড়িয়ে বললে শিকদারের মন আমাদের উপর বিরূপ করা যায় ততটা তারা বলল। এই খবর শুনে, আর আমরা কোথায় আছি জানতে পেরে শিকদার বার জন সেপাইকে আমাদের গ্রেপ্তার করতে আর সকালে তাঁর সামনে হাজির করতে হুকুম দিলেন। হুকুম পেয়েই এই কর্মচারীরা সরাইতে চলে এল। তখন মাঝ রাত্রি হয়ে গেছে। আমরা এসব কিছুই জানতাম না, তাই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছিলাম। হট্টগোল আর তারা সঙ্গে যে আলো এনেছিল তাই দেখে আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল ততক্ষণে আমাদের কয়েকজনের হাত শক্ত করে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গেছে। আমি ইতিমধ্যে "দোহাই পাদশাহ" [Doay Padcha] বলে চেঁচিয়েছি আর জানতে চেয়েছি যে যখন আমরা সম্রাটের দরবারে যাচ্ছি, আর তাঁর এলাকার ভিতর দিয়ে যখন যে কোন বিদেশী যেতে পারে তখন আমাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেন।

তখন তাদের মধ্যে একজন যে বোধহয় ঐ দলের নেতা সে বলল যে আমি যা বলছি সত্যই যদি তাই হয় তাহলে আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তখন বললাম যে আমরা যখন স্বেচ্ছায় যেতে রাজি আছি তখন আমাদের পিছমোড়া করে বাঁধা হচ্ছে কেন।

তাইতে তারা আমাকে আর অন্যদের মত বাঁধলনা। তারপর তারা আমার কাপড়ের স্টক পরীক্ষা করল আর ঘরগুলির প্রধান দরজায় তালা লাগিয়ে তাতে সীল-মোহর করে দিল। তারপর তারা আমাদের নগর শাসকের বাড়ি নিয়ে গেল আর যাতে আমাদের পাহারা দেবার হাঙ্গাম না হয়, তাই মাটির তলায় একটা অন্ধ কুঠরিতে আমাদের পুরে দিল। এ কুঠরিটা এত গভীর যে আমাদের বেশ কয়েকটি সিঁড়ি নাবতে হল। এই খানে তারা আমাদের অন্ধকারে ভয় আর আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দরজায় বড় বড় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

হতভাগা চাকরদের [Chacores] আর আমাদের পেয়াদাদের হাত এত শক্ত করে বাঁধাছিল যে তারা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। তাছাড়া ভীতু বলে তারা ভাবছিল যে এই কুঠরিতে থেকে তারা আর জ্যান্ত বেরোবে না। তাদের কান্না দেখে কিম্বা আমার বকশিসের লোভ দেখান সত্ত্বেও সেপাইরা তাদের বাঁধন খুলল না দেখে তারা আরও ভয় পেয়ে গেল। সেপাইরা চলে গেলে পর আমি এই কান্না আর সহ্য করতে না পেরে ভাবলাম "যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন" [Preso por mil, preso por mily quinientos—হাজারের জন্য ধরা পড়াও যা পনর শ'র জন্য ধরা পড়াও তাই]। আমার কাছে একটি ছুরি ছিল। তাই দিয়ে ওদের শব্দ শুনে আর হাত ধরে ধরে অন্ধকারে সকলের বাঁধন কেটে দিলাম। এতে তাদের শারীরিক কষ্ট চলে গেলেও মনের ভয় গেল না। আর তাছাড়া যে লোকটা আমাদের এই কষ্টের কারণ তার উপর তাদের রাগও গেলনা সবাই বললে যে আমি যেন সেই লোকটার বাঁধন না কাটি। কিন্তু আমি ভাবলাম যে যা হয়ে গেছে তাকে তো আর শোধরানো যাবে না। তাই আমি তার বাঁধনও কেটে দিলাম।

আমরা এই কুঠরির মধ্যে পরের রাত্রি অবধি থাকলাম। বর্বররা সারাদিন আমাদের খাবার দেবার কথা মনেও আনেনি। লোভে পড়ে ময়ূর খাবার জন্য আমরা যেন এই উপবাসের শাস্তি পেলাম। যখন প্রায় রাত একটা হবে তখন আমরা দরজা খোলবার শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের যে সেপাইরা ধরে এনেছিল তার জায়গায় এবারে অন্য সেপাইরা এল। এরা আমার সাথীদের যে হাত বাঁধা নেই তা লক্ষ্য করল না। কোন কথা না বলে এরা আমাদের কুঠরি থেকে বার করে বিচারকের সামনে নিয়ে গেল। তিনি নিজের আদালতে বসেছিলেন, আর আমাকে খুব কড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কে। আমি বললাম যে আমি হুগলির একজন পোর্তুগীজ, আর আমার এই কথা আর আমার যাত্রার কথা কটকের নবাবের ফর্মান থেকে প্রমাণ হবে। এই বলে আমি আমার ফর্মান পেশ করলাম। তিনি এটা তাঁর এক কর্মচারীকে পড়তে বললেন। আমার পাসপোর্টে কি লেখা আছে শুনে তিনি সেলাম করে কাছে যেতে অনুরোধ

করলেন। তিনি আমাকে ধর্মহীনদের নালিশের কথা বললেন। তাতে আমি সত্যই কি ঘটেছিল তাঁকে জানালাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার চাকরদের মধ্যে কে ঐ ময়ূরগুলি মেরে ছিল। আমি তার শাস্তির ভয়ে, তাঁর প্রশ্ন যেন বুঝতে পারিনি এই ভাব দেখিয়ে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম এমন সময় তার একজন সাথী চট করে তার নাম বলে দিল। শিকদার তখন দোষীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কি বাঙালী আর মুসলমান (অর্থাৎ মুর বা সত্যধর্মের অনুগামী) ন'স? তাহলে কেন তুই হিন্দু (যার অর্থ ধর্মহীন) পরগণায় [Pragana de Indus] প্রাণী হত্যা করলি?

হতভাগা লোকটা ভয়ে একেবারে আধমরা হয়েছিল বলে জবাব দিতে পারল না। তাই আমি বাধ্য হয়ে অনেক সেলাম করে তার হয়ে বললাম, "সাহিব (অর্থাৎ মহাশয়), ভাল মুসলমান আর আপনাদের নবি মহম্মদের উপদেশের অনুগামী বলে এই ব্যক্তি হিন্দুদের হাস্যকর নিয়মকে কান দেয়না, ঠিক যেমন আপনিও দেন না। এটা বিশেষ করে এই জন্য যে ঈশ্বর তাঁর শেষ, পবিত্র আর সত্য ধর্মে কোথাও এই সব প্রাণীকে মারতে বারণ করেন নি, কারণ সেই স্বর্গীয় মহিমা এইগুলিকে মানুষের কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর যদি আমরা এই কথা মানি তাহলে এই লোকটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা তাঁর উপদেশের বিরুদ্ধে বা আপনাদের আলকোরানের বিরুদ্ধে কোন দোষ করেনি। কাজেই আপনি সহজেই একে ক্ষমা করতে পারেন। শিকদার আর অন্য যে সব গণ্যমান্য মুসলমান সেখানে ছিলেন, তাঁরা আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন। তাঁরা পরস্পরের দিকে খুব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন, আর আমি যা বলেছিলাম তা অনুমোদন করে শিকদার তাঁদের বললেন, "পবিত্র আল্লা ফিরিঙ্গিদের (এই নামেই ওরা পোর্তুগীজদের এ দেশে ডাকে) অনেক জ্ঞান দিয়েছেন।"

তিনি তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে তাঁর আমার কথার জবাবে কিছুই বলবার নেই, এই গুলি সবই আমাদের আনজিরের [Anzir] (এই নামই তারা আমাদের পবিত্র সুসমাচারগুলিকে দেয়) মতে সত্য। কিন্তু সম্রাট যিনি ধর্মহীনদের কাছ থেকে এই দেশ জয় করেছেন তিনি পবিত্র নবির মজহবের [Mossaffo] নামে এই শপথ নিয়েছেন যে তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই ধর্মহীনদের নিজেদের ধর্মের আর নিয়মের মতে চলতে দেবেন। তিনি তাই এই নিয়মগুলির কোন অন্যথা হতে দেন না। তিনি অবশ্য আমাকে এই কথা দিলেন যে অভিযোগকারীরা যে শাস্তি চায় তার চেয়ে তিনি অনেক কম শাস্তি দেবেন। তিনি তাই হুকুম দিলেন যে দোষীকে বন্দীখানা [bundicana] বা সাধারণ জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ক আর আমাদের বাকি সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হ'ক। আমরা তখন বেশ খুশী মনে সরাইতে ফিরে এলাম। যদিও রাত তখন তিনটে তবু আমারা ঘুমোবার আগে খেয়ে নেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম বলে আগে খাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর ঘুমকে তার ধার শোধ দিলাম। তাই তখন যখন ভোর হল তখন দুটি প্রয়োজনই পুরো হয়ে গেছে দেখে আমরা দরবারে [Droua দরজা ?] বা শিকদারের দেওয়ানে গেলাম। তিনি দরবারে আসবার আগে আমি আমার বন্দী সাথীর জন্য শাসকের স্ত্রী বা

শিকদরেজার [Siguidarega, মানরিক হিন্দী শব্দের সঙ্গে স্প্যানিশ স্ত্রী প্রত্যয় জুড়ে এই শব্দ বানিয়েছেন] একজন বিশ্বস্ত লোক যার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম, তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। তাকে নিয়ম মাফিক খুশী করে, আমি তার হাত দিয়ে এই মহিলার কাছে একটি সাদা গোলাপী আর হলদে ফুল তোলা চীনের ট্যাফেটা পাঠিয়ে দিলাম। উপহারটি বেশ দামী আর মনোরম ছিল। সেই মহিলা এই উপহারের ভাল প্রতিদান দিয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন, তিনি তাঁর স্বামীকে এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে বন্দীকে যেন চুপিচুপি ছেড়ে দেওয়া হয়, আর সে পালিয়ে গেছে এই কথাটা রটিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু যেহেতু এই নালিশ পুরো একটা গাঁয়ের লোকের ছিল তাই শিকদার তাদের রাগিয়ে দিতে সাহস করলেন না। তাছাড়া মামলাটা আরও সোজা এই জন্য হয়ে গিয়েছিল যে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই দোষের শাস্তি চাবুক মারা আর ডান হাত কেটে ফেলা। বন্দীর অবশ্য এই কথা মোটেই ভাল লাগেনি। আর সাথীরা তাকে সমানে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে আমি তাকে ছাড়াবার যথাসম্ভব চেষ্টা করছি, তা সত্ত্বেও সে কোন কথাই শুনতে রাজি হচ্ছিল না। এমন কি সে শুধু এক কান্না বাদে কিছুই করছিল না, আর খেতেও রাজি হচ্ছিল না. আর শুধু আমাকে ডেকে আনা হ'ক বাদে আর কিছুই বলছিল না। আমার যদিও তখন ভীষণ মন খারাপ ছিল তবুও আমি ঠিক করলাম যে জেলখানায় গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব। আমি ঈশ্বরের কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করলাম যেন এই ছেলেটিকে তার যৌবনের প্রারম্ভে এই ভীষণ শাস্তি না পেতে হয়। কিন্তু আমি প্রভুর এমনিই ভুলোমনা সেবক যে এই কথা প্রার্থনা করতে আমার মনে রইল না যে তার স্বর্গীয় মহিমা যেন তাকে সেই শাস্তি থেকেও উদ্ধার করেন যা তার ভুল, দুষ্ট বিশ্বাস. ধর্মের জন্য প্রাপ্য। কিন্তু করুণাময় পিতা সেই পথভ্রান্ত মেষকে আত্মার উর্বর চরবার জমি দেখাবার কথা ঠিক করেছিলেন, তাই আমি যখন তার শারীরিক আর অল্পস্থায়ী দুঃখের থেকে বাঁচাবার কথা ভাবছি তখন সেই স্বর্গীয় করুণা তাকে অনন্ত দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে উৎসাহিত করলেন। যেই আমি বন্দীর কুঠরিতে ঢুকলাম অমনি সে হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরে, কোন কথা না বলে ভীষণ ভাবে কাঁদতে লাগল।

তার কষ্টের জন্য আমার চোখ দিয়েও জল পড়তে আরম্ভ করল। সেই সময় আমি যতটা পারি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, আর তাকে এই উপদেশও দিলাম যে সে ঈশ্বরের কাছে শুধু মাত্র এই বিপদ থেকে বাঁচবার প্রার্থনা না করে। তার চেয়েও বড় বিপদ যা তার আলকোরাণের মিথ্যা উপদেশ পালন করবার জন্য হবে যেগুলি আমাদের সত্যধর্মের বিরোধী, সেই বিপদ থেকেও যেন তিনি তাকে উদ্ধার করেন। তা ছাড়া আমি তাকে এই বললাম যে সেই স্বর্গীয় মহিমা তাকে এই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এই জন্য নিয়ে যাচ্ছেন যে এর প্রভাবে সে বুঝতে পারবে যে সে কি ভাবে মুক্তির পথ ছেড়ে বিপথে চলে যাচ্ছে। তার কঠিন আত্মা খানিকটা প্রভাবিত হল, আর সে শান্ত ভাবে উত্তর দিল যে সে খ্রীষ্টান হতে চায়, আর তারপর ঈশ্বর যা হয় তা

করবেন। কিন্তু সে এতদিন কি রকম দৃঢ়ভাবে সব উপদেশ উপেক্ষা করেছে তা আমার মনে পড়ল। ভাবলাম হয়তো আমি যাতে তাকে প্রাণপনে বাঁচাবার চেষ্টা করি তারই জন্ম এটা তার একটা মুসলমানী চাতুরী। আমি তাই তার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলাম আর বললাম যে সে যেন এই সিদ্ধান্তকে ধরে রাখে আর প্রমাণ করে যে সে তার নিজের ধর্ম এই কারণেই ত্যাগ করছে যে সে বুঝতে পেরেছে যে এটা মিথ্যা আর যতদিন সে এই ধর্মে বিশ্বাসী থাকবে ততদিন সে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সে বলল যে এ কথা সত্য যে আগে সে কোনদিনই খ্রীষ্টান হবার কথা ভাবেনি, কিন্তু জেলখানায় ঢোকবার আগে অবধি সে তার অন্তরের কথা জানত না। এখন তার অন্তর তাকে খ্রীষ্টান হবার কথা বলছে, আর কয়েকদিন ধরে সে আর কিছুই চাইছেন। আমি তাকে বললাম যে সে যেন তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তাছাড়া, সে এখন কি রকম ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে সে কথাও তাকে যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিলাম। খানিকটা শান্ত হয়েছে দেখে আমি তাকে কিছু খাওয়াতে পারলাম। তারপর তাকে ছেড়ে আমি সেই সোজা যে আমাদের মধ্যস্থতা করছিল তার কাছে গেলাম এই কথা জানতে যে সেই দয়ালু মহিলা এ বিষয়ে কি করেছেন। তিনি তাঁর স্বামীকে খোশামোদ করে, মান করে, রাগ দেখিয়ে শেষ অবধি আমরা যা চাইছিলাম তাই করতে রাজি করিয়ে ছিলেন, অর্থাৎ বন্দীর কোন অঙ্গচ্ছেদ হবে না। কারণ, যদিও শিকদার আগেই হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন যে তার হাত কাটা হবে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলা হবে না।

সুন্দর মুখের এমনিতেই এক ক্ষমতা তার উপর সে বিবাহের জোর পেয়েছে, তাই আঙ্গুল গুলো কাটা থেকেও মুক্তির হুকুম হল। আর শেষ অবধি ঠিক হল যে শুধু চাবুক মারা হবে। পরে যখন অভিযোগকারীরা জেদ করতে লাগল যে তাকে পুরো শাস্তিই দেওয়া হ'ক, তখন চুপিচুপি এক রাত্রে তাকে জেল থেকে বার করে দেওয়া হল, আর আমার উপর হুকুম হল যে আমি যেন বর্দ্ধমান [Barduan] শহরে গিয়ে তার জন্ম অপেক্ষা করি। আমাকে বর্দ্ধমান হয়েই এমনিতেও যেতে হত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

কেমন করে লেখক নারায়ণগড় শহর ছেড়ে বালিঘাটা শহরের দিকে যাত্রা করলেন।

বন্দী ছাড়া পেয়েছে এই খবর দিয়েই সেই মহিলা আমাকে সেখানে আরও তিন দিন থাকতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন যে আমার তখনই রওনা হবার কোন প্রয়োজন নেই, আর তা ছাড়া আমি কদিন থেকে গেলে এই ব্যাপারটা গোপন রাখা আরও বেশী সম্ভব হবে। আমি তাঁর কথামত কাজ করলাম। আমার

যদিও সময়ের খুবই অভাব ছিল তবু আমি ভাব দেখালাম যে আমি খুশী মনেই আছি। আর তাঁর কাছে আমি এত বাধিত ছিলাম যে আমার সেই সরল ও দয়ালু মহিলাকে দেখান বিশেষ দরকার ছিল যে কৃতজ্ঞতার জন্য যেকোন অনুরোধ রক্ষা করা যায়। তৃতীয় দিন অর্থাৎ শেষ দিন আমি শিকদার, তাঁর স্ত্রী আর যে খোজা আমাদের সাহায্য করেছিল সবাইর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তারপর যখন ভোরের আলো সবে পাখীদের ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে ঠিক সেই সময় আমি চৌত্রিশ লীগ দূরে বর্দ্ধমান শহরের জন্য রওনা হলাম। চতুর্থ দিনে আমি সেখানে পৌছলাম, আর সেই পলাতক বন্দীকে নগরের দরজার কাছে দেখতে পেলাম। সে এই শহরে পৌছে রোজ এই খানে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করত। আমাকে দেখবা মাত্র সে এমন খুশী হয়ে আমার দিকে দৌড়ে এল, যে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে সে এখনও খ্রীষ্টান হবার ইচ্ছা ত্যাগ করেনি। এই জন্য আমি গোপনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি ভাবলাম যে কাজ আমার কাছে এত কঠিন সেই কাজ তাঁর স্বর্গীয় মহিমার কাছে কত সহজ। আর একটু এগিয়ে সরাইতে পৌছে আমরা সেই খানে রাত কাটালাম। রাত্রে তার সঙ্গে কথা বলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে বিপদে পড়ে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা সে রাখবে। সে বলল যে সে সর্বান্তঃকরণে এই কথা বলছিল, আর তার এ বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই। তাই যদি না হত তাহলে সে নিজের দেশে চলে যেতে পারত, কিন্তু এখন দেশের কথা বা নিজের মা বা ভাইদের কথা মন থেকে মুছে ফেলেছে। খ্রীষ্টান হয়ে যাবার পর সে আমাকে কখনও ছাড়বে না। আর যদি আমি ওকে খ্রীষ্টান করতে না চাই তাহলে যেন অন্ততঃ ওকে কোন খ্রীষ্টান দেশ অবধি নিয়ে যাই। আমি ওকে বললাম যে ও যা চাইছে তা আমি করতে রাজি আছি। আর কিছু দেরী করলে যখন কোন ক্ষতি নেই, তখন সব চেয়ে ভাল হবে যদি ও আমাদের ধর্মের প্রাথমিক কথাগুলি আমার কাছে শিখে নেয়। আর ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন আমরা বালিঘাটা [Balighata, ভাগীরথী নদীর ধারে রঘুনাথ গঞ্জ আর জঙ্গীপুরের কাছে বেলিয়াঘাটা ?] পৌছব তখন আমি তাকে এই সব শেখাতে আরম্ভ করব। সেখানে আমি সঙ্গের অন্য লোকদের ছেড়ে যাব। তারা যদি জানতে পারে যে সে খ্রীষ্টান হয়ে যেতে চায়, তাহলে তারা এ কথাও বুঝে যাবে যে সে আমার সঙ্গে যেতে চায়, আর এটা তারা সহজেই আটকাতে পারে। এই জবাবে সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হল।

আমরা তখন সেই সমতল. জনবহুল আর উর্বর দেশের মধ্য দিয়ে চলতে থাকলাম। রাস্তায় জল আর কাদার জন্য পথ চলা বেশ কষ্টকর ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা মুসুমাবাজার [Musumabazar] নগরে পৌছলাম। এই নগর গঙ্গার ধারে বালিঘাটা নগরের অন্য পারে অবস্থিত। শহর দুটি নামে আলাদা হলেও মনে হয় একই শহর, মাঝ খান দিয়ে গঙ্গা চলে গেছে।

এদের মধ্যে প্রথমটিই বেশী বড়। এর আয়তনের জন্য লোকে এর নাম দিয়েছে মুসুমাবাজার, যার মানে আমাদের ভাষায় বড় বড় হাট আর বাজারের জায়গা।

এখানে আমরা তিন দিন থাকলাম। নদী পার হবার আগে আমাদের যা কিছু ছিল

সব চৌকিদার [Choquidar] বা কাস্টম অফিসের [custom post] খাতায় লেখাতে হল। এই সময়ের মধ্যে আমি এখানে যা কিছু দেখবার জিনিষ ছিল দেখে নিলাম। অন্য জিনিষের মধ্যে যা আমার সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ল তা এখানকার বাজারে সব জিনিষের বিশেষ করে খাবার আর বাড়ি ঘরদোরের জিনিষের প্রাচুর্য। এদের মধ্যে ছিল শস্য, চাল, তরকারি, আখ, ঘি, অনেক রকমের তেল ইত্যাদি। এদের যে কোনওটি দিয়ে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করা যায়।

এ সব ছাড়া নানা রকম ওষুধ, তামাক, আফিম, আর অসংখ্য এই রকম জিনিষ দেখে মনে নানা রকম কথা আসে। মনে হয় এখানে একটা শহরেই কত জিনিষের প্রাচুর্য, আর ইয়োরোপের বহু জায়গায় এই সব জিনিষের এত অভাব।

চৌকিদার বা কাস্টম অফিসারদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর আমরা গঙ্গা পেরোলাম। গঙ্গা এখানে পৌনে এক লীগ চওড়া। বালিঘাটা পৌছে, আমি আমার হিসাব পত্র মিলিয়ে, সঙ্গেকার চাকরদের পাওনা মিটিয়ে বিদায় দিলাম। আর তার পর তখনই নৌকা করে পাটনা [Patana] যাবার ব্যবস্থা করলাম। যেই আমি পাটনা যাবার জন্য একটা নৌকা ঠিক করেছি তখনই আমার এত তেড়ে জ্বর এল যে তিন দিনের মধ্যেই আমি ভাবলাম যে আমার পরকালের জন্য এর চেয়ে ভাল নৌকার ব্যবস্থা করা দরকার; প্রায়শ্চিত্ত আর ইউখ্যারিস্টের [Sacrament of Penitence and Eucharist] অনুষ্ঠান করা দরকার। আমি জানতাম যে আমার পবিত্র সম্প্রদায়ের ভ্রাতারা ঢাকা আর সিরিপুরে [Seripur] আছেন। তাই আমি সেখানে তাঁদের কাছে গেলাম। এর জন্য আমাকে সাত দিনের পথ যেতে হল, আর ফেরবার সময় নদীর স্রোতের উজানে বলে চোদ্দ দিন লেগে গেল। জ্বর ছাড়ছিলনা, আর স্বাভাবিক মৃত্যু-ভয়গ্রস্ত হয়ে এ সব কথা আমি আর ভাবলাম না। সেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি অনেক ভাল অবস্থায় পৌছলাম। এখানে আমার ফ্রে জুয়ান দেলা ত্রিনিদাদের সঙ্গে দেখা হল। ইনি অত্যন্ত দয়ালু আর কর্মঠ যাজক, আর এখানকার অবিশ্বাসীরা এঁকে খুব খাতির করে। এখানে এসেই আমি প্রথমে আমার নিজের আত্মার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। তারপর যে যুবককে আমি নারায়ণগড় থেকে এনেছিলাম তার বাপ্টাইজের ব্যবস্থা করলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছু সাধারণ ওষুধপত্র খেয়েই বার দিনের মধ্যে আমার জ্বর ছেড়ে গেল। আমি তখন আবার নিজের পথে যাত্রার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু সেই সময় কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। খবর পাওয়া গিয়েছিল যে মগরাজ এক শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে শহর আক্রমণ করছেন, তাই শহরে আর সীমান্তে সবাই অস্ত্রধারণ করছিল। আমার ফিরে যাবার তাই বেশ কয়েকটি বাধা উপস্থিত হল। আর এর মধ্যে সব চেয়ে বড় বাধা এই যে পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ফ্রানসিস্কো রিবেরো আর অধিকাংশ খ্রীষ্টানই তখন সেখানে ছিলেন না। অবশ্য সে অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক তাঁর জামাই লুইস গোমেজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁর কাছেও সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা সত্ত্বেও আমাকে ক্যাপ্টেন ফিরে না আসা অবধি সেখানে থাকতে হল। তিনি এসে নবাবের নায়েবের [Lieutenant] কাছ থেকে পাসপোর্ট

জোগাড় করে দিলেন। এই সময় নবাব ছিলেন পাদশাহ'র দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহসুজা। ইনি রাজমহল [Rajamol] শহরে বাস করছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

লেখক এই পরিচ্ছেদে তাঁর ঢাকা ছেড়ে পুরাতন গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ অবধি যাবার বর্ণনা করেছেন। [অক্টোবর ১৬৪০]

আমি ঢাক [Daack] বা পোর্তুগীজ ভাষায় যার নাম ঢাকা সেই শহরে সাতাশ দিন ছিলাম। আমি যখন এখানে এসে পৌছই তখন আমার মোটেই জ্বর ছাড় ছিলনা বলে কোনদিন এই শহর ছেড়ে যাবার আশা ছিল না। বাধাগুলি দূর হবা মাত্র আমি গঙ্গা নদী বেয়ে যাত্রা আরম্ভ করলাম। অভিজ্ঞ লোকেদের মত নিয়ে আমি পাটনা অবধি যাবার জন্য একটি নৌকা ঠিক করলাম। নৌকার পাইক বা দাঁড়ীরা একেবারে প্রথম শ্রেণীর ছিল আর আমি চবুতরা [Choutera] অর্থাৎ প্রধান কাস্টম আফিস থেকে পাসপোর্ট নিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার এই সব পরিশ্রম বৃথা হল। কারণ সারাদিন অন্য ছোট চৌকি আর কাস্টম আফিস পেরোতে লেগে গেল। এখান থেকে পাটনা যেতে হলে ঢাকা আর আজারতী [Azarati] শহরের মধ্যে সাত বার যেখানে থামতে হয় সেখানকার সব কাগজপত্র জোগাড় হয়ে গেলে পরদিন ভোর বেলা আমরা রওনা হলাম। কিন্তু স্রোতের বিপরীত যাচ্ছিলাম বলে আমরা বেশী দূর যেতে পারলাম না। প্রথম দিন তাই আমাদের একটা ধর্মহীনদের গ্রাম আমদমপুরে [Amdampur, তাভের নিয়েরের দামপুর Dampour] নোঙর ফেলতে হল। আমাদের ভাগ্যে লেখা ছিল যে সেই দিনই তারা তাদের একজন ব্রাহ্মণ বা মূর্তি পূজারীর স্মৃতিতে একটা অনুষ্ঠান করবে। এই লোকটার সাধু বলে খ্যাতি ছিল। আগের বছর মৃত্যু তার পাপী জীবন যাত্রা শেষ করে দিয়ে শাস্তির জন্য তাকে নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তীরে পৌছে নৌকাটিকে সামনে পিছনে শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা হল যাতে সেই ভীষণ স্রোতে ভেসে না যায়। তারপর যা সাধারণতঃ এই সব নৌকায় লোকে করে থাকে সেই অনুসারে আমরা তীরে নামলাম। তীরে পৌছবার আগেই, লোকের ভীড় আর হট্টগোল শুনে আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করে নিয়েছিলাম যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তাই আমরা সাবধান হয়ে নৌকাটিকে মন্দির থেকে এত দূরে বেঁধেছিলাম যেখানে বন্দুকের গুলি অবধি পৌছবে না। আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা এত দূরে থাকলে আর ঐ ধর্মহীনদের হাস্যকর কুসংস্কারে আঘাত লাগবে না। কিন্তু আমরা ভুল ভেবেছিলাম। আমরা নামামাত্রই তাদের কয়েকজন আমাদের এসে বলল যে আমরা যেন সেখান থেকে চলে যাই অথবা নৌকায় উঠে পড়ি। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা বেশ ভদ্রভাবে বললাম যে যেই আমাদের পাইকদের খাওয়া হয়ে যাবে আমরা তখনই চলে যাব। এই উত্তর পেয়ে তারা চলে গেল। তারা সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেছে ভেবে আমরাও যা করছিলাম তাই করতে থাকলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রাত হয়ে

গেল। অন্ধকার হলেই লোকের মনে ভাল মন্দ নানা রকম ভাবনা আসে। ঐ মূর্তি-পূজকদের ভাবনা ছিল তাদের অনুষ্ঠানগুলির পবিত্রতা নিয়ে। আর যদিও আমরা অনেক দূরে ছিলাম তবু ওরা ভাবছিল সেগুলি অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা আমাদের তাড়ান ঠিক করল। আর দ্রুত কাজ করতে গেলে হিংসার আশ্রয় নিতে হয় এই ভেবে তারা অন্ধকারে কাপাসের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে লোক পাঠিয়ে নৌকাটিকে খুলে দিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই নৌকাটি ছুটে বেরিয়ে গেল, আর যে সব দাঁড়ীরা সাঁতরে এসে নৌকাটিকে ধরবার চেষ্টা করেছিল তাদের নাগালের বাইরে বেরিয়ে গেল। নৌকাতে সেই সময় শুধু আমি ছিলাম আর আমার একজন চাকর ছিল। আমরা দুজনে দুটো দাঁড় দিয়ে নৌকার মুখ সোজা করে দিলাম, তা নইলে নৌকাটি এত জোরে ভেসে যাচ্ছিল যে হয়তো কোন বালির চরায় লেগে ডুবে যেত। নৌকাটি এত বেগে ভেসে চলেছিল যে আমরা প্রাণপন চেষ্টা করেও তার মুখ তীরের দিকে ঘোরাতে পারলাম না। চাঁদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পূবে হাওয়া আরও বেড়ে যাচ্ছিল। স্রোত আর সেই হাওয়ার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারলাম না। এপার বা ওপার কোন পারেই নৌকাটিকে নিয়ে যেতে পারব না দেখে, হার মেনে নিয়ে আমরা লড়াই করা ছেড়ে দিলাম। অবশেষে আমরা নল-খাগড়ার একটি চরে এসে লাগলাম, আর আমাদের কাছে যা শিকল ছিল তাই দিয়ে নৌকাটিকে বেঁধে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। পরদিন আমাদের দাঁড়ীরা এসে হাজির হল। তাঁরা সাঁতরাবার সাহস করেনি তীর ধরে হেঁটে এসেছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই তাদের মধ্যে একজন কলসী ভাসিয়ে নদীতে নামল, আর এক টুকরা শিকল দিয়ে টেনে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে সহজেই আমাদের তীরে নিয়ে এল। তারপর গুণ টেনে আমরা যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে এল। এখানে আমাদের রান্নার বাসন আর যে লোকটি সেগুলিকে পাহারা দিচ্ছিল তাকে তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। তখন আমদমপুরের বর্বরদের উপর বেশ ঘেন্না আর বিরক্তি ধরে গেছে।

এই ব্যাপারে চুকে গেলে আমরা এই বিরাট গঙ্গা নদী বেয়ে এগিয়ে চললাম; এদিকে বেশী লোক চলাচল নেই। তাই পাঁচ দিনের মধ্যে শুধু কয়েক জাতের কুমীর [Caimanes or crocodiles] বাদে আর কিছু দেখিনি। এগুলি এক একটি এত বিরাট যে দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমরা নিজেদের চোখকে প্রায় বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাই এদের আয়তনের বর্ণনা পাটিগণিত আর মাপ জোক জানা লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আমি যদি এই বর্ণনা করি তাহলে এত অদ্ভুত শোনাবে যে কেউ তা বিশ্বাস করবে না।

আজারতি শহরের কাস্টম চৌকিতে পৌঁছিয়েই আমরা রাজধানী ঢাকা থেকে আনা আমাদের ফর্মান বা পাসপোর্ট পেশ করলাম। এটি দেখে তারা আমাদের কোন প্রশ্ন না করেই যেতে দিল। এই নদী ধরেই আমরা আরও নয় দিন এগিয়ে চললাম। নদীর দুই ধার খুব উর্বর। সমানে আমাদের গাঁ বা ছোট শহর চোখে পড়ছিল। নদীর দুই ধারে যতখানি আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সব জায়গায় ফলের বাগান বা গম, ধান

বা তরকারির খেত। যেখানে এই সব নেই সেখানে বড় বড় চরবার জমি, তাতে গরু, ষোষ, ভেড়া বা ছাগলের বিরাট বিরাট পাল। কেবল শুয়োর নেই, কারণ শুয়োর এরা খায় না।

এ ছাড়া আমরা গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষও দেখলাম। পুরাকালে এই জায়গা গাঙ্গেয় সাম্রাজ্যের [Gangetic Empire] রাজধানী আর প্রধান শহর ছিল। বাংলার পাদশারা অর্থাৎ সম্রাটরা এখানে থাকতেন।

তারপর, আমাদের খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা তীরে নামলাম। নামবার পর আমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের নিয়ম মতে খাবার বানাতে আরম্ভ করল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ক্যাথলিকদের পক্ষে পবিত্র আর উচিত নিয়ম মানতাম, কয়েকজন ধর্মহীন মূর্তিপূজকদের কুসংস্কারগুলি মানত, আর বাকি কয়েকজন আবার মুসলমানদের ঘৃণ্য আর দুষ্ট নিয়মগুলি মানত। এখন এই সব তৈরি করতে. আর তেল মেখে স্নান করতে (যেমন আমি অন্য জায়গায় বলেছি এশিয়ার বেশীর ভাগ লোক খাবার আগে স্নান করে) আমার সাথীদের সাধারণতঃ দু তিন ঘণ্টা লাগত। তাই আমি ভাবলাম যে ঐ বড় বড় প্রাচীর যে গুলির পূর্ব গরিমা ঐ ধ্বংসের মধ্যে দিয়েও দেখা যাচ্ছিল তারা কত বড় তাই দেখে আসব। এই ব্যাপারে কৌতুহলী হয়ে আমি আমার দু জন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে সেই দুর্গের দিকে গেলাম। জায়গাটি নদী থেকে আধ মাইলের কিছু উপর হবে। সেখানে পেঁছবার আগে আমরা মাঝারি উচ্চতার আর একটা দেওয়ালের কাছে পেঁছলাম। এটা বোধহয় দুর্গের বাইরের প্রাকার। দেওয়ালে একটা ছোট দরজা দেখতে পেয়ে ভাবলাম যে তাই দিয়ে সহজেই ভিতরে যাওয়া যাবে, তাই সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে পেঁছবার আগেই আমরা দরজার কাছে কিছু সেপাই বা সৈন্য দেখতে পেলাম। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি চাই। আমি জবাব দিলাম যে আমি এখানে নবাগত, তাই ভাবলাম যে যখন এদিক দিয়ে যাচ্ছি তখন এই সব পুরানো জিনিস দেখে যাই। তাতে একজন বলল যে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি না পেলে আমি ভিতরে ঢুকতে পারব না। সে আমার জাতি জিজ্ঞাসা করাতে আমি বললাম যে আমি একজন ফিরিঙ্গি সদাগর [Frankish Sodagor]—এই নামেই এ সব দেশের লোক পোর্তুগীজ ব্যবসাদারদের ডাকে। আমি তারপর সাধারণ সেলাম করে ফিরে আসছিলাম। কিন্তু সে লোকটি খুব ভদ্রভাবে আমাকে বলল যে আমি যেন চলে না যাই। এখনই একটি লোক ক্যাপ্টেনকে খবর দিতে যাবে, আর তিনি নিশ্চয় আমাকে এই অনুমতি দেবেন। এই কথা শুনে, যাতে আমার ব্যবহার অভদ্র না দেখায়, তাই অপেক্ষা করা স্থির করলাম। তাছাড়া আমি জানতাম যে এদেশের লোকেরা স্বভাবতঃই এত ভীরু যে সামান্য কারণেই লোককে সন্দেহ করে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে লেখক তাঁর পরবর্তী যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন আর গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষের যা কিছু তিনি দেখেছিলেন তার বর্ণনা করেছেন।

তখন একজন প্রহরী সেই অনুমতি আনতে গেল। সে যতক্ষণ না ফিরল ততক্ষণ অন্য প্রহরীরা আমার দুই সাথীর একটা পিস্তল আর একটা বন্দুক পরীক্ষা করে কাটিয়ে দিল। এই সব অস্ত্রের বিষয়ে এরা বেশী কিছু জানেনা, কারণ মুঘল সৈন্যরা সাধারণতঃ তীর ধনুক ব্যবহার করে। শুধু এদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর সৈনিকদের হাতে বন্দুক থাকে। এদের নাম তোপঞ্চি (Tufangis)। এরা সঙ্গে আর্কেবস (এক রকম পুরাকালের বন্দুক) নিয়ে চলে। এগুলি ভাল করে বানান নয় বলে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে খুব সুবিধা হয়না। যে লোকটি অনুমতি আনতে গিয়েছিল সে ফিরে এসে বলল যে ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেছেন যে যদি আমার খুব তাড়া না থাকে তাহলে যেন আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি, কারণ তিনি ফিরিঙ্গিদের (Franguis) সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালবাসেন। এই অনুরোধ শুনে আমি তখনই সেই লোকটির সঙ্গে গেলাম। সেই বড় প্রাচীর যা দেখে আমার এদিকে আসবার ইচ্ছা হয়েছিল তার কাছে পেঁৗছে আমরা একটা সুন্দর পাথরের তৈরি ধনুকাকৃতি খিলান দেয়া ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ফটকটির উপর পাথর কেটে ফুল পাতা ইত্যাদি বানান ছিল। বড় বড় থাম থাকাতে এটাকে খুব গম্ভীর আর প্রধান দরজার মত দেখাচ্ছিল। এই ফটক দিয়ে আমরা একটা সুন্দর বড় উঠানে ঢুকলাম। এখানে শুধু অনেক গুলি ইঁটের ঢিপি ছিল। ইঁটগুলি খুব শক্ত কারণ সবকটিই আস্ত ছিল। আমরা যখন সেইদিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন যে লোকটি আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল সে বলল যে আজকাল আর এরকম ইঁট তৈরি হয়না, একালের লোকেরা এত দুষ্ট যে সব জিনিসেই ভেজাল।

এই সব ভেঙে পড়া বাড়িগুলির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা বড় তাঁবুর কাছে এসে পড়লাম। কুড়ি জন সেপাই সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজনের পোশাক দেখে তাকে তাদের নায়ক বলে মনে হচ্ছিল। সে তার লোকেদের দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে সেলাম করল। তার পর আমার হাত ধরে যেখানে মিরজা ছিলেন সেখানে নিয়ে গেল। মিরজা দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারের মত হবেন। ইনি আর পাঁচজন মুসলমান খুব মর্যাদাপূর্ণভাবে একটা টেবিলের পাশে বসেছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তিনি হেসে বললেন, "মিয়াঁজি বৈঠো" (Mianji baitho) (আমাদের ভাষায় যার মানে হবে "মহাশয়, অনুগ্রহ করে বসুন"।) "আপনার কথা শুনে আপনি যতক্ষণ না এসে পেঁৗছন ততক্ষণ আমরা খেতে আরম্ভ করিনি। আমি ফিরিঙ্গিদের খুব ভালবাসি। তাই আপনাকে অনুরোধ যে আপনার যদি খাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।" তাঁকে খুশী করবার জন্য আমি বললাম যে আমি খেয়ে আসিনি, (আর একথা সত্যও বটে), কারণ আমি ভেবেছিলাম যে যতক্ষণ না খাবার তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ এই সব পুরানো জিনিস দেখে

আরও বেশী ক্ষুধার মুখে যাব ; কিন্তু আপনার দয়াতে যে অভাবনীয় সুযোগ পেয়ে গেছি তাতে আমার ক্ষুধাও মেটাব আর আপনাকেও সন্তুষ্ট করব। তিনি আমার জবাবে খুশী হলেন, আর হেসে বললেন যে আপনাকে তৃপ্ত করবার আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এর পর কায়দামাফিক ভাবে আর প্রাচুর্যের মধ্যে খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হল। খাবারে অজস্র রকমের বন্য আর গৃহপালিত পশু আর পাখীর মাংসের সঙ্গে কড়া গন্ধের ভিনি-গারে বানান শশা, মুলো, লেবু, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদির আচার ছিল। এগুলিতে ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়, আর খাওয়া অনেকক্ষণ ধরে চালিয়ে যাওয়া যায়। আমি অবশ্য এত আধিক্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়া হয়ে গেলে অনেক রকম মিষ্টান্ন এল। এগুলি যদিও পোর্তুগীজ মিষ্টান্ন, যা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, তার মতন ভাল নয়, তাহলেও বেশ ভাল। তারপর এল নানা রকমের শুকনো ফল। এগুলি সুদূর পারস্য বা নিকটবর্তী কাশ্মীর থেকে আসে। এদেশের লোকে এগুলি খাবারের পরে খায়।

তিন ঘণ্টা পরে শ্রান্ত হয়ে উঠলাম.আর এই ভোজ এদেশে যাকে মেহমানি বলে তা শেষ হল। তারপর আমি সেই ধ্বংসাবশেষ গুলি দেখব ঠিক করলাম। মিরজা বললেন যে তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন। তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেই বিরাট প্রাচীর দেখালেন। তিনি বললেন যে তার বেড় ছয় ক্রোশ বা আমাদের মাপে দু লীগ। এই প্রাচীরগুলি কুড়ি মিটার উঁচু আর সাড়ে সাত মিটার চওড়া। এই শক্তি-শালী দুর্গ শুধু মজবুত ইঁটের তৈরি, তাই দু একটি চূড়া বাদে একেবারে আস্ত আছে। এর মধ্যে বাঙালী পাদশা বা বাঙ্গালার সম্রাটের প্রাসাদগুলি ছাড়া কয়েকটি বাগানও আছে। তাদের মধ্যে বড় বড় সুন্দর জলাধার এইগুলি তখন শুকনো ছিল। তাই এগুলি যে বড় বড় সুন্দর চৌকো পাথরের তৈরি আর অনেক খরচ করে বানানো তা বোঝা যাচ্ছিল। জলাধারের পাথরের দেয়ালের মধ্যে মধ্যে কুলুঙ্গিতে দেবতার মূর্তি, আর তার চারিদিকে পাথরের উপর ফুল পাতার নকশা। এদের মিথ্যা শাস্ত্রের মতে এইগুলিই এদের দেবতাদের থাকবার জায়গা।

এই সব পুরানো জিনিস দেখা হয়ে গেলে মিরজা আমাকে কয়েকটা কুঠরি দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেগুলির কোন বিশেষত্ব ছিল না, শুধু এক তাদের গভীরতা বাদে। এ গুলির তলায় পথ মতন দেখা যাচ্ছিল যেন মাটির তলায় অন্য কোন কুঠরিতে গেছে। মিরজা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ফিরিঙ্গি মহাশয়, (Sir Frangui), ঐ গুলির জন্যই আমি এই ভেঙ্গে পড়া বাড়ির মধ্যে বাস করছি।" তিনি বললেন যে মাস তিনেক আগে একজন মেষপালক একটা ভেড়া হারিয়ে ফেলে এইখানে সেটা খুঁজতে এসেছিল। এই সব ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে ভেড়াটাকে দেখবার জন্য একটা দেয়ালের উপর উঠেছিল। দেয়ালটা বর্ষায় বেশ ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই সেই দেয়ালের একটা গর্তে সে তিনটি তামার পাত্র দেখতে পায়। কিন্তু সে গুলি দেয়ালের গায়ে এত শক্ত করে বসান ছিল যে সে সেগুলোকে নড়াতে পারেনি। এগুলি যে আসলে কি তা সে আন্দাজ করে নিয়েছিল, তাই সে ভেড়া খোঁজা ছেড়ে দিল আর ভাবল যে ভাগ্য তাকে মেষ পালক থেকে বড়লোক বানাতে চায়।

তার মনে আর তখন শান্তি ছিলনা, আর সে নানা রকম কথা ভাবছিল। তারপর সে তার বাবার কাছে গিয়ে তার আবিষ্কারের কথা বলল। গভীর রাত্রে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে তারা দুজনে শাবল ইত্যাদি দিয়ে সেই তিনটি বন্ধ তামার পাত্র দেয়াল থেকে বার করল। তার মধ্যে দুটি পাত্র এত ভারি ছিল যে তারা দুজনে সেটি তুলতে পারল না। তাই তারা একটা বাঁকের খোজে গেল। বাঁক দিয়ে দুজন লোক একটা ভারী জিনিস বইতে পারে। এটা একটা শক্ত বেত যাকে বাঙালীরা বাঁশ [Bansa] বলে আর পোতুর্গীজরা বলে ব্যাম্বু। এই কাজের জন্য যে বাঁশ ব্যবহার হয়, তা একজন মানুষের পায়ের মতন মোটা। এই বাঁশ আর একটা মোটা দড়ির সাহায্যে তারা দুবারে সেই পাত্র দুটিকে নিয়ে গেল ছোটটি তারা আগেই নিয়ে গিয়েছিল। ঘরের দরজা বন্ধ করে বাপ ছেলেতে তাদের কৌতুহল মেটাতে আরম্ভ করল। প্রথমে তারা বড় পাত্রটিকে খুলল। তাতে শুধু সোনার টাকা বা টঙ্কা [tangas] ভরা ছিল। সোনার এক টঙ্কা তেরটি রূপার মুদ্রার সমান। এত ধনের রাশি দেখে সেই সরল চাষীরা এত অভিভূত হয়ে গেল যে তারা আর ছোট পাত্রটি খুলে দেখল না, যেন এতেই তাদের ঔদাসীন্য এসে গেছে। বোধ হয় তারা ভেবেছিল যে ছোট পাত্রটিতেও ঐ একই জিনিস আছে। কিম্বা হয়তো দরিদ্র থেকে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়ে তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল আর তাদের বিচার শক্তি কমে গিয়েছিল। তাই এত ধন তারা কি করে ভোগ করবে ঠিক করতে না পেরে তারা ভাবল যে ঢাকার নবাব যিনি এই অঞ্চলের ভাইসরয় তাঁকে খবরটা দেবে। আগেই বলেছি যে সেই সময় ভাইসরয় ছিলেন মহামুঘলের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শাহসুজা। তাঁর দরবার আর থাকবার জায়গা ছিল এখানে থেকে কয়েক দিনের পথ [প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার] রাজমহলে। তাই সেই ঐশ্বর্য মাটিতে পুঁতে রেখে বাপ রাজমহল গেল আর ছেলে সেই খানেই পাহারা দেবার জন্য রইল। রাজমহল পৌঁছে প্রথম কয়েকদিন সে রাজপুত্রের দেখা পেল না। তারপর তার ভাগ্য গুনে রাজপুত্র একদিন দামী···আর উৎসবের পোশাক পরে শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সেটা একটা আনন্দের দিন। সেদিন তিনি সম্রাটের দরবার থেকে খবর পেয়েছিলেন যে তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে। মেয়েটি দরবারের একজন বড় ওমরাহ্'র [পারস্য রাজবংশের মিরজা রুস্তম সফাভি] মেয়ে। রাজপুত্র একে খুব ভালবাসতেন। এই সময় সেই লোকটি কথা বলবার সুযোগ পেয়ে রাজপুত্রকে সেই ধন আবিষ্কারের খবর দিল। ঠিক এই সময় এই খবর পেয়ে রাজপুত্র এটাকে একটা সুলক্ষণ বলে ধরলেন। তিনি ভাবলেন যে তাঁর বিবাহিত জীবন সুখময় হবে। রাজপুত্রদের কাছাকাছি খোশামোদে লোকেদের অভাব নেই। তারা সুযোগ মত কথা বলে। তারা সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল যে এই দুই ঘটনার সংযোগ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে আরও ধন আবিষ্কার হবে। রাজপুত্র খুশী হয়ে হাসিমুখে সেই গাঁয়ের লোকটির সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বললেন। তিনি তাকে পুরস্কার আর সম্মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করলেন, তার পর হুকুম দিলেন যে তাকে তখনই একটা খেলাত দেওয়া হ'ক। তারপর মির্জা কাছাকাছি

ছিলেন বলে তাঁকে হুকুম দেওয়া হল যে তিনি যেন কিছু সৈন্য আর চারটি কোসা নিয়ে তখনই রওনা হন। যেমন আগেই বলেছি কোসাগুলি যুদ্ধের নৌকা। এগুলি খুব দ্রুতগামী আর গঙ্গার দুই ধার পাহারা দেবার জন্য ব্যবহার হয়। এই হুকুম পেয়ে মির্জা সেই গ্রামের মেষপালকের সঙ্গে ছোট একটি গ্রামে এসে পৌঁছলেন। গ্রামে মাত্র পনর বা কুড়িটা কুঁড়েঘর হবে। মেষপালক তখন পোশাকে একেবারে দরবারী হয়ে গেছে।

এখানে পৌঁছে সে নিজের বাড়িতে ঢোকবার আগে পাড়াগেঁয়ে কায়দায় ছেলেকে চেঁচিয়ে ডাকল। পোশাক যত তাড়াতাড়ি বদলান যায়, স্বভাব তত তাড়াতাড়ি বদলায় না। তার ছেলে বাপের গলা চিনতে পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু হঠাৎ বাপকে দরবারী পোশাকে দেখে কাছে আসতে সাহস করল না, আর একেবারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতে সবাই খুব মজা পেল।

শেষ কালে বাপ গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তারা মাটি থেকে পাত্র গুলি তুলে মির্জার হাতে দিয়ে দিল। তিনি আর সেগুলি পরীক্ষা না করে সকলের সামনে সীল করে দিলেন; আর তারপর সেগুলি পাঠিয়ে দিয়ে বাপ আর ছেলেকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। ওদের নিয়ে যাবার হুকুম ছিল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে মির্জা বেশ খুশী ছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা রাজমহলের বন্দরে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা বন্দুকের আওয়াজ করে সেলাম জানালেন যাতে লোক জড় হয়ে যায়, আর তাঁদের পৌঁছবার খবর সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়। তারপর তাঁরা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রাজপুত্রের প্রাসাদে পৌঁছে পাত্রগুলির ভার দিয়ে দিলেন। নবাব সীল মোহর গুলি দেখে মির্জাকে জিজ্ঞাসা করলেন এর মধ্যে কি আছে। মির্জা বললেন যে রাজপুত্রের দেখার আগে তাঁর এগুলি পরীক্ষা করে দেখবার সাহস হয়নি। তিনি তখন বড় দুটি পাত্রকে তখনই খোলালেন। গাঁয়ের লোকটি যা বলেছিল সে কথা সব সত্য দেখে তিনি নিঃসন্দেহে খুব খুশী হয়েছিলেন, তবে রাজকীয় গাম্ভীর্যে তাঁর এই আনন্দ লুকান ছিল। যখন পাত্র দুটিকে একটা কার্পেটের উপর খালি করা হ'ল, তখন তাইতে দুটি ছোট স্তূপ তৈরি হয়ে গেল। সকলেই সেই গ্রামের লোক দুটির সরলতা দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল যে ছোট পাত্রটি খুব দামী মণি মুক্তায় ভরা। আলোতে ধরে দেখা গেল যে প্রত্যেকটি মণি তার নিজের জাতের মধ্যে সব চেয়ে ভাল। কতগুলি আবার মাপে এত বড় যে অনেক অভিজ্ঞ জহুরী এগুলি দেখে অবাক হয়ে গেল। তবে মণি গুলির দাম সম্বন্ধে জহুরীদের এত বিভিন্ন মত ছিল যে মিরজা আমাকে স্থির টাকার সংখ্যা বলতে রাজি হননি। কিন্তু আমার কৌতুহল দেখে তিনি শুধু তিন জন জহুরীর মত আমাকে বলেন। এরা তিনজন রাজপুত্রকে একই দাম বলেছিল। তারা বলেছিল যে তাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে এই মণি মুক্তার দাম তিন কোটি টাকা।

কিন্তু এত ধন পাওয়া সত্ত্বেও বাসনার শেষ হল না, কারণ মানুষের বাসনা কখন ধনে সন্তুষ্ট হয় না, আর এখানেতো এই কথা ভাববার যথেষ্ট কারণ ছিল যে যখন

এখানে এত ধন পাওয়া গেছে, তখন হয়তো আরও ধন এখানে লুকানো আছে। তাই মিরজার উপর হুকুম যে ঐ জায়গায় সবটা খুঁড়ে দেখতে, যেন কোন গুপ্তধন পড়ে না থাকে।

মিরজা বললেন, "এই জন্যই আমরা এই সব গর্ত খোঁড়াচ্ছি। আর যারা এই সব গর্ত খুঁড়ছে সেই হতভাগা মজুরদের ঘাম, আর যাদের ঘর থেকে ধরে এনে এই কাজে লাগান হয়েছে তাদের বিরক্তি ছাড়া আর কিছু এখন অবধি পাওয়া যায়নি।"

এই কথা বলে সেই মাননীয় ভদ্রলোক তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। আমি তখন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের নৌকাতে ফিরে এলাম।

তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে সে রাত্রে আমরা সেখানেই রইলাম। পরদিন ভোরে বেরিয়ে আমরা চতুর্থ দিনে রাজমোল [Rajamol] শহরে, বা হিন্দুস্থানী উচ্চারণে যাকে রাজমহল [Rajmehell] বলে সেখানে পৌছলাম।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে লেখক নিজের যাত্রার আর রাজমহল শহরে ও তার পরে পাটনা অবধি কি ঘটল তার বর্ণনা করেছেন। [অক্টোবর-নভেম্বর ১৬৪০]

গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ল যে কাল সব জিনিসকে গ্রাস করে।...

আমাদের যাত্রা তখনও শেষ হয়নি, তাই আমরা চলতে থাকলাম। রাজমহল অবধি নদীর স্রোতে কেবল বড় বড় ঘূর্ণি ছিল বলে আমাদের নৌকার মুখ কেবল ঘুরে যাচ্ছিল। রাজমহলের বন্দরে আমরা এক সঙ্গে দু হাজারের উপর নৌকা দেখলাম। সেখানে নবাব রাজপুত্রের দরবার ছিল বলে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে নৌকাগুলি এখানে এসে জড় হয়েছিল। এই সব নৌকার ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আমরা চবুতরা বা কাস্টম আফিসে পৌছলাম। এখানে সব নবাগত নৌকার নাম খাতায় লেখাতে হয়, আর নৌকাগুলি পরীক্ষা করা হয়। আমাদের পালা আসা অবধি আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হল, তারপর তারা আমাদের বিনা শুল্কেই শহরে ঢোকবার অনুমতি দিল। শহরটি গঙ্গার ধারে এক লীগ বিস্তৃত। আর এই পুরো এক লীগে নৌকার এত ভীড় যে ছোট একটা বাঁধার জায়গা পাওয়াও শক্ত। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে দিয়েও বহু ছোট ছোট নৌকা আর ডিঙ্গি [Dingues] এমন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন তারা শহরের কোন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে। এই সব ডিঙ্গি ইত্যাদিতে লোকে শহরে যে সব জিনিস পাওয়া যায় তাই বিক্রি করে বেড়ায়। মনে হয় যেন জলের উপর আর একটি শহর। নৌকাগুলিতে অনেক রকম খাবার জিনিস পাওয়া যায়, আর সেগুলি খুব সস্তা। আমি ভেবেছিলাম যে পৌছবার দুদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু নবাবের চবুতরা বা কাস্টমের চৌকি থেকে

এত রকম বাধা পেতে লাগলাম যে আমাকে নয় দিন এখানে থাকতে হল। তারপর যখন পাওনা চুকিয়ে আর পাসপোর্ট, যা ছাড়া এই বন্দর থেকে যাওয়া যায় না, পেয়ে এই অসংখ্য কেরাণীদের হাত থেকে রেহাই পেলাম তখন মনে হল যে একটা বড় কাজ সারলাম।

অবশেষে এই শহরের ছটা কাস্টম অফিসের ভিতর দিয়ে গিয়ে আর চোদ্দ রিয়াল মাশুল দিয়ে আমরা আবার এই বিরাট নদী বেয়ে রওনা হলাম আর পয়কীন [Poyquin] গাঁ যেটা মুঙ্গেরের নবাবের এলাকার প্রথম গাঁ সেইখানে পৌছলাম।…

[মানরিকের বাঙ্গালা দেশের ভিতর দিয়ে যাত্রার কাহিনী এখানেই শেষ হল। এর পর তিনি আগ্রা, লাহোর পারস্য ইত্যাদি হয়ে তাঁর দেশে ফেরার কথা বলেছেন।]

[সম্রাট শাহজাহান কয়েকটি কারণে তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে পোর্তুগীজদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাজ্য লাভের পাঁচ বছর পরে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর একজন সেনাপতি কাসিম খানকে পোর্তুগীজদের হুগলির বসতি ধ্বংস করতে আদেশ দেন। মানরিক নিজে সেই সময় আরাকানে ছিলেন। ভ্রমণ কাহিনীর শেষে মানরিক, হুগলি ধ্বংসের আর সেখানকার পোর্তুগীজ অধিবাসীদের নিগ্রহের যে বিবরণ শুনেছিলেন, তার বর্ণনা করেছেন। মানরিকের নিজের ধারণা যে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা একজন সম্ভ্রান্ত মুঘল মহিলাকে আরাকানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই শাহজাহানের পোর্তুগীজদের উপর রাগ ফেটে পড়ে। সেই মহিলার সঙ্গে মানরিকের দেখা হয় ও তাঁকে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে আনতে সমর্থ হন। এই অংশটুকুর অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।]

অশীতিতম পরিচ্ছেদ

এর আগের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর রাজপুত্র খুর্রম (Corrombo) নিজের সৌভাগ্যের বলে তাঁর পিতার সিংহাসন অধিকার করলেন, আর মুঘল সাম্রাজ্যের মুকুট পরে পাদশা (বা আমরা যাকে সম্রাট বলব) হয়ে একছত্র অধিপতি হয়ে গেলেন। (১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর হুকুম দেন যে তাঁকে পাদশা বলে ডাকা হবে। তার আগে মুঘল রাজাদের অর্থাৎ তৈমুরের বংশধরদের, মিরজা বলা হত।) ভাইদের ও আর এক ভাইপোর বিরুদ্ধতা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন, তবে তিনি এত নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে তখনই তাঁর পূর্বেকার শপথ মত হুগলি শহর ধ্বংস করেন। তাই কয়েকবছর নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। যে সব কর্তারা হুগলির শাসক ছিলেন তাঁরা যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে চলতেন তাহলে হয়তো আরও কয়েক বছর এমনিই কেটে যেত। এঁদের উচিত ছিল যে তাঁর সম্রাট হওয়া মাত্র একজন প্রতিনিধিকে ভাল একটি আদিয়া বা উপহার নিয়ে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান ও তার বশ্যতা স্বীকার করা। কিন্তু এই সব ভদ্রলোকেরা শুধু নিজেদের টাকা ছাড়া আর অন্য কিছুর কথা ভাবতেন না। তাই তাঁরা ঠিক সেই রকম ব্যবহার করলেন যা পাড়াগেঁয়ে লোকটি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে করেছিল (কোন প্রচলিত গল্প হবে)। এই সব ভদ্রলোকেরা ভাবলেন বুঝি বা সম্রাট

নিজেই এসে এঁদের হাতে চুমা খেতে বাধ্য হবেন। তাই তাঁরা কয়েকজন পাদরির এই বিষয়ে উপদেশ কানে তুললেন না। কয়েকজন অভিজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমান যাদের সঙ্গে এঁদের ব্যবসার সম্পর্ক ছিল তাদের কথাও শুনলেন না। তাই সম্রাটকে এই প্রয়োজনীয় সম্মান জানান আর হয়ে উঠল না। এ ছাড়া সম্রাটের কাছে এই নালিশও পেঁীছেছিল যে হুগলির পোর্তুগীজরা ডিয়াঙ্গার পোর্তুগীজ যারা তাঁর শত্রু মগরাজার চাকরি করে তাদের সঙ্গেও খোলাখুলি ভাবে ব্যবসা করে। এদের ব্যবস্থা ছিল যে মগেরা তাদের জেলিয়াতে করে হুগলিতে এসে তাদের দেশে যে সব জিনিস পাওয়া যায়না তা নৌকাতে তুলে নেবে আর তারা যে সব লোকদের বন্দী করেছে তাদের নাবিয়ে দেবে। শুধু বিদেশী পোর্তুগীজ নয়, হুগলির দেশী লোকেরাও এই সব বন্দীদের দাস হিসাবে কিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে চালান করত। এই আর অন্য কয়েকটি কারণে সম্রাট তাঁর শ্বশুর নবাব আসফ খানকে হুকুম দেন যে তিনি যেন ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়কে লেখেন যে ভাইসরয় যেন হুগলির পোর্তুগীজদের শাস্তি দেন। কিন্তু ভাইসরয় এদের কিছুই করতে পারতেন না, কারণ হুগলি তাঁর শাসনাধীনে ছিলনা (হুগলি কে পোর্তুগীজ ইণ্ডিয়ার মধ্যে ধরা হত না। ভাইসরয়ের নিযুক্ত কোন শাসক সেখানে থাকতেন না।) ভাইসরয় তাই চিঠি পেয়ে জবাব দিলেন যে এই সব পোর্তুগীজরা তাঁর রাজার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিদেশে বাস করছে। তাই এদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

এই সব নানা কারণে বাঙ্গালার পোর্তুগীজদের উপর সম্রাটের বিরক্তি বেড়ে গেল। তবে তাঁর শ্বশুর আসফ খান পোর্তুগীজদের ভালবাসতেন। তিনি তাই ব্যাপারটাকে কোন রকমে সামলিয়ে রাখতেন। কিন্তু ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে নিয়তির বিধানে এক ঘটনা ঘটল। সে বছর দিগো দা সা নামে একজন পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন কিছু মগ আর কিছু পোর্তুগীজ জেলিয়ার একটি নৌবাহিনী নিয়ে আঙ্গারকেল (Angarcale) বন্দর থেকে এক অভিযানে বেরোল। আমি তখন ডিয়াঙ্গাতে ছিলাম। যুবকটি খুব সাহসী ছিল। তাই সে সাবধান হবার চেষ্টা না করে, দুঃসাহস আর বাহাদুরী দেখাবার লোভে সাধারণ বিবেচনার সীমা ছাড়িয়ে প্রধান শহর ঢাকা থেকে কয়েক লীগ দূরে একটা বড় গাঁকে আক্রমণ করল। এত আগে অবধি কখনও শত্রু জাহাজ আসেনি, তাই এখানকার লোকেরা এই ব্যাপারে একেবারে নিঃশঙ্ক থাকত।

কিন্তু সংসারের অন্য ব্যাপারে যেমন, তেমনি নিরাপত্তার ব্যাপারেও কোন নিশ্চিন্ততা নেই। তাই তারা যখন কোন রকম আশঙ্কার মধ্যেই নেই, ঠিক সেই সময় এই শত্রু জেলিয়ারা তাদের হঠাৎ আক্রমণ করল। জেলিয়ার লোকেরা রাশি রাশি লুটের মাল জোগাড় করল। এই লুটের মধ্যে একজন বড়ঘরের সুন্দরী মুঘল মহিলাও ছিলেন। তিনি তার মেয়ে আর শাশুড়ীর সঙ্গে একটা ঢাকা গাড়ীতে কয়েকজন ঘোড়-সওয়ার আর চাকরের সঙ্গে নিরাপদ জায়গার খোঁজে পালাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন পোর্তুগীজ সৈন্য তাঁদের দেখতে পায়, আর জেলিয়াতে নিয়ে আসে। তাঁদের বন্দীদশার সময় করুণাময় পিতা এই ইচ্ছা করেছিলেন যে তাঁরা খ্রীষ্টান হবেন ও তাই সেই নারকীয় শত্রুর (শয়তানের) মুষ্টি থেকে নিজেদের আত্মাকে মুক্ত করবেন।

শত্রুর সম্পত্তি দিয়ে পোর্তুগীজ নৌকা গুলি এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে ঢাকার নৌবাহিনীর নজরে আসবার আগেই তারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে এল। তারা নৌকা সাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে, তাদের যত বন্দুক ছিল সব কটি দিয়ে শব্দ করতে করতে এল, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তারা খুব দামী লুট নিয়ে ফিরছে। এবারে যেহেতু তারা বিশেষ ভাবে লুট এনেছিল তাই তারা খুব আনন্দ আর উৎসব করতে করতে নৌকা থেকে নামল। বিজয়ীরা লুটের খুশীতে এক দিকে দিয়ে নাবল আর বন্দী আর দাসেরা কাঁদতে কাঁদতে অন্য দিক দিয়ে নামল। তার পর সব লুটের জিনিস, বিশেষ করে ঐ মুঘল মহিলাদের প্রদর্শন করা হল। এঁরা নিজেদের হঠাৎ অবস্থা বদলে যাবার দুঃখ চেপে রাখতে পারছিলেন না। এই দেখে সকলের মনেই করুণার উদ্রেক হল। একজন ক্যাপ্টেন তো সুন্দরী মহিলাটিকে দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তাঁদের কষ্ট দূর করবার জন্য যথা সম্ভব করতে লাগল। সে তাঁদের খুব খাতির করে নিজের এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু এই যুবকের হৃদয় তখন কামদেবের বাণ খেয়ে একেবারে হারিয়ে গেছে, তবে কিন্তু তার মনে কোন সংযম ছিল না, তাই সে তার বন্ধুর সাহায্য পাবে ভেবে সেই রাত্রেই মহিলাটির কাছে গেল। কিন্তু যখন সে জোর করে তাই আদায় করতে চাইল যা যুক্তির অগম্য তখন সে সেই অসভ্য (অখ্রীষ্টান অর্থে) মুঘল মহিলার কাছে সেই ব্যবহার পেল যা সভ্য রোমান মহিলার কাছে টারকিন [Tarquin, শেক্সপিয়ারের Rape of Lucrece] পায়নি। রোমান মহিলা বেইজ্জতের পর আত্মহত্যা করেছিলেন, আর এই মহিলা বললেন যে বেইজ্জতের আগে যেন তাঁকে মেরে ফেলা হয়। তারপর যখন তিনি দেখলেন যে আর বাধা দেওয়া তাঁর শক্তিতে কুলোবে না তখন তিনি তাঁর লম্পট প্রেমিককে বললেন যে তিনি স্বেচ্ছায় তার লালসা পূর্ণ করবেন। এই বলে তার জীভ নিজের দাঁতের মধ্যে নিয়ে তিনি তার অর্দ্ধেকটা কেটে নিলেন। তাইতে সেই অসৎ যুবকের কাম বাসনা নিভে গেল, আর তিনিও তার হাত থেকে ছাড়ান পেলেন। আর যদিও তাঁকে তখন প্রাণ-দণ্ডের জন্য পাঠান হল, কিন্তু পবিত্র চিন্তার স্বর্গীয় প্রেমিক তাঁকে এমন অদ্ভুত ভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। সেই দুষ্কর্মকারীর জীভ কেটে নেওয়াতে এত রক্ত পড়ছিল যে কেউ তা থামাতে পারছিল না। তাই (তার মৃত্যু আসন্ন জেনে) তাকে কনফেস করাবার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি মাঝ রাত্রে ডেকে পাঠান হল। আমি যখন ব্যস্ত হয়ে সেখানে যাচ্ছি তখন সমুদ্রের ধারে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না-তে কয়েকজন লোককে রাস্তা থেকে একটু দূরে হেঁটে যেতে দেখলাম। তাদের মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ পেয়ে আমি আর আমার সঙ্গে যারা ছিল সেইদিকে গেলাম। আমিকে দেখতে পেয়ে তারা তাদের বন্দীকে ছেড়ে এক পাশে সরে গেল যাতে আমি তাদের চিনতে না পারি। তখন সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যাঁর হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা ছিল আমার দিকে এলেন। আমি দেখলাম যে তিনি একজন মেয়ে। তিনি কে জিজ্ঞাসা করাতে চোখের জলের জন্য তিনি কোন জবাব দিতে পারলেন না। আমার সঙ্গীরা তাঁর হয়ে আমাকে উত্তর দিল। এই শুনে আমি তাঁর হাতের বাঁধন খুলিয়ে দিলাম

আর তাঁকে সামান্ত কিছু সান্ত্বনার কথা বললাম। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অগুজিল (ম্যাজিস্ট্রেট) যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁর সঙ্গে সেই মহিলাকে প্রথম যে বাড়ি পেলাম তাতে ছেড়ে গেলাম। তারপর আমি কনফেসন নিতে গেলাম। আহত লোকটি তখন অনেক ভাল ছিল, আর আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। তাই পাছে কথা বললে তার ক্ষতি হয় তাই আমি তখনই তার কনফেসন না নিয়ে পরে আসব বলে চলে এলাম। তারপর আমি সেই মুঘল মহিলাকে যেখানে ছেড়ে এসেছিলাম সেখানে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর জন্ম তারা যে কার্পেট দিয়েছিল আমি তাঁকে তার উপর উঠে বসতে বললাম, আর তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু তিনি খুব ঘাবড়িয়ে ছিলেন, আর নিজের ভাবনা ভোলবার জন্ম তাঁর শ্বাশুড়ী আর মেয়ের কি হয়েছে তাই জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে তাঁরা বেশ ভাল আছেন, ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি তাঁদের তাঁর কাছে আনিয়ে দেব। তাঁরা সবাই একসঙ্গে সসম্মানে থাকতে পারবেন। তিনি তখন আমাকে তাঁর বন্দী হবার ঘটনা আর তিনি কে তাই বললেন। তিনি বললেন যে তাঁর পিতা মিরজা হাজারী, অর্থাৎ যার মানে আমি আগেই বলেছি হাজার ঘোড় সওয়ারের নেতা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল এক-জন মিরজার সঙ্গে যিনি দু হাজার সওয়ারের নেতা। যেখানে পোর্তুগীজরা তাঁকে বন্দী করে সেই জায়গা তাঁর স্বামীর এলাকাভুক্ত। সেখানে তিনি ঢাকা থেকে মাত্র দশদিন আগে এসেছিলেন। তিনি ঢাকাতেই থাকতেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মিরজাকে সম্রাটের বড় ছেলে রাজকুমার দারাশিকোহ ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই সেখানে যাবার আগে তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর শ্বাশুড়ীর কাছে থাকতে পাঠিয়ে দেন। কাঁদতে কাঁদতে এই সব দুঃখের কথা বলতে বলতে সেই মহিলা শোকে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি দুর্বলতার জন্ম মূর্ছিত হয়েছেন ভেবে আমি খানিকটা নির্যাস (essence) আনতে দিলাম। এটা আমাকে একজন পাঠিয়েছিল। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে যখন এটা তাঁকে একটু খেতে বললাম তিনি খেতে রাজি হলেন না। আমি তখন শপথ করে বললাম যে এতে শুয়োরের কোন অংশ নেই। এ দেশের অনেক মুসলমানেব বিশ্বাস যে খ্রীষ্টানদের সব খাবারে শুয়োরের মাংস যা মুসলমানদের নিষিদ্ধ তাই মেশান থাকে।

পরদিন আমি একজন বৃদ্ধ আর বিচক্ষণ পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বললাম। ইনি এখানে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে নিয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে ভগবানের নামে অনুরোধ করলাম যে তিনি যেন এই তিন জনকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দেন। তিনি সহজেই রাজি হয়ে যাওয়াতে আমি দুটো পালকি আনিয়ে তাঁদের ক্যাপ্টেনের বাড়ি পৌছে দিলাম। এই সব প্রাথমিক কাজ হয়ে গেলে আমি কয়েকবার গিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিলাম। আমি তাঁদের বোঝালাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটেনা। ঈশ্বর তাঁদের বাড়ি আর দেশ থেকে এই জন্ম নিয়ে আসতে দিয়েছেন যাতে এই ভাবে তাঁদের আত্মা সেটন্ বা তাঁরা যাকে শয়তান বলেন তার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাঁদের প্রফেটের কথায় বিশ্বাস করে তাঁরা এই শয়তানের হাতে পড়েছিলেন। সেই

মহিলারা কোন রকমে সহ্য করে এই সব কথা শুনতেন। বিশেষতঃ সেই বৃদ্ধা যিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন তাঁর এই সব কথা অসহ্য লাগত। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন বলে আর যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন বলে আমি তাঁদের মুক্তির পথে আনার কাজ ঈশ্বরের করুণার হাতে ছেড়ে দিলাম। অন্য খ্রীস্টান মহিলারাও তাঁদের কঠিন হৃদয়কে নরম করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এই সময় ছোট মেয়েটি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা আর ঠাকুমার ইচ্ছা ছিল যে সে যেন মুসলমান থেকেই মরে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে সে বাপ্টাইজ হয়ে আর খ্রীষ্টান হয়ে মরবে যাতে সে স্বর্গীয় পতির চিরসঙ্গ লাভ করতে পারে। তাঁর কাছেই সে তার মা আর ঠাকুরমার জন্য প্রার্থনা করেছিল, তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরাও খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন।

এর পর অবশ্য সেই সুন্দরী মহিলার প্রেমিকের অভাব হলনা তাদের মধ্যে একজন বীর পোর্তুগীজ যুবক এই সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করে সে সান্তারেনের [Santaren, লিসবন থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে] বড় ঘরের ছেলে। এই ঘটনা সেই মহিলার স্বামী আর পিতা এমন করুণ ভাবে সম্রাটের কাছে বর্ণনা করেন যে তিনি তখনই ঢাকার নবাব বাহাদুর খানকে হুকুম পাঠান যে বাঙ্গালা দেশে যত সৈন্য আছে সব দিয়ে আক্রমণ করে যেন হুগলি শহর ধ্বংস করা হয়।

[সমাপ্ত]

ফা-হিয়েন

[Fa-hien, Fa-hsien, নতুন বানান Fa-xian]

চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। তাঁর ভারতবর্ষে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলিতে ভিক্ষুরা যে সব নিয়ম কানুন মেনে চলেন সেই নিয়মগুলি ও সূত্রগুলি সংগ্রহ করা। উত্তর পশ্চিম ভারতে এই নিয়মগুলির লিখিত রূপ পাওয়া যেত না। ফা-হিয়েন তাই মধ্য দেশে এসে সংস্কৃত শিখে, সূত্রগুলির নকল করে নেন। এই কাজে তিনি দু বছর তাম্রলিপ্তিতেও ছিলেন। সেখান থেকে তিনি জাহাজে করে সিংহল দ্বীপ ও সেখান থেকে যবদ্বীপ [জাভা] হয়ে দেশে ফিরে যান। ফা-হিয়েন যখন দেশে ফেরেন তখন তাঁর বয়স ৭৯ বছর। তিনি যখন উত্তর ভারতে ছিলেন তখন সেখানে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর রাজত্ব। ফা-হিয়েন কিন্তু তাঁর বিবরণে সম্রাটের নাম একবারও করেন নি।

ফা-হিয়েনের ভারত বিবরণের চীনে ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ অনেক বার করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে লি-ইউং-শি [Li-yung-hsi] চীনের বৌদ্ধ অ্যাশো-সিয়েশনের তরফ থেকে যে অনুবাদ করেছিলেন তার তাম্রলিপ্তি অংশ টুকুর বাঙ্গালা অনুবাদ এই :

তাম্রলিপ্তি

[পাটলিপুত্র] থেকে ১৮ যোজন [এক যোজন প্রায় ১২ কিলোমিটার] গঙ্গা বরাবর পূব দিকে গেলে, নদীর দক্ষিণ তীরে চম্পা [বর্তমান ভাগলপুর] নামক মহান দেশ। বুদ্ধ যেখানে থাকতেন, আর যেখানে তিনি হাঁটতেন, আর যে সব জায়গায় আগের চারজন বুদ্ধ বসতেন সেই সব জায়গায় স্তূপ বানান হয়েছে। সেখানে ভিক্ষুরা থাকেন।

পঞ্চাশ যোজন পূব দিকে গিয়ে ফা-হিয়েন সমুদ্রের ধারে অবস্থিত তাম্রলিপ্তি দেশে পৌছন। এখানে ২৪টি বিহার আছে। সব কটিতেই ভিক্ষুরা থাকেন। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের বেশ ভাল অবস্থা। ফা-হিয়েন এখানে দু বছর থেকে, সূত্রগুলির নকল করে, আর বুদ্ধের প্রতিমাগুলির চিত্র বানিয়ে নিয়ে, একটি বড় সওদাগরী জাহাজে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র যাত্রা করেন। শীতকালের গোড়ার দিকের অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে জাহাজটি ১৪ দিনেই সিংহের দেশ সিংহলে পৌছে যায়।

[ফা-হিয়েন বাঙ্গালা দেশের আর কোন জায়গার বিবরণ দেননি।]

[সমাপ্ত]

হিউয়েন ৎসাঙ

(জন্ম ৬০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ৬৬৮ খ্রীঃ)

[Hiuen Tsang, Yuen chwang, Hsuan-tsang,
নতুন বানান Xuan Zang]

চীনের বৌদ্ধযাত্রী হিউয়েন ৎসাঙ ভারতবর্ষে আসেন বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে তাঁর সমস্যাগুলির উত্তর জানতে এবং এই দেশ থেকে প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করতে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে যাত্রা আরম্ভ করে, তিনি গান্ধার দেশ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পথেই চীনে ফিরে যান। এই প্রায় ১৩ বছর এই দেশে থাকা কালীন, প্রায় দু বছর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। বাকি এগার বছরের কিছু বেশি সময় তিনি ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ভ্রমণ করেন। হিউয়েন ৎসাঙের বিবরণ ভ্রমণ কাহিনীর মত লেখা নয়। ভারতবর্ষের যে সব জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন সেই সব জায়গাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি আলাদা আলাদা করে দিয়েছেন। বাঙ্গালাদেশে তিনি চারটি জায়গায় এসেছিলেন, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণ-সুবর্ণ। বর্তমান লেখাটি সেই চার জায়গার বিবরণের অনুবাদ। গত শতাব্দীতে স্যামুয়েল বীল হিউয়েন ৎসাঙের ভারত বিবরণের চীনে ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ তাঁর *Buddhist Records of the Western World* গ্রন্থে করেছিলেন। তাই থেকে এই বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয়েছে। হিউয়েন ৎসাঙ কোন বছর কোন প্রদেশে গিয়েছিলেন তা জানা নেই। কানিংহাম তাঁর *Ancient Geography of India* তে তারিখগুলি আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছেন। এই লেখাতে সেই তারিখগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। সেই সময় বাঙ্গালা দেশের সব চেয়ে বড় রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল কর্ণ-সুবর্ণ। হিউয়েন ৎসাঙ এখানে আসবার কিছু আগেই তিনি মারা যান। উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় রাজা তখন কনৌজের হর্ষবর্ধন।

পুণ্ড্রবর্ধন

(১৫ই জানুয়ারী ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

[বগুড়া শহরের ১০ কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থান গড়ের ঢিপির নীচে পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।]

এই দেশের পরিধি প্রায় ৪,০০০ লি। রাজধানীর পরিধি হবে ৩০ লি। [৩০ লি মানে প্রায় ১০ মাইল বা ১৬ কিলোমিটার।] জায়গাটি জনবহুল। পুষ্করিণী, সরকারী অফিস আর ফুলে ভরা বনভূমি এখানে জায়গায় জায়গায় অবস্থিত। [মূলে এই বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট নয়।] এখানকার জমি সমতল আর দো-আঁশলা। আর সব রকম শস্য এখানে প্রচুর হয়। পনস ফলের এ দেশে খুব কদর, আর এই ফল ফলেও অনেক। পনস কুমড়োর মত বড়। পাকলে এর রং হয় হলুদে-লাল। ভাঙ্গলে এর মধ্যে পায়রার ডিমের মত বড় ফল বেরোয়। সেগুলি ভাঙলে হলুদে-লাল রঙের অতি সুস্বাদু রস বেরোয়। কখনো এই ফল গাছের ডাল থেকে অন্য ফলের গুচ্ছের মত ঝুলে থাকে, আর কখনো

বা এগুলি গাছে শিকড়ের কাছে জন্মায়, ভূমিতে উৎপন্ন ফু-লিংগের [বোধ হয় কোন চীনা ফল বা উদ্ভিদ] মত। এখানকার অবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। লোকে বিদ্যানুরাগী। এখানে প্রায় কুড়িটি সংঘারাম আছে। তাতে প্রায় ৩,০০০ সাধু থাকেন। তাঁরা হীনযান আর মহাযান দুয়েরই চর্চা করেন। প্রায় শ খানেক দেব মন্দির আছে। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হয়। সব চেয়ে বেশী সংখ্যা হ'ল নগ্ন নিগ্রন্থদের [দিগম্বর জৈন]।

রাজধানীর প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে পো-চি-পো সংঘারাম। এর অঙ্গনগুলি প্রশস্ত আর এ গুলিতে খুব আলো হাওয়া। এর মণ্ডপ আর ঘরগুলি বেশ উঁচু। সাধুর সংখ্যা এখানে প্রায় ৭০০। এঁরা মহাযান ধর্মের চর্চা করেন। পূর্ব ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ সাধু এখানে বাস করেন।

এর কাছেই অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ আছে। পুরাকালে, এই জায়গায় তথাগত দেবতাদের লাভার্থে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে, পর্বদিনে এখানে চারিদিকে উজ্জল আলো দেখা যায়।

এর পাশেই একটি জায়গায় অতীত কালের চারজন বুদ্ধ ব্যায়ামের জন্য হাঁটতেন ও পরে বসতেন। তাঁদের স্মরণ চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

কাছেই একটি বিহারে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্তি আছে। এঁর দিব্য দৃষ্টিতে কোন ব্যাপারই লুকানো নেই, আর এঁর দৈবজ্ঞান নির্ভুল। তাই কাছে বা দূরের লোকে উপবাস আর পূজা করে আর এখানে নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ করতে আসে।

পূর্বদিকে চারশ কিলোমিটারের কিছু বেশি গেলে, বড় নদীটি পেরোলে কামরূপ দেশ।

কামরূপ থেকে ৬৫০ কিলোমিটার আন্দাজ দক্ষিণে সমতট রাজ্য

সমতট

(২০ শে ফেব্রুয়ারী, ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

[পূর্ববঙ্গ। কানিংহামের মতে সমতট বা পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল যশোর]

এই দেশের পরিধি প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার। দেশের এক ধারে সমুদ্র। এখানকার জমি নীচু আর উর্বর। রাজধানীর পরিধি প্রায় ১০ কিলোমিটার। এখানে নিয়মিত চায বাস হয়। প্রচুর শস্য আর ফলফুল এখানে সর্বত্র জন্মায়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, আর লোকেদের স্বভাব ভদ্র। এখানকার মানুষ পরিশ্রমী, লম্বায় কম, আর এদের গায়ের রঙ কালো। এরা বিদ্যানুরাগী, আর বিদ্যালাভ করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে। সত্য আর মিথ্যা দুই সিদ্ধান্তেরই লোক এখানে থাকে। তিরিশটির কাছাকাছি সংঘারাম আছে, তাতে ২,০০০ সাধু থাকেন। এঁরা সকলেই স্থবির

সম্প্রদায়ের। শ খানেক দেব মন্দির আছে। তাতে অনেক (অবৌদ্ধ) সম্প্রদায়ের লোক থাকেন। নিগ্রর্ন্থ নামে নগ্ন সন্ন্যাসীরাই (দিগম্বর জৈন) সবচেয়ে বেশি।

নগর থেকে অনতিদূরে অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ আছে। প্রাচীন কালে তথাগত এখানে সাত দিন দেবতাদের লাভার্থে তাঁর গভীর ও রহস্যময় ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এর পাশেই চারজন বুদ্ধের বসবার আর হাঁটবার চিহ্ন আছে।

অনতিদূরে একটি সংঘারামে বুদ্ধের একটি নীল স্ফটিকের মূর্তি আছে। এটি প্রায় আড়াই মিটার উঁচু, আর বুদ্ধের (মহাপুরুষ) লক্ষণ এতে স্পষ্ট দেখা যায়। মূর্তিটি মাঝে মাঝে তার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে।

তাম্রলিপ্তি

(১০ই এপ্রিল ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

সমতট থেকে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ। দেশের পরিধি প্রায় ৭০০ কিলোমিটার আর রাজধানীর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। দেশটি সমুদ্রের ধারে। জমি এখানে নীচু আর উর্বর। নিয়মিত চাষ হয়, আর প্রচুর ফুল আর ফল জন্মায়। আবহাওয়া গরম। লোকেরা চটপটে আর ব্যস্তবাগীশ। পুরুষেরা পরিশ্রমী আর সাহসী। (বৌদ্ধধর্মে) বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী দুই সম্প্রদায়েরই লোক এখানে থাকে। দশটি আন্দাজ সংঘারামে প্রায় ১,০০০ সাধু থাকেন। দেব মন্দিরের সংখ্যা ৫০টি হবে। সেগুলিতে অনেক সম্প্রদায়ের লোক মিলে মিশে থাকে। সমুদ্র থেকে একটি উপসাগর এই দেশে প্রবেশ করেছে, যেন স্থল আর জল আলিঙ্গন করছে। বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিস আর রত্ন এখানে একত্র করা হয়, সাধারণতঃ তাই এখানকার লোকেরা বেশ ধনী।

নগরের পাশেই অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ আছে। তার কাছেই পুরাকালের চারজন বুদ্ধের বসবার আর হাঁটবার চিহ্ন।

এখান থেকে ৩৫০ কিলোমিটার আন্দাজ উত্তর-পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ দেশ।

কর্ণসুবর্ণ

(২০ শে এপ্রিল ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)

[শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি]

এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ৭০০ কিলোমিটার, আর রাজধানীর পরিধি প্রায় ১০ কিলোমিটার। নগরটি জনবহুল আর গৃহস্থরা বিত্তশালী। জমি নীচু আর দোআঁশলা। নিয়মিত চাষ হয় আর প্রচুর ফুল আর অনেক রকম মূল্যবান ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। লোকেরা সৎ আর ভদ্র। এরা অত্যধিক বিদ্যানুরাগী আর খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে (বৌদ্ধধর্মে) বিশ্বাসী আর বিধর্মী দু রকম লোকই আছে। এখানে প্রায় দশটি সংঘারাম আছে আর তাতে প্রায় ২,০০০ সাধু থাকেন। এঁরা হীনযান ধর্মের সম্মতীয় সম্প্রদায়ের লোক। পঞ্চাশটি দেব মন্দির

আছে। এখানে বিধর্মীদের সংখ্যা খুব বেশি এ ছাড়া এখানে এমন তিনটি সংঘারাম আছে যেখানে দেবদত্তর নিষেধানুযায়ী গাঢ় করা দুধ (ক্ষীর ? দই ? মাখন ? দেবদত্ত নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের মাখন খেতে নিষেধ করেছিলেন।) ব্যবহার করা হয় না।

রাজধানীর পাশেই রক্তমৃত্তিকা সংঘারাম। এর হলঘরগুলি প্রশস্ত আর আলো হাওয়া যুক্ত। বহুতল অট্টালিকাগুলি (towers) খুব উঁচু। এই সংস্থাতে রাজ্যের সব চেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান আর প্রসিদ্ধ লোকেরা একত্রিত হন। তাঁরা পরস্পরকে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়ে উন্নত হতে আর চরিত্র উৎকৃষ্ট করতে সাহায্য করেন। আগে এদেশের লোকে বুদ্ধের ধর্মে বিশ্বাস ক'রত না। সেই সময় দক্ষিণ ভারতে একজন বিধর্মী ছিলেন। তিনি তাঁর পেটের উপর তামার থালা আর মাথায় একটি জলন্ত মশাল বেঁধে রাখতেন। একবার সদম্ভে পা ফেলে, লাঠি হাতে এদেশে আসেন। ঢাক বাজিয়ে তিনি প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার পেটের আর মাথার উপর এইগুলি কী ?" তিনি বলেন, "আমার জ্ঞান এত বেশি যে আমার পেট ফেটে যেতে পারে। আর পৃথিবীর যাবতীয় লোক অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকে বলে তারা আমার অনুকম্পার পাত্র ; তাদের আলো দেবার জন্য আমি মাথায় এই আলো নিয়ে ঘুরে বেড়াই।"

দশ দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার মত কোন লোক রইল না। দেশের সমস্ত বিদ্বান পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার যোগ্য একজনকেও পাওয়া গেল না। রাজা বললেন, "হায়, আমার রাজ্যে শুধু অজ্ঞানের অন্ধকার। এই বিদেশীর কঠিন পূর্বপক্ষের উত্তর দিতে পারে এমন একজনও নাই। দেশের কি লজ্জা ! এর একটা কিছু উপায় বার করতে হবে। হয়তো কোন অজ্ঞাত জায়গায় কেউ আছেন তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে।"

তখন একজন লোক তাঁকে বলল যে বনের মধ্যে একজন বিদেশী থাকেন। তিনি বলেন যে তাঁর নাম শ্রমণ। তিনি মন দিয়ে বিদ্যাচর্চা করেন। বহুদিন হল তিনি মৌন থেকে লোকচক্ষুর বাইরে বাস করছেন। সেই তপস্বী ছাড়া এই ধর্মহীন লোকটিকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এই কথা শুনে রাজা নিজেই তাঁকে ডেকে আনতে গেলেন। শ্রমণ বললেন, "আমি দক্ষিণ ভারতের লোক। পথ চলতে আমি কিছুদিনের জন্য এখানে রয়েছি। আমার যোগ্যতা অতি সাধারণ আর তুচ্ছ। আমার মনে হয় আপনি এ কথা জানেন না। আপনি যখন আজ্ঞা করছেন তখন আমি যাব, যদিও কী বিষয়ে আলোচনা হবে তা আমি কিছুই জানি না। আমি যদি পরাজিত না হই তাহলে আমি আপনাকে একটি সংঘারাম বানাতে অনুরোধ করব। সেখানে বুদ্ধের ধর্মের মহিমা প্রকাশ করবার জন্য সাধুদের আমন্ত্রণ করতে হবে।" রাজা বললেন, "আমি আপনার সর্ত স্বীকার করছি। আপনার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।"

শ্রমণ তখন রাজার আমন্ত্রণ স্বীকার করে তর্ক যুদ্ধের জায়গায় গেলেন। বিধর্মী (পণ্ডিত) প্রায় ৩০,০০০ শব্দে নিজের সম্প্রদায়ের মতবাদ কীর্তন করলেন। তাঁর তর্ক

ছিল গভীর, দৃষ্টান্তগুলি ছিল পর্যাপ্ত, তাঁর সমস্ত প্রবচনটিই ছিল উৎকৃষ্ট ও মনোহর।

সবটা শোনার পর শ্রমণ তৎক্ষণাৎ তার অর্থের গভীরে পৌঁছে গেলেন। কোন শব্দে বা তর্কে তাঁর বিভ্রম হল না। কয়েকশত শব্দেই তিনি সেই পণ্ডিতের বক্তব্যের বিশ্লেষণ করে ফেলে তাঁর সব কঠিন প্রশ্নেরই সমাধান করে ফেললেন। তারপর তিনি সেই পণ্ডিতকে তাঁর (অর্থাৎ সেই পণ্ডিতের) ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। উত্তর দিতে গিয়ে বিধর্মী ঘাবড়ে গেলেন, উলটো পালটা কথা বলতে লাগলেন। তাঁর যুক্তি সারহীন হয়ে গিয়ে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। এই ভাবে তিনি তাঁর খ্যাতি হারিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন।

রাজা শ্রমণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই মঠ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তখন থেকে (বৌদ্ধ) ধর্ম এখানে প্রসারিত হয়েছে।

সংঘারামের পাশে, অদূরে, অশোক রাজার বানানো একটি স্তূপ আছে। তথাগত যখন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন তখন তিনি সাতদিন এখানে ধর্মোপদেশ দেন। এর পাশে একটি বিহার আছে। চারজন অতীত বুদ্ধের হাঁটবার আর বসবার চিহ্ন এখানে আছে। এ ছাড়া, বুদ্ধ যেখানে তাঁর ধর্ম লোকেদের বুঝিয়ে দেন সেই সব জায়গাতেও কয়েকটি স্তূপ আছে। এগুলি সব অশোক রাজার তৈরি।

উড্র দেশ এখান থেকে ৩৫০ কিলোমিটার আন্দাজ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

[সমাপ্ত]

ইব্‌নে বত্তূতা

ইব্‌নে বত্তূতার জন্ম হয় মরোক্কোর ট্যানজিয়র শহরে, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইব্‌নে বত্তূতার অর্থ হল বত্তূতা বংশের ছেলে। তাঁর আসল নাম আবদাল্লার পুত্র মহম্মদ। ২১ বছর বয়সে তিনি মক্কাতে তীর্থ করবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সব দেশ ঘুরে তিনি দিল্লীতে আসেন। এখানে কয়েক বছর বাস করে তিনি চীন দেশে যান। পথে মালদিভে কিছুদিন কাটান। মালদিভ থেকে চীন যাবার পথে তিনি কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালা দেশে আসেন। বাঙ্গালা দেশে আসার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আসামে একজন প্রসিদ্ধ সাধুকে দর্শন করা। তারপর তিনি আবার জাহাজে করে চীন দেশের জন্য রওনা হন।

ইব্‌নে বত্তূতা এই সব দেশে ভ্রমণ করেছিলেন প্রধানতঃ তীর্থযাত্রা আর প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সন্তদের দর্শন করবার জন্য। তাই তাঁর লেখার মধ্যে এঁদের কথাই বেশি। দেশগুলি সম্বন্ধে খুব একটা বিস্তারিত বিবরণ নেই। আর এই কাজে তিনি সেই সময়কার প্রায় সব মুসলমান রাজাদের শাসিত দেশে গিয়েছিলেন। তাই ইব্‌নে বত্তূতা কে বলা হয় ইসলামের যাত্রী (Traveller of Islam)।

ইব্‌নে বত্তূতা যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন সেখানে সুলতান মহম্মদ তুগলুকের রাজত্ব। সুলতান তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য পুরস্কার হিসাবে দিল্লীর একটি কাজির পদ তাঁকে দেন। প্রায় সাত বছর ইব্‌নে বত্তূতা এই পদে ছিলেন। তিনি যখন বাঙ্গালা দেশে আসেন তখন এখানে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ'র (১৩৩৭-১৩৫৯ খ্রীঃ)

ইব্‌নে বত্তূতার যাত্রার কাহিনী আরবী ভাষায় লেখা। তাঁর কাহিনীর ভারতবর্ষ অংশটুকু সৈয়দ অতহর অব্বাস রিজবী তাঁর "তুগলুক কালীন ভারত" পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করেন। বর্তমান অনুবাদ রিজবী সাহেবের অনুবাদ থেকে করা। এতে শুধু বাঙ্গালাদেশের বিবরণটুকু আছে।

বঙ্গালা [বাঙ্গালা]

বাঙ্গালা একটি বিশাল দেশ, আর এখানে ধান হয় প্রচুর। আমিতো পৃথিবীতে এতো সস্তা দেশ কোথাও দেখিনি। তবে এ দেশে কুয়াশা হয় বড্ড বেশি। আর খোরাসানীরা (বিদেশীরা) এ দেশকে বলে দোজখে-পুর-নেমত (উত্তম বস্তুতে পরিপূর্ণ নরক)। আমি বাঙ্গালা দেশের গলিতে দেখেছি যে এক রৌপ্য দিনারে (এক রৌপ্য তঙ্কার), দিল্লীর ২৫ রতল (দিল্লীর এক রতল, অর্থাৎ দিল্লীর একমণ প্রায় ১৩ কিলোগ্রাম) চাল বিক্রী হচ্ছে। রূপার এক দিনার আট দিরহমের সমান। হিন্দুস্থানের এক দিরহম এক রূপার দিরহমের সমান। দিল্লীর এক রতল মগরিবের (মরোক্কোর) ২০ রতলের সমান। আমি বাঙ্গালাদেশের লোকেদের বলতে শুনেছি যে সে বছর জিনিস পত্রের দাম বড় বেশি। মরোক্কো দেশের মহম্মদ মসমূদী একজন বড় সাধু ছিলেন। তিনি দিল্লীতে আমার বাড়ীর কাছে থাকতেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে বহুদিন বাস করেছিলেন। তিনি

একবার আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নিজের ও স্ত্রী ও চাকরের বছরকার ভোজন সামগ্রী আট দিরহমে, অর্থাৎ এক দিনারে, কিনে নিতেন। তিনি বলতেন যে সে সময় আট দিরহমে ৮০ রতল ধান পাওয়া যেত। কোটা হলে তার থেকে ৫০ রতল চাল পাওয়া যেত। দুগ্ধবতী মোষ পাওয়া যেত তিন রৌপ্য দিনারে। ওখানে মোষই গরুর কাজ দেয়। আমি ও দেশে এক দিরহমে আটটি ভাল, মোটা মুর্গী বিক্রী হতে দেখেছি। আর পায়রার বাচ্চা পাওয়া যেত এক দিরহমে ১৫টি। মোটা ভেড়া পাওয়া যেত দু দিরহমে, আর এক রতল চিনি পাওয়া যেত চার দিরহমে। রতল বললে দিল্লীর রতল বুঝতে হবে। এক রতল গোলাপ জল পাওয়া যেত আট দিরহমে। এক রতল ঘিয়ের দাম ছিল চার দিরহম আর এক রতল মিষ্টি তেলের (তিলের তেল) দু দিরহম। ৩০ গজ মিহি সুতী কাপড় দু দিনারে পাওয়া যেত। সুন্দরী দাসীর দাম ছিল এক সোনার দিনার অর্থাৎ মরোক্কোর আড়াই সোনার দিনার। আমি এই দামে আশূরা নামে একটি অতীব সুন্দরী দাসী কিনে ছিলাম। আমার এক সাথী লূলু নামে এক তরুণ দাসকে দুই সোনার দিনারে কিনেছিল।

বাঙ্গালার যে শহরে আমরা প্রবেশ করি তার নাম সুদকাবাঁ (সপ্তগ্রাম ? চাটগাঁ ?)। বিশাল সমুদ্র তীরে অবস্থিত এই শহরটি বেশ ভব্য। হিন্দুরা যেখানে তীর্থযাত্রা করে সেই গঙ্গা নদী আর জুন নদী (ব্রহ্মপুত্র ? জমুনা ?) এখানে মিলিত হয় আর তারপর এক সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। গঙ্গা নদীতে অনেক জাহাজ। এই সব জাহাজ করে তারা লখনৌতীর লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

বাঙ্গালার সুলতান

এর নাম সুলতান ফখরুদ্দীন। লোকে এঁকে ফখরা বলে। ইনি খুব যোগ্য শাসক। বিদেশীরা এঁর খুব প্রিয়। ফকীর আর সূফী [সাধুদের] ইনি খুব শ্রদ্ধা করেন। বাঙ্গালার রাজ্য প্রথমে গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের অধীন ছিল। তাঁর ছেলে মুইজুদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। তখন নাসিরুদ্দীন নিজের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অভিযান করেন। গঙ্গা নদীর ধারে দুজনের দেখা হয়। এই ঘটনাকে কিরাউস্-সাদৈন গ্রন্থে "দুই নক্ষত্রের মিলন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই কথার চর্চাও আগে হয়েছে যে নাসিরুদ্দীন নিজের ছেলের জন্য দিল্লীর রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গালায় ফিরে আসেন আর মৃত্যু অবধি এইখানেই থাকেন।

তারপর তাঁর ছেলে শামসুদ্দীন সিংহাসনে বসেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শিহাবুদ্দীন সুলতান হন। কিছুদিন পরে তাঁর ভাই গয়াসুদ্দীন বাহাদুর বূর (ভূরা) তাঁকে হটিয়ে দিয়ে সুলতান হন। শিহাবুদ্দীন তখন সুলতান গয়াসুদ্দীন তুগলুকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর সাহায্যে তিনি বাহাদুর বূরকে বন্দী করতে সমর্থ হন। গয়াসুদ্দীনের ছেলে মুহম্মদ সুলতান হবার পর তাঁকে মুক্ত করে দেন, তিনি সুলতান মুহম্মদকে কথা দেন যে রাজ্য তাঁরা ভাগাভাগি করে নেবেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে পর সুলতান মুহম্মদ তাঁকে আক্রমণ করে বধ করেন আর নিজের শালাকে এই

রাজ্য দেন। কিন্তু তাঁর সৈন্তরা তাঁকে বধ করে। অলী তখন লখনৌতীতে ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার রাজ্য অধিকার করে নেন। ফখরুদ্দীন নাসিরুদ্দীনের বংশের হিতৈষী ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে রাজ্য সেই বংশের হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তিনি সুদকাবাঁ আর বাঙ্গালার অন্যান্য জায়গায় বিদ্রোহ করলেন ও এই সব জায়গায় নিজেদের অধিকার দৃঢ় করে ফেললেন। শীতকালে বর্ষার জন্ত যখন সব কাদায় ভরে আছে ফখরুদ্দীন তখন তাঁর নৌবহর নিয়ে আক্রমণ করেন। অলী শাহের স্থলসৈন্ত বেশি শক্তিশালী ছিল বলে তিনি শুখার সময় আক্রমণ করেন।

কাহিনী

সুলতান ফখরুদ্দীন ফকীরদের খুব মান্য করতেন। তাই তিনি ফকীর শৈদা বলে একজনকে সুদকাবাঁতে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। ফখরুদ্দীন যখন অন্য এক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন শৈদা তখন বিদ্রোহ করেন আর ফখরুদ্দীনের ছেলেকে হত্যা করেন। তাঁর আর ঐ ছাড়া কোন ছেলে ছিল না। সংবাদ পেয়ে তিনি রাজধানীতে ফেরত আসেন। শৈদা ও তাঁর সঙ্গীরা তখন সুনুর কাবাঁতে (সোনার গাঁ) পালিয়ে যান। সুলতান জায়গাটিকে ঘিরে ফেলবার জন্য সৈন্যদল পাঠান। সেখানকার লোকেরা তখন নিজেদের প্রাণের ভয়ে শৈদাকে বন্দী করে সুলতানের সৈন্যদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সুলতানকে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি আদেশ দেন যে বিদ্রোহীর মাথা যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতএব তাঁর মাথা কেটে পাঠানো হয়। ওঁর জন্য বহু ফকীরের প্রাণ যায়। আমি সুদকাবাঁ পৌঁছে সুলতানের সঙ্গে দেখা করিনি। তিনি হিন্দুস্থানের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আমি তাই ভাবলাম যে দেখা করার ফল ভাল হবেনা।

কামরূ (কামরূপ)

সুদকাবাঁ থেকে আমি কামরূ (কামরূপ) পর্বতের দিকে রওনা হই। ঐ জায়গা প্রায় এক মাসের পথ। কামরূ পর্বত অতি বিশাল আর চীন থেকে থুব্বত (তিব্বত), যেথানে কস্তুরী মৃগ পাওয়া যায়, সেখান অবধি বিস্তৃত। এখানকার লোকেরা তুর্কীদের সমান আর খুব পরিশ্রমী এ দেশের একজন দাস অন্ত দেশের বেশ কয়েকজন দাসের চেয়ে বেশি কাজ করে। এখানকার লোকে জাদুটোনার জন্তও প্রসিদ্ধ। শেখ জালালুদ্দীন তবরেজী নামে একজন ওয়ালী (সাধু) সেখানে বাস করতেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত যাচ্ছিলাম। [প্রসিদ্ধ সাধু শাহ জালাল তুর্কীস্তান থেকে তাঁর ৩১৩ জন অনুরক্তের সঙ্গে ভারতে আসেন, ও অন্ত কিছু মুসলিম সৈন্তদের সাহায্যে সিলহেটে হিন্দুরাজাকে ১৩০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত করে এই থানেই বাস করেন। এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে তিনি বোধহয় প্রথম ও সর্বপ্রধান।]

শেখ জালালুদ্দীন

শেখ একজন খুব বড় ওয়ালি (সাধু) আর অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক বড় বড় কাজ করেছিলেন, আর এই সব কেরামতির জন্য তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখি উনি তখন বেশ বৃদ্ধ। উনি আমাকে বলেছিলেন উনি বাগদাদে খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ আব্বাসী কে স্বচক্ষে দেখেছিলেন আর তাঁর হত্যার সময় তিনি বাগদাদেই ছিলেন। [ইনি আব্বাসী বংশের শেষ খলীফা ছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হলাকু এঁকে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করেন।] পরে ওঁর সহচরেরা আমাকে বলেছিল যে শেখের মৃত্যু ১৫০ বছর বয়সে হয়। উনি প্রায় ৪০ বছর রোজা রেখেছিলেন, আর অনেক সময় দশ দিন অবধি রোজা ভাঙতেন না। ওঁর কাছে একটি গরু ছিল। তার দুধ পান করে উনি রোজা ভাঙতেন। উনি সারারাত নামাজ পড়তেন। উনি রোগা পাতলা গড়নের লোক ছিলেন, আর ওঁর দাড়ি ছিল খুব ছোট। এই পর্বতের মুসলমানেরা এঁরই কাছে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাই উনি এঁদেরই কাছে থাকতেন।

ওঁর এক কেরামতি

ওঁর কিছু শিষ্য আমাকে বলেছিলেন যে মৃত্যুর একদিন আগে উনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে বলেন, "ঈশ্বর যদি চান, তাহলে আমি কাল তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আমি তোমাদের আল্লাহকে—যিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই—সমর্পণ করছি। জুহরে নামাজের অন্তিম সিজদার সময় তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। ওঁর গুহার কাছে একটি খোঁড়া কবর দেখতে পাওয়া গেল। কবরের মধ্যে একটি কফন আর কিছু সুগন্ধি বস্তু ছিল। অতএব শেখের শবকে স্নান করিয়ে কফন (শব বস্ত্র) ধারণ করানো হ'ল আর নমাজ পড়ে তাঁকে দফন করে দেওয়া হ'ল। ঈশ্বর যেন ওঁকে দয়া করেন।

শেখের অন্য একটি কেরামতি

আমি যখন শেখের নিবাসস্থান থেকে দুদিনের পথ দূরে আছি তখন তাঁর চারজন শিষ্য আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। তারা আমাকে বলে যে শেখ বলেছেন, "এক ব্যক্তি মগরিব থেকে তোমাদের কাছে আসছেন। তোমরা গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা কর।" ওরা আমাকে বলে যে ওরা শেখের আদেশ অনুসারে আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। শেখ আমার বিষয় আগে কিছুই জানতেন না। উনি সব কিছুই দৈবী প্রেরণার দ্বারা জ্ঞাত হয়েছিলেন। আমি ওদের সঙ্গে তাঁর গুহার বাইরে স্থিত খানকাহতে (মঠে) পৌঁছলাম। তার কাছাকাছি কোন বসতি ছিল না। নিকটবর্তী হিন্দু-মুসলমান সকলেই শেখের দর্শনের জন্ম আসতেন আর উপহার আনতেন। সেই সব খাবার ফকীর আর যাত্রীরা আহার করত। শেখ কিন্তু শুধু নিজের গরুর দুধ খেতেন আর যেমন আগেই বলা হয়েছে সেই গরুর দুধেই নিজের দশদিন অবধি রাখা রোজা ভাঙতেন।

আমি যখন সেখানে উপস্থিত হলাম তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অলিঙ্গন করলেন। আর আমার দেশ আর যাত্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি তাঁকে সব কিছু বললাম। শেষ আমাকে বললেন, "তুই আরব দেশের যাত্রী।" ওঁর একজন শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল, "সৈয়দনা (হে স্বামী) এ আরব আর আজমের (আরব ছাড়া অন্য দেশের) যাত্রী।" শেখ বললেন, "আজমের ও তাহলে এর আদর যত্ন কর।" তখন তারা আমাকে মঠের মধ্যে নিয়ে গেল, আর তিন দিন আমাকে যত্ন করে রাখল।

তাঁর কেরামতির একটি অদ্ভুত কাহিনী

আমার সঙ্গে যেদিন শেখের দেখা হয় সেদিন তিনি ছাগলের লোমের তৈরি একটি চোগা পরেছিলেন, চোগাটি আমার খুব ভাল লাগে। আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে শেখ যদি চোগাটি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে বড় ভাল হয়। আমি যখন তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেছি তিনি এক কোনে গিয়ে চোগাটি ছেড়ে আমাকে পরিয়ে দিলেন। উনি নিজের টুপিও আমাকে দিয়ে দিলেন, আর নিজে তালি দেওয়া একটি কাপড় পরে নিলেন। ফকীররা আমাকে বলেছিল যে শেখ সাধারণতঃ চোগা পরতেন না। এটা তিনি আমি আসবার সময় পরেছিলেন, আর বলেছিলেন, "মগরিবী (মরোক্কো নিবাসী) এই চোগাটি পাবার ইচ্ছা করবে। একজন কাফির বাদশাহ ওর কাছ থেকে এটি কেড়ে নেবে আর আমার ভাই বুরহানুদ্দীন সাগরজীকে (সমর কন্দে সাগর্জ নামক স্থানের নিবাসী) দিয়ে দেবে। তারই জন্য এটি তৈরী করানো হয়েছে।" ফকীররা যখন আমাকে এই কথা বলে তখন আমি স্থির করি যে শেখের এই বস্ত্র আমার পক্ষে মহা-মূল্যবান বস্তু। আমি এটা পরে কোন মুসলমান বা কাফির বাদশাহর কাছে কখনও যাবনা। তারপর আমি শেখের কাছ থেকে চলে আসি।

অনেক দিন পরে যখন আমি চীন দেশে যাই, তখন সেখানে খঁসা (হাঙ্গ চৌফু) নগরে অত্যন্ত ভীড়ের জন্য একদিন আমার সাথীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সেই সময় আমি ঐ চোগা পরেছিলাম। এক জায়গায় আমার সঙ্গে উজিরের দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিজনরাও ছিল। আমাকে দেখে তিনি আমার হাত ধরে অনেক-জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। কথা বলতে বলতে আমরা রাজভবনের দ্বারে পৌছই। আমি বিদায় নেবার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি না দিয়ে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যান। বাদশাহ আমাকে মুসলমান সুলতানদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিই। এই সময় তাঁর দৃষ্টি আমার চোগাটির উপর পড়ে, আর তিনি চোগাটির খুব তারিফ করেন। উজির আমাকে চোগাটি খুলে দিতে বলেন, আর আমি সে কথা মেনে নিতে বাধ্য হই। বাদশাহ চোগাটি নিয়ে আদেশ দেন যে আমাকে দশটি খেলাত, সাজসরঞ্জাম শুদ্ধ একটি ঘোড়া আর খরচের জন্য টাকা দেওয়া হোক। আমার খুব দুঃখ হ'ল, আর শেখের কথা স্মরণ করে খুব আশ্চর্য লাগল।

পরের বছর আমি চীন সম্রাটের রাজভবন খান বালিক (পিকিং) গেলাম। তার-পর আমি সাগরজের শেখ বুরহানুদ্দীনের মঠে গেলাম। দেখলাম যে তিনি সেই চোগা পরে একটি বই পড়েছেন। আমি চোগাটিতে হাত দিয়ে উলটে পালটে দেখলাম। শেখ বললেন, "উলটে পালটে কী দেখছিস? তুই কি এটা চিনিস?" আমি বললাম, "হ্যা, এই চোগাটিই খংসার বাদশাহ আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন।" শেখ বললেন "চোগাটি আমার ভাই জালালুদ্দীন আমার জন্য তৈরি করিয়েছিলেন, আর আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে এটি আমি অমুক ব্যক্তির মারফত পাব।" শেখ আমাকে চিঠিটি দেখালেন। চিঠিটি পড়ে আমার শেখের আধ্যাত্মিক শক্তি দেখে অবাক লাগল। আমি তারপর সব কথা শেখ বুরহানুদ্দীনকে বললাম। উনি বললেন, "আমার ভাই জালালুদ্দীন অনেক আশ্চর্য ব্যাপার করতে পারতেন। উনি পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারতেন, তবে এখন তিনি মারা গেছেন। ঈশ্বর তাঁকে দয়া করুন।" বুরহানুদ্দীন আবার বললেন, "আমি জানি তিনি ভোরের নমাজ মক্কায় পড়তেন, আর প্রতি বছর হজ করতেন। অর্ফে (জিলহিজ্জার মাসের নবম দিন) আর ঈদের দিন তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেন, আর কেউ কিছু জানতে পারতো না।"

আমি আবার নিজের কথা আরম্ভ করছি। শেখ জালালুদ্দীনের কাছে বিদায় নিয়ে হবংকের (হবংগ টিলা, শ্রীহট্ট জেলার হবীগঞ্জের কাছে) দিকে রওনা হলাম। এটি একটি সুন্দর শহর। একটি নদী শহরটির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। কামরু পাহাড় থেকে নদীটি বেরিয়েছে। এর নাম নহরুল অজরক (নীল নদী)। এই নদী পথে লোকে বাঙ্গালা আর লখনৌতী যেতে পারে। নদীর দু পাশে জল তোলবার চরকী, বাগান আর গ্রাম। ঠিক মিশরে নীল নদের মত। হবংকের নিবাসীরা কাফির জিম্মি। এদের কাছ থেকে উৎপাদনের অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয়। এদের কিছু অন্য সেবাও করতে হয়। এই নদীর স্রোত বরাবর আমরা ১৫ দিন চলি। পথে দুধারে গ্রাম আর বাগান। মনে হচ্ছিল আমরা যেন বাজারের মধ্যে দিয়ে চলেছি। নদীতে অসংখ্য নৌকা। প্রতি নৌকাতে একটি করে নাকাড়া থাকে। যখন দুটি নৌকা কাছাকাছি আসে তখন নাকাড়া বাজান হয়। এই ভাবে মাঝিরা একে অন্যকে অভিবাদন করে। সুলতান ফখরুদ্দীনের আদেশ এই যে এই নদীতে ফকীরদের কাছ থেকে কোন কর নেওয়া হবে না, আর যে ফকীরের কাছে খাবার নেই তাঁকে খাবার দেওয়া হবে। কোন ফকীর যখন এই শহরে আসেন তখন তাঁকে আধ দিনার দেওয়া হয়। পনর দিন চলে আমরা সুনর কার্বা (সোনার গাঁ) পৌঁছলাম। শৈদা ফকীর যখন এখানে শরণ নিয়েছিলেন তখন এখানকার লোকেরাই তাঁকে বন্দী করেছিল। এখানে পৌঁছতেই আমরা একটি জুন্‌ক (চীনে জাহাজ) পেয়ে গেলাম। সেটা জাভা (সুমাত্রা) যাবার জন্য তৈরি ছিল। সেই দেশ এখান থেকে ৪০ দিনের পথ। আমরা জুন্‌কে উঠে পড়লাম আর ১৫ দিন চলে বরহনাকারে পৌঁছলাম।

[সমাপ্ত]

পঞ্চদশ শতাব্দীর চীন দেশের সরকারী কাগজ পত্রে বাঙ্গালা দেশের বিবরণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুলতানদের রাজত্বকালে বাঙ্গালা ও চীন দেশের মধ্যে কয়েক-বার দূত বিনিময় হয়। বাঙ্গালা দেশ থেকে চীন দেশে দূত পাঠান হয় ১৪০৫, ১৪০৮-৯, ১৪১২, ১৪১৪ ও ১৪৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। চীন থেকে বাঙ্গালা দেশে দূত আসেন তিন বার, ১৪০৯এর কিছু পরেই, ও তারপর ১৪:২-১৩ ও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। চীনের সরকারী কাগজ পত্রে বাঙ্গালা দেশের পাঁচটি বিবরণ লেখা হয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই বিবরণ গুলি দূতেদের রিপোর্ট থেকে সংগ্রহ করা। বিবরণগুলি থেকে বাঙ্গালা দেশের তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে তখন শেষ ইলিয়াম শাহী সুলতানদের রাজত্ব। যদুনাথ সরকার বলেছেন যে সেই সময় বাঙ্গালা দেশের কোন ইতিহাস ছিল না। বাঙ্গালা দেশের উর্বর জমিতে প্রচুর ধনোৎ-পাদন হত। সুলতানেরা বিলাস ব্যসনে সময় কাটাতেন। কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিলনা। ভরা পেটে ঘুমন্ত লোকেরা আর কী ইতিহাস বানাবে? ["No history could be made by such well-fed sleepers." *The History of Bengal*, Muslim Period, p. 114] দেড়শ বা পৌনে দুশ বছর পরে আকবর বাদশাহ যখন হুকুম দেন যে তাঁর সাম্রাজ্যের সব প্রদেশ থেকে তাদের ইতিহাস সংগ্রহ করা হ'ক, তখন বাঙ্গালা দেশ থেকে কিছু মুখ চলতি ইতিহাস আর পীরেদের মকবরার কিংবদন্তী বাদে আর খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আকবরের সময় লেখা ইতিহাসগুলি থেকে বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে জানা যায় যে ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন এই দেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল মালদা জেলার পাণ্ডুয়াতে। (গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর খবর চীন দেশে পৌঁছায় ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে।) গিয়াসুদ্দীনের পর তাঁর ছেলে সইফুদ্দীন সুলতান হ'ন। সইফুদ্দীনের পর শমশুদ্দীন ও তারপর গণেশ দনুজমর্দন দেব নাম নিয়ে রাজা হ'ন। এঁদের নাম তৎকালীন মুদ্রাতেও পাওয়া যায়। চীনে বিবরণে কিন্তু গিয়াসুদ্দীন বাদে আর কোন সুলতান বা রাজার নাম নেই। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি বহু চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ভারতে আসেন। তাঁদের ভারত সম্বন্ধে লেখা বা ভ্রমণের কোন স্মৃতি এই বিবরণ গুলি লেখবার সময় বর্তমান ছিল বলে মনে হয় না।

পাঁচটি বিবরণের প্রথম দুটির ইংরেজি অনুবাদ করেন রকহিল (Rockhill), ১৯১৫ সালে [T'oung Pao, 1915, pp, 436-44]। তৃতীয়টির অনুবাদ করেন ফিলিপ্স ১৮৯৫ সালে [*Journal of the Royal Asiatic Society*, 1895, pp, 529-33]। পাঁচটি বিবরণের এক সঙ্গে অনুবাদ করেন প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ১৯৪৫ সালে [*Visvabharati Annals*, 1945, pp, 96-134]। প্রথম বিবরণটির আর একটি অনুবাদ করেন মিল্স [J. V. G. Mills, Hakluyt Society, 1970। বর্তমান বাংলা অনুবাদ অধিকাংশই প্রবোধ চন্দ্র বাগচীর ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা।

॥ ১ ॥

মা হুয়ান

প্রথম বিবরণের নাম য়িং-ইয়াই-শেং-লন (ying yai sheng lan) এই বিবরণ লেখেন মা হুয়ান ১৪২৫ থেকে ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এতে তিনি বাঙ্গালা দেশের সাধারণ বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক সুলতানের নাম এই বিবরণে নেই। ১৪০৯ ও ১৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে চীনে রাজদূত বাঙ্গালা দেশে আসেন তাঁর নাম জানা নেই। অনুমান করা হয় যে প্রসিদ্ধ নৌ সেনাধ্যক্ষ ও কূটনীতিবিদ চেং হো ই [Cheng Ho, নতুন বানান Jeng Ho] ছিলেন এই দূত। মা হুয়ান এসেছিলেন তাঁর দোভাষী হয়ে। চেং হো ধর্মে মুসলমান ছিলেন। মনে হয় মা হুয়ান ও মুসলমান ছিলেন, কারণ চীনা লিপিতে "মহম্মদ" কে "মা" লেখা হয়। মা হুয়ানের বিবরণ এই :

"দেশটি বিশাল ও ঘন বসতি পূর্ণ। বন সম্পত্তি এখানে প্রচুর। সুমাত্রা দ্বীপ থেকে যাত্রা করে নিকোবর দ্বীপ দেখা যায়। সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে আরও কুড়ি দিন যাবার পর চাটিগাঁও [Che-ti Kiang] পৌছান যায়। এখানে ছোট নৌকা নিতে হয়, আর এই নৌকা করে ৫০০লির (২৫০ কিলোমিটার) কিছু বেশি দূরে সোনার গাঁও [So-na-eul-Kiang] হয়ে রাজধানী যেতে হয়। রাজধানী প্রাচীরে ঘেরা, তবে বাইরে শহরতলিও আছে। রাজার প্রাসাদ ও ছোট বড় ওমরাহদের বাড়ী আর মন্দির-গুলি শহরের মধ্যে। এঁরা সকলেই মুসলমান

এদেশের লোকেদের চালচলন শুদ্ধ আর সৎ। মেয়ে পুরুষ সকলেরই গায়ের রঙ কালো ; এদেশে শ্বেত বর্ণের লোক প্রায় নেই। সকলেই চুল বেঁধে (বা কেটে) রাখে আর সাদা সুতী পাগড়ী পরে। গায় লম্বা গাউনের মত পোষাক পরে। এই পোষাকের কলার গোল, আর এগুলি এম্‌-ব্রয়ডারি করা পটি দিয়ে বাঁধা। পায়ে এরা চামড়ার চটি পরে।

রাজা আর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা মুসলমানী টুপি ও পোষাক পরেন। এঁরা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকলেরই ভাষা বাঙ্গালা [P'ang-kie-li], তবে ফারসী বলেন এমন লোকও আছেন।

কেনা বেচায় এরা রূপার মুদ্রা ব্যবহার করে। এই মুদ্রার নাম টংকা [Tangka]। এর ওজন তিন ক্যাণ্ডারীন [candareen]। এগুলির ব্যাস তিন সেন্টিমিটার। মুদ্রার দু-দিকেই লেখা থাকে। এগুলি দিয়ে এরা জিনিসের ওজন অনুসারে দাম ঠিক করে। এদের একরকম সামুদ্রিক ঝিনুকও আছে। তার নাম কড়ি (K'ao-li)।

এদের বিয়ে আর শব-সৎকার মুসলমানী ধর্মের নিয়ম অনুসারে হয়।

আবহাওয়া সারা বছরই গ্রীষ্মকালের মত গরম।

এদেশে শাস্তি হল মোটা বাঁশ দিয়ে প্রহার, কিংবা নির্বাসন।

রাজকর্মচারীদের নিজস্ব সীল থাকে, আর একে অন্যকে এরা চিঠি পত্র লিখে যোগাযোগ করে। সৈন্যদের মহিনা ও রেশন দুইই দেওয়া হয়। সৈন্যদলের অধ্যক্ষের নাম সিপাহ-সালার।

এদেশে জ্যোতিষী, চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ, ও সমস্ত রকমের কুশল ও সুদক্ষ কারিগর আছে। কিছু লোক এক রকম সাদা কালো প্যাটার্ন দেওয়া জামা পরে, স্কার্ফ (scarf) দিয়ে বাঁধা। তাতে প্রবাল আর স্ফটিকের পাড় বসান। কবজিতে এরা পুঁতির ব্রেসলেট পরে। ভোজের সময় আনন্দ দেবার জন্ত ভাল গাইয়ে আর নাচিয়ে ও আছে।

এক রকম মনোরঞ্জনকারী আছে যারা প্রতিদিন ঠিক পাঁচটার সময় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী আর বড়লোকদের দরজার সামনে জড়ো হয়ে সানাই আর ঢোলক বাজায়, আর এমনি ভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। প্রাতরাশের সময় তারা বাড়ির ভিতর যায়, আর তখন তাদের মদ, খাবার আর টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনেক রকম ক্রীড়া কৌশলাদি দেখায় সে রকম লোকও আছে।

যেমন কিছু লোক আছে যারা লোহার শিকল দিয়ে বাঘ বেঁধে বাজারে বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। শিকলটা খুলে নিলে বাঘটা উঠানে শুয়ে পড়ে। খালি গায় সেই লোকটা তখন বাঘকে আঘাত করে। বাঘটা রেগে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর দুজনেই তখন মাটিতে পড়ে যায়। এই রকম সেই লোকটি কয়েকবার করে। তারপর সে নিজের হাতের মুঠো বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দেয়, তার হাতে কিন্তু কোন ঘা লাগে না। এই সব দেখাবার পর সে বাঘটাকে আবার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলে। বাড়ির লোকেরা তখন বাঘটাকে মাংস খেতে দেয়, আর লোকটিকে টাকা দেয়। বাঘ-ওয়ালাদের ব্যবসা তাই ভালই চলে।

বারো মাসে এদের এক বছর হয়, আর কোন মল-মাস নেই।

দেশী শষ্য হল, লাল জোয়ার, তিল, ডাল, আঠালো জোয়ার (glutinous millet), আর ধান। ধান বছরে দুবার হয়। শাক সব্জির মধ্যে আছে, আদা, সরষে, পেঁয়াজ, রশুন, শশা আর বেগুন। এরা নারকেল আর অন্য একটি গাছের ফল থেকে এক রকম আরক বানায়। তাছাড়া কাজং মদও বানায়। (কাজং মদ ইন্দোনেশিয়াতে বহু প্রচলিত ছিল, তবে বাঙ্গালা বা আসামে এই মদের প্রচলনের কথা জানা নেই) এরা আমাদের মত চা খায় না তার জায়গায় এরা সুপারি খায়।

গৃহপালিত জন্তু, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, গরু, ছাগল (marine goat), মুরগি, পাতিহাঁস, শুয়োর, বড় হাঁস, কুকুর আর বেড়াল।

এদের ফল হ'ল, কলা, কাঁঠাল, টক বেদানা, আখ, চিনি আর মধু।

সুতী কাপড়ের মধ্যে আছে কয়েক রঙের পি-পু; একে এরা পি-পো বলে। এগুলি তিন ফুট চওড়া আর সাতান্ন ফুট লম্বা। এগুলি মিহি আর চকচকে, মনে হয় যেন রং পেণ্ট করা। আদা-হলুদ (ginger-yellow) রঙের এক রকম সুতী কাপড় আছে। তার নাম মান-চে-তি (man-che-ti)। এগুলি চার ফুট চওড়া আর পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি লম্বা। এগুলি বেশ মজবুত আর এদের বুনন বেশ ঠাস। যাকে এরা শা-না-পা-ফু (sha-na-pa-fu) বলে সে গুলি পাঁচ ফুট চওড়া আর তিরিশ ফুটের উপর লম্বা; এগুলি পু-লো আর দেখতে শেং-লোর মত। যাকে কি-পাই-লাই-তা-লি (k'i-pai-

lei-ta-li) বলে সেগুলি তিন ফুট চওড়া আর ষাট ফুট লম্বা। এই কাপড়ের বুনন ঠাস নয়, এগুলি মোটা সুতার তৈরি এগুলি সুতী গজ (gauze)।

পাগড়ির কাপড়ের নাম সা-তা-ইউল (sha-ta-eul, চাদর ?)। এগুলি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া আর চল্লিশ ফুট লম্বা, আর আমাদের সান-সো'র [san-so] মত। মা-হাই-মা -লাই আর এক রকম কাপড়। এগুলি চার ফুট চওড়া আর চব্বিশ ফুট লম্বা ; এর উলটো দিকে আধ ইঞ্চি চওড়া পশমের পাড় (nap), আমাদের তু-লো-কিন [tu-lo-kin] এর মত। এরা রেশম বোনে, আর এম্‌ব্রয়ডারী করা রুমাল ব্যবহার করে। এদের ব্রোকেড দেওয়া তাফতাও আছে। এদের কাগজ সাদা, এগুলি এক রকম গাছের ছাল দিয়ে তৈরি, আর হরিণের চামড়ার মত মসৃণ আর চকচকে।

ঘরোয়া জিনিস পত্রের মধ্যে আছে গালার কাজ করা ছোট ও বড় বাটি, ইস্পাতের বন্দুক (Steel guns) আর কাঁচি।"

[সমাপ্ত]

॥ ২ ॥

হু-হিয়েন

দ্বিতীয় বিবরণের নাম সিং-চা-শেং-লন [Sing-ch'a-sheng-lan] ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজদূত চীন থেকে বাঙ্গালা দেশে এসেছিলেন, তাঁর নাম হু-হিয়েন [Hou-hien]। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে ফাই-সিন বলে একজন ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিবরণ লেখেন।

"অনুকূল বাতাস পেলে সুমাত্রা থেকে এই দেশে কুড়ি দিনে পৌঁছন যায়। চীনের পশ্চিমে ভারত। বাঙ্গালা তার একটি অংশ। বাঙ্গালার পশ্চিমে বজ্রাসন রাজ্য, যার নাম চাও-না-ফু-ইউল [chao-na-fu-eul, জৌনপুর ?]। এখানে শাক্য বোধি লাভ করেছিলেন। [বজ্রাসন বা গয়া তখন জৌনপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।] ত্রয়োদশ বর্ষ য়োং-লোতে (yong-lo, ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দে) সম্রাটের কাছ থেকে দুবার আদেশ পেয়ে খোজা হু-হিয়েন [eunuch Ho-hien] ও অন্যরা নৌবহর নিয়ে সেই দেশে যান। তাঁরা নিজেদের তরফ থেকে সেখানকার রাজা, রাণী আর সর্দারদের জন্য উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই দেশের একটি উপসাগরের উপর চাটি-গাঁও [ch'a-ti-kiang] বলে একটি বন্দর আছে। এখানে কিছু শুল্ক (duties) দিতে হয়। আমাদের জাহাজ পৌঁছেছে জানতে পেরে, ঐ দেশের রাজা নিজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঐ বন্দরে পাঠিয়ে দেন।

তাঁরা খেলাত (robes) আর অন্য উপহার নিয়ে এসেছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে এক হাজার সৈন্য ও ঘোড়া ছিল।

ষোলটি বিশ্রামের স্থান (stages) হয়ে আমরা সোনার গাঁও (Suo-na-eul-Kiang) পৌছলাম। এই জায়গাটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর এখানে পুকুর, রাস্তাঘাট আর বাজার আছে। বাজারে সব রকমের জিনিসের ব্যবসা হয়। রাজার চাকররা এখানে আমাদের জন্য হাতি আর ঘোড়া এনেছিল। আরও কুড়িটি বিশ্রামের স্থান পেরিয়ে আমরা পাণ্ডুয়া [Pan-tu-wa] পৌছলাম। রাজা এই খানেই বাস করেন। এই শহরের প্রাচীর সুদৃঢ় বাজারগুলি সুন্দর ভাবে সাজান, দোকানগুলি পাশাপাশি, থামগুলি সব সারিবদ্ধ। দোকানগুলি সব রকমের জিনিসে ভরা।

রাজার বাড়ি ইটের তৈরী আর সুরকি দিয়ে গাঁথা। বাড়িতে ওঠবার সিঁড়ি বেশ উঁচু আর চওড়া। হলঘর গুলির ছাদ সমতল আর ভিতর থেকে সাদা চুনকাম করা। দরজাগুলি নয় পাল্লার আর প্রত্যেকটি তিন থাক মোটা (of tripel thickness)। দরবার হলের থামগুলি পিতলের চাদর দিয়ে মোড়া আর পালিশ করা। সে গুলির উপর ফুল আর জন্তু জানোয়ারের ছবি বানানো। ডান দিকে আর বাঁ দিকে লম্বা বারান্দা আমরা যে দিন দরবারে হাজির হলাম সে দিন বারান্দা দুটিতে এক হাজারের উপর সৈন্য চকচকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে উঠান ভরতি করে আমাদের (চীনে) সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের মাথায় চকচকে হেলমেট, গায়ে লোহার বর্ম, আর হাতে বর্শা, তলোয়ার আর তীর ধনুক। রাজার ডাইনে আর বামে শত শত ময়ুর পুচ্ছের ছাতা, আর হলের সামনে কয়েক শত সৈন্য হাতির উপর সওয়ার হয়ে (পাহারা দিচ্ছিল)। রাজা উঁচু একটি সিংহাসনে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন। সিংহাসনের গায়ে দামী পাথর লাগান। রাজার কোলের উপর একটা দু-ধার তলোয়ার পড়ে ছিল।

দুজন পাগড়ি পরা লোক রুপার দণ্ড নিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এল। আমরা যখন পাঁচ পা এগোলাম, তখন তারা সেলাম করল। যখন আমরা হলের মাঝা-মাঝি পৌঁছেছি, তখন তারা থেমে গেল, আর অন্য দুজন লোক হাতে সোনার দণ্ড নিয়ে ঠিক আগের লোক দুটির মত আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। রাজা আমাদের প্রত্যাভিবাদন করে (চীন) সম্রাটের আজ্ঞা পত্রকে নতজানু (Row tow) হয়ে সম্মান জানালেন, তারপর মাথার উপর তুললেন, ও তারপর খুলে সেটি পড়লেন। হলেতে কার্পেটের উপর সম্রাটের (জন্য) উপহার গুলি সাজান ছিল।

রাজা সম্রাটের দূতদের একটি ভোজ দিলেন, আর আমাদের সৈন্যদের অনেক উপহার দিলেন। (দূতদের ভোজে) গরু বা ভেড়ার মাংস খাওয়া নিষেধ। আর এই ভোজে মদও দেওয়া হয়নি, কারণ এতে হট্টগোল হতে পারে, আর এটা অশোভনীয়ও বটে। তার জায়গায় এঁদের মিষ্টি গোলাপ জল খেতে দেওয়া হ'ল। ভোজের শেষে প্রধান দূতদের রাজা সোনার গামলা, সোনার কোমর বন্ধ, সোনার জলপাত্র (Flagan গাড়ু বা বদনা), আর সোনার বড় বাটি উপহার দিলেন। সহকারী দূতদেরও এই

জিনিসগুলিই দেওয়া হ'ল, তবে সেগুলি রূপার তৈরি। নিম্ন কর্মচারীদের একটি করে সোনার ঘণ্টা আর রেশম আর সাদা শনের তৈরি জামা দেওয়া হ'ল। সৈন্যদের সবাইকে রূপার টাকা দেওয়া হল। সত্য কথা এই যে এ দেশের লোক ধনী আর ভদ্র। এর পর রাজা একটি সোনার চোঙার (tube) মধ্যে সোনার পাতে সম্রাটকে লেখা আবেদন পত্র রাখলেন, আর দূতেরা সেটি সেই দরবার হলে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। তাছাড়া দূতেরা সম্রাটের জন্য উপহারগুলিও গ্রহণ করলেন।

এ দেশের লোকেরা উদার। পুরুষেরা সাদা সুতী পাগড়ি পরে, আর লম্বা সাদা সুতী জামা পরে। পায়ে ভেড়ার চামড়ার তৈরি সোনালী সুতা লাগানো ছোট জুতা পরে। শৌখীনদের জুতায় আবার নকশা করা থাকে। সকলেই ব্যবসা বাণিজ্যে লেগে আছে। সেই ব্যবসাতে হয়তো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা খাটছে, কিন্তু একবার পাকা কথা হয়ে গেলে এরা কখনও তার খেলাপ করেনা।

মেয়েরা ছোট জামা পরে, আর গায় সুতী বা রেশমী বা ব্রোকেডের কাপড় জড়িয়ে নেয়। প্রসাধনের জিনিস এরা ব্যবহার করে না, কারণ এরা এমনিতেই ফর্সা। কানে এরা দামী পাথর বসান সোনার দুল পরে। গলায় পেনড্যাণ্ট লাগান হার পরে, আর চুল মাথার পিছনে খোঁপা করে বাঁধে। কবজিতে আর গোড়ালিতে এরা সোনার গয়না পরে, হাত আর পায়ের আঙুলে আংটি পরে।

এদেশে হিন্দু [yin-tu] বলে এক জাতি আছে। তারা গো-মাংস খায় না। মেয়ে আর পুরুষ এক জায়গায় বসে খায় না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী আর বিবাহ করে না, আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামীও আর বিবাহ করে না খুব গরীব আর যাদের রোজগারের কোন উপায় নেই, তাদের গাঁয়ের অন্য পরিবারের লোকেরা পালা করে সাহায্য করে তবে তাদের অন্য গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষা করা নিষেধ। এদের তাই বদান্যতার জন্য প্রশংসা করা হয়।

জমি উর্বর আর প্রচুর শষ্য জন্মায়, কারণ এদের বছরে দুটো ফসল হয়। এরা মাঠের আগাছা তোলে না বা মাঠে নিড়ানি দেয় না। মেয়ে পুরুষ সকলেই খেতে কাজ করে বা ঋতু অনুসারে কাপড় বোনে।

এদের ফলের মধ্যে আছে কাঁঠাল। এগুলি ধামার মতন বড় আর খুব মিষ্টি। তা ছাড়া আছে আম। এগুলিতে যদিও একটু টক আভাস, তাহলেও খেতে খুব সুন্দর। তা ছাড়া এদেশে ফল, সবজি, গরু, ঘোড়া, মুরগী, ভেড়া, হাঁস আর সামুদ্রিক মাছ আছে। এদের ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্যে এরা মুদ্রার জায়গায় কড়ি ব্যবহার করে।

এদেশের পণ্য হল মিহি সুতী কাপড়, সা-হা-লা [Sa-ha-la] কম্বল, তু-লো-কিন [tu-lo-kin], সুতী কাপড়, স্ফটিক, অ্যাগেট, rock crystal, মুক্তা, দামী পাথর, চিনি, ঘি, মাছরাঙার পালক, আর নানা রঙের মুখে পর্দা করবার কাপড়।

(চীন থেকে এদেশের আমদানীর) পণ্য হল সোনা, রূপা, স্যাটিন, রেশম, নীল আর সাদা চিনেমাটির জিনিস, তামা, লোহা, কস্তুরি, সিঁদুর, পারা আর ঘাসের মাদুর।"

[সমাপ্ত]

সি ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু

তৃতীয় বিবরণের নাম সি ইয়াং চাও কুং টিয়েন লু (Si yang ch'ao kung tien lu)। হুয়াং সিং ৎসেং (Huang sing-t'seng) নামে একজন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে পুরানো কাগজ পত্র দেখে এই বিবরণটি লেখেন। ১৪৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বাংলার সুলতান যে সব দূত চীন দেশে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কথাও এই বিবরণে আছে।

দেশটি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সাড়ে তিনশ কিলোমিটার উত্তরে। এই দেশকে পূর্ব ভারত বলা হয়। দেশটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫০০ কিলোমিটার। সুমাত্রা থেকে রওনা হয়ে মাও-শান (Mao-shan) ও নিকোবর পেরিয়ে অনুকূল বাতাসে কুড়ি দিনে চাটগাঁ পৌঁছন যায়। এই বন্দর কে চাটি-কিয়াং ও [ch'a-ti-kiang] বলে। এখান থেকে ছোট নৌকা করে আরও ২৫০ কিলোমিটার গেলে সোনার গাঁ। এই শহরে প্রাচীর, পুকুর, রাস্তা আর বাজার আছে। আবার এখান থেকে যাত্রা করে ১০ কিলোমিটার [বোধহয় ১০০ কিলোমিটার হবে] গেলে রাজধানী পাণ্ডুয়া। এই শহর আর এর শহরতলি দুটিই বেশ সুন্দর। রাজপ্রাসাদ খুব বড়। প্রাসাদটি সাদা চুনকাম করা, আর এর ছাত সমতল। ভিতরের দরজাগুলি তিন থাক মোটা আর এতে নয়টি করে পাল্লা। সব থামগুলিতেই পিতলের উপর ফুল আর পশু পক্ষীর ছবি খোদাই করা আর পালিশ করা। রাজা আর তাঁর কর্মচারীদের পোশাক আর পাগড়ি মুসলমানী। তাঁরা সকলেই মুসলমান ও তাঁদের বিবাহ আর শব-সৎকার মুসলমানী নিয়মে হয়। বাঙ্গালা দেশের লোকেরা ঠাণ্ডা মেজাজের। তারা ধনী ও সৎ। ব্যবসা বাণিজ্যে তারা প্রসিদ্ধ। পুরুষেরা সকলেই চুল কেটে ফেলে আর সাদা সুতী পাগড়ি দিয়ে মাথা বেঁধে রাখে। এরা লম্বা চোগা পরে। তার কলার গোল। শরীরের নীচের দিকে চোগাটি রঙিন পেটি দিয়ে বাঁধা থাকে। পায়ে এরা চামড়ার চটি পরে। মেয়েরা চুল মাথার উপরে বেঁধে রাখে। এরা ছোট কামিজ পরে আর সিল্ক বা ব্রোকেডের রঙিন কাপড় দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে। কানে এরা দামী পাথর বসানো সোনার দুল পরে। পায়ে আর হাতে সোনার চুড়ি পরে, আর পা আর হাতের আঙুলে আংটি পরে।

দেশের আবহাওয়া সব সময়েই গরম। এদের বার মাসে বছর হয়, আর কোন মল-মাস নেই। সব চেয়ে বেশি শাস্তি হ'ল নির্বাসন। রাজকর্মচারীদের নিজস্ব সীল (seal) থাকে ; আর একে অন্যকে চিঠি পত্র লিখে যোগাযোগ করে। সৈন্যাধক্ষের নাম সিপাহ-সালার। এ দেশে বৈদ্য, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ ও শত শত রকম শিল্পের বহু কারিগর আছে। এরা সব বাজারে জড়ো হয়ে দোকান বসায়। এদের ভাষা বাংলা, তবে এরা ফারসীও ভাল জানে। এক রকম সঙ্গীতজ্ঞ আছে যাদের কেন-সিয়াও-সু-লু-নাই [ken-siao-su-lu-nai] বলে। এরা বড় লোক আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাড়ি গিয়ে রোজ সকালে বাজনা বাজায়। একজন ছোট ঢোল বাজায়, একজন বড় ঢোল বাজায়, আর একজন পি-লি (pi-li, ছোট বাঁশি) বাজায়। এদের সঙ্গীত খুব নীচু স্বরে আর ঢিমে তালে আরম্ভ হয়, আর শেষ হয় উচ্চ স্বরে আর দ্রুত তালে। সঙ্গীত শেষ হলে বাড়ির লোকেরা এদের মদ, খাবার আর টাকা দিয়ে আপ্যায়ন করে।

বাড়িতে লোকে দেখা করতে এলে এরা তাদের সুপারি খেতে দেয়। তবে যখন এরা লোককে নিমন্ত্রণ করে তখন অতিথিদের আনন্দের জন্ত অভিনেত্রীদের (actress, নটী ?) নাচের বন্দোবস্ত থাকে। অভিনেত্রীরা হালকা লাল রঙের ফুল তোলা জামা পরে। শরীরে তলার দিকটা এরা রঙীন রেশমের কাপড় জড়িয়ে রাখে। গলায় আর কাঁধে এদের পেনড্যাণ্ট আর হার থাকে। এতে পাঁচটি রঙিন দামী পাথর বা প্রবাল বা স্ফটিক বসান থাকে। কব্জিতে নীল আর লাল দামী পাথর থাকে।

এ দেশের লোকেদের বাঘের খেলা খুব পছন্দ। একজন লোক একটা বাঘ লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে পথ দিয়ে যায়। খেলা আরম্ভের সময় লোকটি শিকল খুলে দেয়, আর বাঘটা মাটিতে শুয়ে পড়ে। লোকটা নগ্ন। সে বাঘটাকে মারে, আর বাঘটা তাইতে রেগে গিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোকটা তখন মাটিতে পড়ে গিয়ে বাঘের সঙ্গে কয়েকবার লড়াই করে। তারপর সে বাঘের মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেয়, তবে তার হাতে কোন আঘাত লাগেনা। খেলা শেষ হলে বাঘটা মাটিতে শুয়ে পড়ে। লোকে তখন বাঘটাকে মাংস খেতে দেয়, আর লোকটাকে টঙ্কা দেয়।

ব্যবসা বাণিজ্যে এরা হয় রূপার টাকা, যার নাম টঙ্কা, ব্যবহার করে, নয় সমুদ্রের ঝিনুক যাকে কড়ি বলে তাই ব্যবহার করে। এদের সব চেয়ে বড় শিল্প হ'ল কাপড় তৈরি করা। এদের জমি খুব উর্বর আর তাতে সব রকমের ফসল হয়। বছরে দুটো ফসল। আর তা ছাড়া এদেশে গরু আর অন্ত গৃহপালিত জন্তুর খাবারও খুব উৎপন্ন হয়। এদের রৌপ্য মুদ্রার সরকারী ওজন হ'ল ৩/১০ টায়েল। এগুলির ব্যাস তিন সেন্টি-মিটার। মুদ্রার উলটো দিকেও নকশা থাকে। কড়ি ওজন দরে কেনা বেচা হয়।

এদের মদ চার রকম। একটি তৈরি হয় নারিকেল দিয়ে, একটি চাল থেকে, আর একটি কাজং বলে একরকম জলজ উদ্ভিদ থেকে, আর শেষেরটি তৈরি হয় তুঙের (tung) বীজ থেকে। এরা ছয় রকমের কাপড় তৈরি করে। এক রকম সুতী কাপড়কে এরা পি-পু (pi-pu) বলে। এগুলি দু ফুটের বেশি চওড়া আর ৫৬ ফুট লম্বা; এ গুলি মিহি আর সাদা। মান চেটি (man-che-t'i) বলে এক রকম হলদে রঙের সুতী কাপড় আছে; এ গুলি চার ফুট চওড়া আর ৫০ ফুট লম্বা। এগুলির বুনন ঠাস, আর বেশ মজবুত। সুতী স্বচ্ছ কাপড়ের (gauge) নাম শান বাফ্‌ত (shan baft)। এগুলি পাঁচ ফুট চওড়া আর ৩০ ফুট লম্বা। এগুলি পোঙ্গীর (pongee) মত। অন্ত এক ধরণের স্বচ্ছ কাপড়ের নাম কি-পাই-কিন-তা-লি (ki-pai-kin-ta-li)। এগুলি তিন ফুট চওড়া আর ৬০ ফুট লম্বা। এগুলি মাথায় পাগড়ি বাঁধবার কাজে আসে। অন্ত এক রকমের কাপড় আমাদের সান-সো'র (san-so) মত। এগুলি আড়াই ফুট চওড়া আর চার ফুট লম্বা। এগুলিকে সা-তা-ইউল (sa-ta-eul) বলে। মলমল যাকে বলে সেগুলি চার ফুট চওড়া আর কুড়ি ফুট লম্বা। উল্টো দিকে এগুলি আধ ইঞ্চি চওড়া ন্যাপ (nap, পশম ?) দিয়ে ঢাকা। এগুলি আমাদের তু-লো-কিন (tu-lo-kin)।

দেশী পণ্য হ'ল প্রবাল, মুক্তা, স্ফটিক (crystal) ও কর্নেলিয়ান (cornelian) আর ময়ূরের পালক। এদের ফল হ'ল কলা, কাঠাল, বেদানা, শুকনা খেজুর, আখ,

ইত্যাদি। এদেশে মাখন, ঘি আর মধু প্রচুর। অনেক রকমের ফুটি, পেঁয়াজ, আদা, কাস্টার্ড [custard], বেগুন এ দেশে পাওয়া যায়। এ দেশে উট আছে। তুঁত গাছ থেকে এরা কাগজ বানায়। এক রকম গাছ আছে যার ডাল গুলি সরু আর পাতা সবুজ। সকালে এদের ফুল ফোটে আর বিকেলে ফুল গুলি শুকিয়ে যায়, অনেকটা আমাদের য়ে-হো'র [ye-ho] মত। এই গাছের ফল আমাদের কুলের মত। এগুলিকে আমলকী [an-mo-lo], বা ইউ-কান [yu-kan, "মিষ্ট-শেষ"] বলে। সিন্দুরের বিষ আর পাথুরির চিকিৎসায় এই ফল ব্যবহার হয়।

বাঙ্গালার রাজা যখন চীন সম্রাটের আদেশ গ্রহণের অনুষ্ঠান করেন তখন প্রাসাদের বাম আর ডাইনের বারান্দায় এক হাজারের উপর সৈন্যরা চকচকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ছাড়া সৈন্যরা চকচকে হেলমেট, অস্ত্র, তলোয়ার, তীর আর ধনুক হাতে রক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের মত দেখতে। একশ জন লোক ময়ূরের পালকের ছাতা নিয়ে, আর একশ জন লোক হাতির উপর সওয়ার হয়ে প্রধান হলে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা একটা উঁচু সিংহাসনে বসেন। তাতে আট রকমের দামী পাথর লাগানো। রাজার কোলে একটি দু-ধার তলোয়ার থাকে। রূপার দণ্ড হাতে দুজন আমলা চীনের রাজদূতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আসেন। তাঁরা পাঁচ পা অন্তর সেলাম করেন, আর অর্ধেক পথ গিয়ে থেমে যান। তখন অন্য দুজন আমলা সোনার দণ্ড হাতে দূত কে ঠিক সেই রকম অনুষ্ঠান করে এগিয়ে নিয়ে যান। রাজা তখন অত্যন্ত বিনীত ভাবে আর সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করেন, আর দু হাত কপালে তুলে সেলাম করেন। সম্রাটের আদেশ আর উপহারের তালিকা পড়া হয়ে যাবার পর, মেজেতে কার্পেট বিছানো হয় ও রাজা চীনের দূতবৃন্দকে ভোজে আপ্যায়ন করেন। ভোজে রোস্টকরা আর ধুমে পাক করা [smoked] গো মাংস, মেষ মাংস, গোলাপ জল, নানা রকম সুগন্ধ দেওয়া মিষ্ট ফল দেওয়া হয়।

বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার পাঠানোর ব্যাপারে এরা নিয়মিত নয়। [চীনের সম্রাট যে হেতু পৃথিবীর সম্রাট তাই অন্য দেশের রাজারা তাঁকে যা উপহার পাঠান তা বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর (tribute) মাত্র।] ইয়োং-লো তে [Yong-lo] ষষ্ঠ বছরে [১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে] রাজা গাই-ইয়া-সে-ভিং [গিয়াসুদ্দীন] তাঁর দূত আর বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার পাঠান। ইয়োং-লোতে নবম বছরে (১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে) এই দূত তাই-ৎসাং [T'ai-tsang] পৌছন। সেখানে বিদেশ বিভাগের একজন কর্মচারীকে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য পাঠানো হয়। দ্বাদশ বছর ইয়োং-লো তে (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ) পা-য়ি-ৎসি (বায়াজিদ) নামে একজন রাজদূত কে কি-লিন (k'i-lin, জিরাফ ?) ও অন্যান্য উপহার নিয়ে চীন দেশে পাঠান হয়। আর একজন রাজদূতকে অনুরূপ কর স্বরূপ উপহার নিয়ে তৃতীয় বছর চেং টোঙে [Cheng-t'ong, ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দ] পাঠানো হয়। বাঙ্গালার রাজার চিঠি সোনার পাতে লেখা ছিল। এবারে উপহার ছিল, ঘোড়া, জিন, সোনা রূপার অলঙ্কার, সোনার উপর খোদাই করা জিনিস, লিও-লি (leo-li) বাটি (vases), সাদা চীনে মাটির উপর নীল অলঙ্করণ করা জিনিস, সা-হা-লা (শাল), চো-

ফু-হাই-তা-লি (cho-fu-hai-ta-li) কাপড়, তু-লো-কিন (tu-lo-kin), দানা বাঁধা চিনি, রুসেরসের করোটি, এক-শৃঙ্গীর শিং ময়ূরের পালক, টিয়াপাখি, গন্ধ দ্রব্য, কাঁচা ধাক কাঠ (অগুরু), গুগ্‌গুল, খদীর, বেগুনি আঠা, দৈত্য রক্তের সুগন্ধী (dragon's blood incense) কর্পূর, এবনি কাঠ, সাপান কাঠ, আর গোলমরিচ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা একটি ধনী ও সভ্য দেশ। আমাদের রাজদূতদের তারা সোনার গামলা, সোনার কোমর-বন্ধ, সোনার জলপাত্র আর সোনার বাটি উপহার দিয়েছিল; আর তাঁর প্রধান সহকারীকে তারা ঐ জিনিসই রূপার তৈরি উপহার দিয়েছিল। আমাদের বিদেশ বিভাগের কর্মচারীদের তারা সোনালী ঘণ্টা আর সাদা শন আর রেশমের তৈরি চোগা উপহার দিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা পেয়েছিল রৌপ্য মুদ্রা। ধনী না হলে কী তারা এতো উদার ভাবে এই সব দিতে পারতো ?

[সমাপ্ত]

॥ ৪ ॥

শু-ইয়ু-চু-ৎসিউ-লু

চতুর্থ বিবরণের নাম শু-ইয়ু-চু-ৎসিউ-লু [shu-yu-chou-tseu-lu]। এটি ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়। এই বিবরণটির সামগ্রী পূর্ববর্ণিত বিবরণগুলি ছাড়া, বর্তমানে অজ্ঞাত অন্য কয়েকটি বিবরণ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

"প্রাচীন দেশ ভারতে [sin-tu, ভারত] পাঁচটি য়িন-তু [yin-tu] আছে। বাঙ্গালা হ'ল পূর্ব য়িন-তু দেশ। এই দেশেই শাক্য বোধি লাভ করেছিলেন। সমুদ্রের ধারে চাটিগাঁও [ৎসা-তি-কিয়াং] বন্দর। বিদেশ থেকে বণিকরা এসে এই খানে নঙ্গর ফেলে। এই খানেই তারা একত্র হয়ে লাভের টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা করে। হান বংশের মিংতির রাজত্ব কালে বুদ্ধের ধর্ম চীন দেশে আসে। ভারতে নিয়ম হ'ল শবকে চিতায় রেখে পুড়িয়ে ফেলা চিতাকে চা-পি [ch'a-pi] বলে। এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে। বুদ্ধের অনুযায়ীরাও এই রীতি পালন করে। চীনের সাধারণ লোকেরা এই রীতির অনুসরণ করে তাদের শব পুড়িয়ে ফেলে।

বর্তমান মিং বংশের ইয়োং লো [Yong-lo] তৃতীয় বর্ষে [১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে] সেই দেশের রাজা গিয়াসুদ্দীন সম্রাটের দরবারে একজন রাজদূত পাঠান। সম্রাটের আদেশে চু, সে, শা আর লো [chu, sse, sha lo, এই চার রকমের রেশমের] চারটি করে চাদর আর চু-আনের [ch'u-an] আটটি চাদর রাজার জন্য আর ঐ সব রেশমের তিনটি করে চাদর আর চু-আনের দুটি চাদর রানীর জন্য উপহার দেওয়া হয়। সম্রাট আদেশ দেন যে একজন রাজদূত ভারতে যাবেন। তিনি কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকেও আমন্ত্রণ করেন। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাজধানীতে আসেন। [বোধহয় তিব্বতী লামা হো-লি-মা'র [Ho-li-ma] কথা বলা হচ্ছে। উনি এই সময়ের কাছাকাছি চীনের

রাজধানীতে গিয়েছিলেন।] তাঁর নাম মহারত্ন ধর্মরাজ। তিনি এসে লিং-কু-স্সে [Ling-ku-sse] তে থাকতেন। তাঁর ঋদ্ধি নামে একরকম অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তিনি লোকেদের "ওম মণি পদ্মে হুম্" [yang mo-ni-pa-mi-hung] জপ করতে শিখিয়েছিলেন। তখন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করত তারা দিন রাত এই মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করল। এই দেখে লি কি-টিং নামে হান-লিন অকাদমীর একজন পণ্ডিত বললেন যে "লোকটির যদি সত্যই দৈব ক্ষমতা থাকে তাহলে ওর চীনে ভাষাও জানা উচিত। ওর অস্তুদের সঙ্গে কথা বলতে দোভাষী লাগে কেন? তা ছাড়া ঐ যে ও 'মণি পদ্মে হুম্' বলতে শেখাচ্ছে ওর সোজা মানে হল আমি তোমাদের ঠকিয়েছি য়াং-পা-নি-হুং Yang-pa-ni-hung)। লোকে কিছুই বোঝে না।"

ইয়োং লো তে ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ দেশের রাজা বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার নিয়ে একজন রাজদূত কে পাঠান। রাজদূত তাই-ৎসাং (T'ai-ts'ang) বন্দরে এসে নামেন। বিদেশ বিভাগের মন্ত্রীকে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বলা হয়।

ইয়োং লো তে দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলার রাজা তাঁর মন্ত্রী পা-ই-ৎসি (বায়াজিদ) কে কি-লিন (K'i-lin, জিরাফ ?) ও বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ অন্য উপহার দিয়ে পাঠান। নিয়ম-অনুষ্ঠানের মন্ত্রী সম্রাটকে অভিনন্দন করে একটি অভিনন্দন পত্র দেন। সম্রাট জবাবে বলেন, তোমরা দিন রাত শাসন কার্যে আমাকে সাহায্য কর। দেশ এইতেই লাভবান হয়। দেশের যদি ভাল হয় তাহলে কি-লিন থাক বা না থাক কিছু আসে যায় না। অভিনন্দনের কোন দরকার নেই।" সম্রাট রাজাকে চারটি কিন ও যাটটি লিং উপহার দেন। কর্মচারীদেরও তাদের পদ অনুসারে উপহার দেওয়া হয়।

ত্রয়োদশ বর্ষ ইয়োং লো তে (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে) সম্রাট আদেশ দেন যে খোজা হু-হীয়েন (Hou-hien) ও অন্যরা কিছু সৈন্যের সঙ্গে জাহাজে করে বাঙ্গালার রাজা ও রাণীর কাছে উপহার নিয়ে যাবেন। (সেই) রাজা যখন শুনলেন যে আমাদের বহুমূল্যবান জাহাজ তাঁর দেশে পৌছেছে তখন তিনি স্থানীয় কর্মচারীদের রাজদূতদের অভ্যর্থনা করতে পাঠালেন। কর্মচারীদের সঙ্গে কাপড় আর অন্য উপহার ছিল, আর বহু সহস্র সৈন্য তাদের সঙ্গে ছিল। তাঁরা চা-টি (চাটি-গাঁও) বন্দরে নামেন। ষোলটি বিশ্রামের স্থান পেরিয়ে তাঁরা সোনার গাঁও পৌছলেন। এখানে শহর, পুকুর, রাস্তা আর বাজার আছে। সব রকম পণ্য এখানে একত্র করা হয়, আর এখান থেকে বিতরণ করা হয়। বাঙ্গালার রাজা এখানেও তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য আর উপহার বয়ে নিয়ে যাবার জন্য লোকজন আর হাতি ঘোড়া পাঠিয়ে ছিলেন। আরও কুড়িটি বিশ্রামের স্থান পেরিয়ে তাঁরা পাণ্ডুয়া [Pan-tu-wa] পৌছলেন। এই শহরই রাজার রাজধানী। শহর আর শহরতলি দুটিই খুব সুন্দর করে সাজানো। অনেক রকম পণ্য এখানে একত্র করা হয়। রাস্তা বাজার ছাড়া এখানে দোকানও অসংখ্য। রাজার প্রাসাদ ইট আর চুনের বানানো। প্রাসাদ বেশ উঁচু আর প্রশস্ত। প্রাসাদের ছাত সমতল আর সাদা পালিশ করা। ভিতরের দিকে তিনটি দরজা আর নয়টি উঠান। থামগুলি পিতল দিয়ে মোড়া আর তার উপর ফুল আর জন্তু জানোয়ার আঁকা। ডান দিকে আর বাঁ দিকে

লম্বা বারান্দা। বারান্দা দুটিতে হাজার হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য। বাইরে দৈত্যাকারের লোকেরা চকচকে শিরস্ত্রাণ আর বর্ম পরে তলোয়ার, ধনুক আর অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের চেহারায় বেশ একটা জাঁক জমক আছে। দালানের ডান আর বাঁ দিকে শত শত ময়ূর পুচ্ছের পাখা। উঠানের সামনে কয়েকশ হাতি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। রাজা একটি উচ্চ আসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর গায়ে আট রকম বহু মূল্য জিনিসের অলঙ্কার। কোমরে তাঁর তলোয়ার। তাঁর আদেশে দুজন লোক (চীনের দূতকে) এগিয়ে নিয়ে যেতে এলো। তাদের মাথায় পাগড়ি আর হাতে রূপার দণ্ড। এগোবার সময় তারা প্রতি পাঁচ পা গিয়ে একবার সেলাম করছিল। মাঝখান অবধি গিয়ে তারা থেমে গেল। তার পর সেই রকমই দুজন সোনার দণ্ড হাতে এসে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এল। রাজা দু হাত কপালে ঠেকিয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করলেন। আদেশ পত্র খোলা হ'ল, আর তারপর সেটা পড়ে রাজার হাতে দেওয়া হ'ল। রাজা সেটি গ্রহণ করলেন। তারপর উঠানে পশমের কার্পেট বিছিয়ে আমাদের রাজদূত ও সৈন্যদের অতিথি সৎকার করা হল। ব্যাপারটা খুব অনুষ্ঠান পূর্ণ। রোষ্ট করা গো মাংস আর ভেড়ার মাংস খেতে দেওয়া হ'ল, তবে ভোজে মদ খাওয়া নিষেধ, কারণ মদ খেলে মানুষের প্রকৃতি বদলে যায়। তার জায়গায় জলে গোলাপের নির্যাস আর মধু মিশিয়ে পরিবেশন করা হ'ল। ভোজ শেষ হলে রাজদূতকে সোনার শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্ধ, গামলা আর পাত্র উপহার দেওয়া হ'ল। সহকারী রাজদূতকে রূপার শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্ধ, গামলা আর পাত্র উপহার দেওয়া হ'ল। নিম্নতর অফিসারদের সোনার ঘণ্টা আর চেন, আর চু আর সে'র [chu ও sse] তৈরি লম্বা চোগা উপহার দেওয়া হ'ল। দেশের লোক বেশ ধনী আর উদার। রাজা তারপর তাঁর সোনার পাতের উপর লেখা চিঠি সোনার কৌটায় রাখলেন ও তাঁর দূতের সঙ্গে তাঁর দেশের উৎপন্ন সামগ্রী উপহার স্বরূপ দিয়ে (চীন) সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর পর মাঝে মাঝে সে দেশ থেকে রাজদূতরা চীনে এসেছেন।

এ দেশের নিয়ম কানুন খুব উদার। পুরুষরা মাথায় সাদা পাগড়ি পরে, আর গায় লম্বা সাদা চোগা পরে। পায় ছাগলের চামড়ার জুতা পরে। তাতে সোনালী ফিতে। এ দেশের লোকে সংস্কৃতিবান ও সৎ। তাই ব্যবসা করতে গেলে জিনিসের দাম খুব বেশি হলেও কথার খেলাপ করে না। এ দেশে প্রচলিত রূপার মুদ্রার নাম টঙ্কা। এগুলির ওজন (চীন দেশের) ২·৮ আউন্স। এদেশে এই টাই মুদ্রার হিসাবের মান (unit)। মেয়েরা ছোট কোট পরে, আর রঙিন সুতা বা রেশমের এমব্রয়ডারী করা স্কার্ফ গায় দেয়। এরা মুখে কোন সাদা ক্রীম লাগায় না। এমনিতেই এরা সুন্দর। মাথায় এরা দামী টায়রা পরে আর গলায় নেকলেস পরে। চুল মাথার পিছনে খোঁপা করে বেঁধে রাখে। হাতে চুড়ি আর পায় মল পরে, আর হাত আর পায়ের আঙুলে আংটি পরে।

হিন্দুরা গো-মাংস খায় না। তারা মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে বসে খায় না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী আর বিয়ে করে না, আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামীও আর বিয়ে করে না। অনাথদের আর বিধবাদের যাদের কেউ দেখবার নেই, তাদের গায়ের প্রতি বাড়ি থেকে

পালা করে খেতে দেওয়া হয়, তাদের গাঁয়ের বাইরে ভিক্ষার জন্য যেতে দেওয়া হয় না।

এদের খেত খুব উর্বর। বছরে দুবার ফসল হয়। বীজ বপনের কোন প্রয়োজন নেই ফসল সময় মত আপনিই হয়। মেয়ে পুরুষ সকলেই লাঙল চালানো আর কাপড় বোনার ব্যাপারে খুব পরিশ্রমী। এদেশে ফুটি, ফল, তরকারি, গরু, ঘোড়া, মোরগ, মুরগী, ছাগল হাঁস, পাতিহাঁস, আর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। বাজারে এরা মুদ্রার জায়গায় কড়ি ব্যবহার করে। এদেশে সোনালী আর রূপার জিনিস; তুয়ান (tuan), চুয়ান (ch'uan) সাদা আর নীল কাজ করা চীনে মাটির বাসন, তামা, লোহা, কস্তুরী, সিঁদুর, পারা, খড়ের মাদুর, ইত্যাদি পাওয়া যায়। পর্বতকে এরা পঙ্ক-চূড়া (পঙ্ক-শৃঙ্গ) বলে।

এদেশের পণ্য হ'ল সুতী কাপড় শাল, পশমের কার্পেট, তুলো কিন (tu-lo-kin), স্ফটিক (crystal), চন্দ্রকান্ত, মুসারগল্ভ (musaragalva), প্রবাল, মুক্তা, দামী জহরত, অস্বচ্ছ কাঁচ, চিনি, মধু, ঘি, আর ময়ূরের পালক। নানা রঙের রুমাল, কম্বল, মিষ্টি কাঁঠাল, আর আম এ দেশে পাওয়া যায়। আমের গন্ধ টক, কিন্তু খেতে ভাল।

(চীনের সম্রাটের বশ্যতা স্বরূপ) এদের কর হ'ল, ঘোড়া, সোনা, রূপা বা অন্য ধাতুর তৈরি ঘোড়ার জিন; অস্বচ্ছ কাঁচের বাটি, নীল আর সাদা কাজ করা চীনে মাটির বাসন, শাল, চে-চু-হাই-তা-লি, সিন-পো, পি-পু ও তু-লো-কিন কাপড়, দানাদার চিনি, বুসেরোস (buceros), এক শৃঙ্গীর সিং, ময়ূরের পালক, টিয়া, গন্ধদ্রব্য, কাঁচা দারু কাঠ, গুগ্‌গুল, খদীর, বেগুনি গঁদ, ড্র্যাগনের রক্ত, এবোনি কাঠ, সাপান কাঠ, আর গোলমরিচ।"

[সমাপ্ত]

॥ ৫ ॥

মিং-শে [Ming-she]

মিং যুগের সরকারী ইতিহাস ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। মিং-শে তে বাঙ্গালা দেশের যে বিবরণ দেওয়া আছে, তা পুরানো কাগজ পত্র দেখে তৈরি করা হয়েছিল মনে হয়। মিং-শে তে দেওয়া বাঙ্গালাদেশের বিবরণ এই—

"হান [Han] যুগে যে দেশ কে শেন-টু [Shen-tu] বলা হত, আর বাঙ্গালা একই জায়গা। পরবর্তী হান [Later Hans] যুগে যে দেশকে তিয়েন-চু [T'ien-chu] বলা হ'ত তাও ঐ একই জায়গা। পরবর্তী কালে মধ্য ভারত থেকে লিয়াং [Leang] সম্রাটদের কাছে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার আসত; আর দক্ষিণ ভারত থেকে অনুরূপ আসত ওয়াই'র [Wei] কাছে। তাং [T'ang] যুগে দেশটি পাঁচটি তিয়েন-চু তে বিভক্ত ছিল। এদের পঙ্ক য়িন-তুও [yin-tu] বলা হয়। বাঙ্গালা পূর্ব ভারতকে বলা হয়। অনুকূল বাতাস পেলে সুমাত্রা থেকে এই দেশে কুড়ি দিনে পৌছান যায়।

ষষ্ঠ বর্ষে ইয়োং-লোতে (১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে) বাঙ্গালার রাজা (গিয়াসুদ্দীন) বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়ে চীন দেশে একজন রাজদূত পাঠান। চীনও তাঁকে বদলে অনেক উপহার দেয়। সপ্তম বর্ষ ইয়োং-লোতে [১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে] তাঁদের রাজদূত ২৩০ জন অফিসার নিয়ে আবার আসেন। ঠিক এই সময় সম্রাট বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করার নীতি আরম্ভ করেছিলেন। তাই তিনি বাঙ্গালা দেশে অনেক উপহার পাঠান। তারপর থেকে তাঁরা প্রতি বছরই আসতেন। দশম বর্ষ ইয়োংলোতে [১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে] ঐ দেশের রাজদূত চীন দেশে পৌছবার ঠিক আগেই সম্রাট চেন-কিয়াঙে তাঁর মন্ত্রীদের রাজদূতকে অভ্যর্থনা করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। সব ব্যবস্থা যখন হয়ে গেছে তখন সেই রাজদূত তাঁদের রাজার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসে পেঁছিলেন। তখন শোক অনুষ্ঠানে ও কুমার সাই-উ-তিঙের [Sai-wu-ting, সৈফুদ্দীন] অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য অফিসারদের পাঠান হয়। দ্বাদশ বর্ষে ইয়োং-লো তে (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে) নতুন রাজা তাঁর রাজদূতকে ধন্যবাদ সন্দেশ ও কি-লিন [ki-lin], বাঙ্গালা দেশের প্রসিদ্ধ ঘোড়া, আর সে দেশে উৎপন্ন অন্য সামাগ্রী উপহার দিয়ে পাঠান। সরকারী কর্মচারীরা তখন এই উপলক্ষে সম্রাটকে অভিনন্দন দেবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সম্রাট সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। পরের বছর (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে) হু-হিয়েন কে [Hou-hien] সেই দেশে সেখানকার রাজা, রানী আর মন্ত্রীদের জন্য উপহার দিয়ে পাঠানো হয়। তৃতীয় বর্ষে চে-তোঙে [che-t'ong, ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে] তারা একটি কি-লিন উপহার পাঠায়। সব অফিসাররা এই সময় সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। পরের বছর (১৪৩৯) সে দেশ থেকে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর আসে। তারপর সেই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকেনি।...”

[মিংশে তে আর যা বিবরণ আছে তা পূর্ববর্তী বিবরণে আছে।]

[সমাপ্ত]

ভারথেমা

লুদোভিচি দি ভারথেমা'র [Ludovici di Varthema] ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙ্গালা দেশের বিবরণ

ভারথেমা ইটালির বোলোনা [Bologna] শহরের অধিবাসী ছিলেন। ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এশিয়ার বহু দেশে ভ্রমণ করেন। এর বেশি তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা নেই। এই সময়ের মধ্যে তিনি একবার দক্ষিণ বর্মা দেশের টেনাসেরিম থেকে বাঙ্গালা দেশে চট্টগ্রামের কাছে কোন শহরে আসেন। ভারথেমা সেই জায়গার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণে এই শহরের নাম বংঘেল্লা। হয়তো বাঙ্গালা'র নাম তিনি এই ভাবে লিখেছেন।

ভারথেমা'র ভ্রমণ কাহিনী ইটালীয় ভাষায় ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদ করেন জন উইণ্টর জোনস [John winter Jones] ও সেই অনুবাদ হাকলুইট সোসাইটি প্রকাশ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে [Hakluyt Society, Vol. 32, 1863] এখানে শুধু বংঘেল্লা অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হল।

বংঘেল্লা শহর ও এই শহরের তারনাসরি [টেনা সেরিম] থেকে দূরত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়

এখন আমার সাথীর কথায় ফিরে আসা যাক। আমাদের দুজনেরই আরও দেশ দেখবার ইচ্ছা ছিল। ঐ শহরে কিছু দিন থাকবার পর, আর ঐ কাজে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর, আর আমাদের সঙ্গে আনা কিছু পণ্য দ্রব্য বিক্রি হয়ে যাবার পর আমরা বংঘেল্লা শহরের দিকে রওনা হলাম। এই জায়গা তারনাসরি থেকে সাতশ মাইল দূরে, আর সমুদ্র পথে সেখানে পেঁাছতে আমাদের এগার দিন লেগেছিল। আমি যত শ্রেষ্ঠ শহর দেখেছি তাদের মধ্যে বংঘেল্লা অন্যতম, আর এই রাজ্যও বিশাল। এখানকার সুলতান (সেই সময় হুসেন শাহ বাঙ্গালা দেশের সুলতান ছিলেন) একজন মুসলমান। তাঁর পদাতিক আর অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা দু লক্ষ। এরা সকলেই মুসলমান। সুলতানের সঙ্গে নরসিঙ্গার রাজার যুদ্ধ সর্বদাই লেগে আছে। [বিজয়নগরের রাজা বীর নরসিংহের সঙ্গে হুসেন শাহ কোন যুদ্ধ করেন নি।] এখানে শষ্য, নানা রকম মাংস, প্রচুর চিনি আর আদা পাওয়া যায়। তাছাড়া, সুতী কাপড়ের এত প্রাচুর্য পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। এখানকার মত এত বেশি ধনী ব্যবসায়ীও আমি কোন দেশে দেখিনি। প্রতি বছর এখান থেকে পঞ্চাশটি জাহাজ বোঝাই হয়ে সুতী আর রেশমী কাপড় রপ্তানি হয়। এই সব কাপড়ের নাম বয়রাম [bairam], নামোনে [namone], লিজাতি [lizati], দোয়াজার [doazer] আর সিনাবাফ [sinabuft]। এই সব জিনিস তুর্কী, সিরিয়া, পারস্য, সারা আরবদেশ, ইথিওপিয়া আর ভারতের সর্বত্র রপ্তানি হয়। এখানে জহরতের খুব বড় বড় ব্যবসায়ীও আছে। তারা সব অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছে।

বংঘেল্লার কিছু খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অধ্যায়

এই শহরে আমরা কিছু খ্রীষ্টান ব্যবসায়ীদেরও দেখেছিলাম। তারা বলে যে তারা সরনউ [Sarnau] শহর থেকে এসেছে। বিক্রির জন্য তারা কিছু রেশমী কাপড়,

ঘৃতকুমারী (aloe) কাঠ, বেনজোইন (benzoin, বৃক্ষ বিশেষের সুগন্ধ নির্যাস), আর কস্তুরি এনেছিল এরা আমাদের বলেছিল যে তাদের দেশে অনেক বড় বড় খ্রীষ্টান সর্দার (বা জমিদার) আছে তবে তারা সকলেই ক্যাথের (চীনের) মহান খানের অধীন। এই খ্রীষ্টানরা ছোট আঁটো কোট পরে। তাতে অনেক মুড়ি দেওয়া, আর আস্তিন মোটা করে তুলো দিয়ে সেলাই করা। এদের মাথায় দেড় বিঘত লম্বা লাল কাপড়ের টুপি। এদের গায়ের রং আমাদের মতই সাদা। এরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলে দাবী করে, আর বলে যে তারা ট্রিনিটি [ঈশ্বরের তিন রূপ], বারজন অ্যাপস্টল (খ্রীষ্টশিষ্য), ও চারজন ভগবদ্বাক্য প্রচারক, ও বাপতিস্মে বিশ্বাস করে। তারা খ্রীষ্টের জন্মদিন, আর প্যাশন, আর লেণ্ট পর্ব আর অন্য পবিত্র দিনে নিশি পালন করে। তবে আমরা যে ভাবে লিখি এরা তার উলটো ভাবে অর্থাৎ আর্মেনিয়ানদের মত লেখে। [ইংরেজি অনুবাদক বলেছেন যে আর্মেনিয়ানরাও বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখে। হয়তো এই খ্রীষ্টানরা নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান ছিল, আর্মেনিয় নয়।] এই খ্রীষ্টানরা জুতা পরে না এরা রেশমের তৈরি একরকম পায়জামা পরে, অনেকটা নাবিকদের পায়জামার মত। পায়জামাতে জহরত লাগানো, আর তাদের টুপিতেও অনেক জহরত। এই খ্রীষ্টানরা আমাদের মতই টেবিলে বসে খায়, আর এরা সব রকম মাংস খায়। রুমী বা মহাতুর্কের সীমানার ওপারে যে অনেক খ্রীষ্টান রাজাদের রাজত্ব তা এরাও জানে বলল। এদের সঙ্গে অনেক কথা-বার্তার পর আমার সঙ্গী তার পণ্য তাদের দেখাল। এর মধ্যে কয়েকটি সুন্দর বড় বড় প্রবালের শলাকা ছিল। এ গুলি দেখে তারা বলল যে আমরা যদি তাদের সঙ্গে একটি শহরে যাই তাহলে তারা এগুলিকে দশ হাজার ডুকাতে বিক্রি করিয়ে দেবে বা এদের বদলে এমন চুনি পাইয়ে দেবে যে গুলি তুর্কীতে বিক্রি করলে এক লক্ষ্য ডুকাত পাওয়া যাবে। আমার সঙ্গী এই কথা শুনে তখনই তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল। খ্রীষ্টানরা বলল, "দুদিন পরে এখান থেকে একটি জাহাজ পেগো [Pego, পেগু ?] রওনা হবে। আমরা সেই জাহাজে যাব। তোমরা যদি রাজি হও তাহলে আমরা সবাই এক সঙ্গে যাব।" এই কথা শুনে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম ও সেই খ্রীষ্টানদের ও কিছু পারস্যের সওদাগরদের সঙ্গে জাহাজে উঠলাম। এই শহরেই আমরা শুনেছিলাম যে এই খ্রীষ্টানরা খুব বিশ্বাসী, তাই এদের সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তবে বংঘেল্লা ছাড়বার আগে ঐ প্রবাল গুলি, আর জাফরান, আর ফ্লোরেন্সে তৈরি দুটি লাল কাপড়ের টুকরা বাদে আমাদের আর সব পণ্য দ্রব্য বেচে দিলাম। তারপর আমরা বংঘেল্লা ছাড়লাম। আমার মনে হয় বাস করবার পক্ষে এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। যে সব কাপড়ের কথা তোমরা আগে শুনেছো সে গুলি এই শহরে পুরুষরা বোনে, মেয়েরা নয়। এখান থেকে সেই খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমরা পেগোর দিকে রওনা হলাম। বংঘেল্লা থেকে এই জায়গা প্রায় এক হাজার মাইল দূরে।

[সমাপ্ত]

দোম জোয়াও

বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে প্রথম পোর্তুগীজ রিপোর্ট

দোম জোয়াও দে লীমা [Dom Jao do Leyma] নামে একজন পোর্তুগীজ ভদ্রলোক কোচিন থেকে পোর্তুগালের রাজাকে একটি রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্টের তারিখ ২২ ডিসেম্বর ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ। রিপোর্টে সামান্য একটু বাঙ্গালা দেশের কথাও আছে। পোর্তুগীজদের দেখা বাঙ্গালা দেশের বিবরণগুলির মধ্যে এইটিই বোধ হয় প্রথম। বাঙ্গালাদেশ অংশটুকুর ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সুরেন্দ্র নাথ সেন ; ও তাঁর লিখিত *Early Career of Kanhoji Angria and Other Papers* গ্রন্থে এটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। দোম জোয়াও অন্য দেশের জাহাজ লুট করাকে অন্যায় বলে মনে করতেন না।

"দোম জোয়াও গত শীত (বর্ষা) কালে বাঙ্গালা দেশে ছিলেন। [পোর্তুগালে শীত কালে বৃষ্টি পড়ে বলে জোয়াও বর্ষা কালকে শীত কাল লিখেছেন।] সেখানে তাঁকে সমানে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কোন রকম শান্তি বা সন্ধি করা সম্ভব হয়নি। লোকেরা শোনা যায়, দুষ্ট আর দুর্বল, আর তারা দেশের সম্পদ সব লুকিয়ে ফেলেছিল। শুনেছিলাম যে ওদেশের লোকেদের রূপা, প্রবাল আর তামা খুব প্রিয়, কিন্তু কেউই এই সব অমাদের কাছ থেকে কিনতে রাজি হয়নি। এর কারণ এই যে কিছু গুজরাটের জাহাজ ওখানে ছিল আর তারা নানা ভাবে এই কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল। দেশটি সমৃদ্ধশালী। ৩২০ রাইসের [reis] এক পারদাওতে দশ ফারদো (৮০০ কিলো) চাল পাওয়া যায়। এক ফারদো [fardo] তে তিন অলকিরে [alquires] হয়। এক টঙ্গাতে [এক পারদাও = ৬ টঙ্গা] ২০টি মুর্গী বা ৮০টি হাঁস পাওয়া যায়। আর তিনটে গরু পাওয়া যায় এক পারদাওতে। এ দেশের মুদ্রা হ'ল সমুদ্রের ঝিনুক। রাজা ছাড়া আর কেউ সোনা রূপা রাখতে পাবে না। এ দেশের লোক লম্বায় কম আর এদেশের ভাষা গোয়ার লোকেদের মত। তার কারণ এই যে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রতট ইণ্ডিয়ার (গোয়ার) ঠিক উল্টো দিকে। বাঙ্গালার অক্ষাংশ ২০ ডিগ্রি উত্তর অর্থাৎ দিউর সমান। ছয় টঙ্গাতে একটি পুরুষ দাস পাওয়া যায়, আর যুবতীর দাম এর দ্বিগুণ। মোহনার কাছে নদী এখানে তিন মানুষ [fathom] গভীর। জোয়ার এলে তা তিন থেকে ছয় মানুষ হয়ে যায়। মোহনা থেকে নগর (চট্টগ্রাম ?) দু লিগেরও কম। নগর বেশ বড় আর জনবসতি পূর্ণ, তবে দুর্বল। দোম জোয়াওকে এখানে ইণ্ডিয়াতে (গোয়াতে) ফেরবার জন্য মনসুনের জন্য পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হয়।"

[সমাপ্ত]

ডুয়ার্তে বার্বোসা'র [Barbosa] বিবরণ

ডুয়ার্তে বার্বোসা [Duarte Barbosa] পোর্তুগীজ অধিকৃত ভারতে ১৫০০ থেকে ১৫১৬ বা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে অবধি বাস করেন। তিনি পোর্তুগীজ সরকারের চাকরি করতেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের একটি বিবরণ লেখেন। সেই বই থেকে বাঙ্গালা অংশটুকু অনুবাদ দেওয়া হ'ল। বার্বোসা নিজে বোধহয় কখনও বাঙ্গালা দেশে আসেন নি। হাকলুইট সোসাইটি ১৯১৮ সালে বার্বোসার বই'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই অনুবাদের নাম *The Book of Duarte Barbosa*, An Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean and their Inhabitants, written by Duarte Barbosa and completed about the year 1518.

বাঙ্গালা [Bengala] রাজ্য

আরও এগিয়ে ও গঙ্গা নদী ছাড়িয়ে, তটভূমি বরাবর উত্তর দিকে গেলে বাঙ্গালা রাজ্যে এসে পড়া যায়। এই দেশে অনেক শহর আর সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনেক দ্বীপ। এই সব জায়গার লোকেরা ধর্মহীন [heathen]। যারা দেশের ভিতরের দিকে থাকে তারা স্বাধীন, তবে নরসিঙ্গুয়ার [Norsyngua, বিজয়নগরের] রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। মুসলমানরা সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে থাকে। এখানে বহু জিনিসের বাণিজ্য হয়, আর এই সব বন্দরে অনেক দেশের ছোট ও বড় জাহাজ যাওয়া-আসা করে। সমুদ্র আসলে এখানে একটি উপসাগর, দুই ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছে, আর এই দিকে খানিক গেলে উত্তর দিকে মুসলমানদের বেশ বড় একটি নগরে পৌছান যায়। এই নগরের নাম বাঙ্গালা [Bengala]। এটি একটি সুন্দর পোতাশ্রয় [sea-haven]। এই নগরে এদের নিজেদের স্বাধীন মুসলমান রাজা আছে। এখানকার অধিবাসী গৌরবর্ণের; আর এখানে অন্য দেশের লোকও যেমন, আরব, পারস্য, আবেক্সিস [Abexis] এবং ভারতীয়রাও [Indians, ভারতের পশ্চিম উপকূলের লোক] বাস করে। কারণ দেশটি বেশ বড়, উর্বর, আর তা ছাড়া স্বাস্থ্যকর। এরা সকলেই বড় বড় সওদাগর, আর এদের মেকার [Meca, মক্কা (?)] ফ্যাশানের জাহাজ আছে। চীনদেশের জাহাজও এখানে আছে। এগুলিকে জুনকো [junco] বলে। এগুলি বিশাল আর এতে অনেক মাল ধরে। এই সব জাহাজে তারা করমণ্ডল, মালাক্কা, সুমাত্রা, পেগু, ক্যাম্বে, সিংহল ও অন্য বহু দেশের সঙ্গে নানা রকম জিনিসের ব্যবসা করে। এই শহরে বহু তুলার ক্ষেত আছে, আর এখানে আখের, আদার আর লঙ্কার চাষ হয়। এখানে নানা রঙের মিহি কাপড় বোনা হয়। এগুলি এদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য। তাছাড়া এরা বিদেশে রপ্তানির জন্য নানা রকমের সাদা কাপড় তৈরি করে। এগুলি খুব দামী। এদের মধ্যে কয়েকটির নাম এস্ত্রাভান্তেস [estravantes, পাগড়ি ?]। এগুলি খুব মিহি, আর মহিলাদের মাথার উড়ুনি আর মুসলমান ও আরব আর পারস্যের লোকেদের পাগড়ি বানাবার কাজে আসে। এই কাপড় এত বোনা হয়

যে অনেক জাহাজে শুধু এই কাপড় বোঝাই করে বিদেশে রপ্তানি হয়। অন্য যে সব কাপড় এরা বানায় তাদের নাম মামোনা [mamona], দুগজা [duguaza], চৌতারি [chautare] আর সিনাবাফা [sinabafa]। এই শেষেরটিই সবচেয়ে ভাল কাপড়। মুসলমানরা এই কাপড় দিয়ে জামা বানায়। এইগুলি সব কাটা কাপড়; প্রত্যেকটি ২৩ বা ২৪ পোর্তুগীজ গজ লম্বা হবে। এদেশে এগুলি খুব সস্তা। পুরুষরা চরকায় সুতা কাটে আর তারাই এগুলি বোনে। এদেশে আখ থেকে বেশ ভাল সাদা চিনি তৈরি হয়, তবে এরা সেগুলি জমিয়ে ইটের মত করতে পারে না। তাই এরা চিনি গুঁড়া অবস্থাতেই কাঁচা চামড়ায় সেলাই করে নেয়। এই চিনি জাহাজে করে বহু দেশে রপ্তানি করা হয়. চিনি এদেশের একটি প্রধান পণ্য। যখন এই সওদাগরেরা নির্ভয়ে আর ইচ্ছামত মালাক্কা আর ক্যাম্বে যেতে পারতো, তখন মালাবারে এক কুইণ্টল চিনি ১৩০০ রাইসে [reis] বিক্রী হ'ত। সব চেয়ে ভাল চৌতারি কাপড় বিক্রী হ'ত একশ রাইসে; সিনবাফা কাপড় বিক্রী হ'ত দুই ক্রুজাডোতে [cruzado] আর সব চেয়ে ভাল বিটিল্‌হা [beatilha] তিনশ রাইসে। তাই যারা এ সব জিনিস নিয়ে যেত তাদের এই সব বিক্রি করে খুব লাভ হ'ত। তাছাড়া এই শহরে এরা বহু পরিমাণে আদা, কমলালেবু, লেবু, আর অন্য যে সব ফল এদেশে হয় তার আচার বানায়। এখানে ঘোড়া, গরু, ভেড়া আর অন্য অনেক জন্তুর পাল আছে বহু গৃহপালিত মুরগিও আছে।

এই শহরের মুসলমান সওদাগররা দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে মা বাপের কাছ থেকে বা ছেলে চোরদের কাছ থেকে ধর্মহীনদের ছেলেদের কিনে আনে। ছেলে চোররা এই সব ছেলেদের পুরোপুরি খোজা করে দেয়। অনেক ছেলেই এই শল্যক্রিয়া করার সময় মারা যায়, তবে যারা বেঁচে থাকে তাদের এরা ভাল ট্রেনিং দেয়, আর তারপর বেচে দেয়। এই খোজাদের এ দেশের বড়লোকেরা নিজেদের অন্তঃপুর বা সম্পত্তি রক্ষার বা অন্য কাজের জন্য খুব ভাল মনে করে। এই খোজাদের সচ্চরিত্র বলে খুব সুনাম আছে। মুসলমান রাজাদের কাছে কাজ করে এরা উন্নতি করে অনেক সময় বড় বড় সর্দার, বা শাসক, বা সেনাপতির পদ পেয়ে যায়। অনেকে বেশ বড় লোক আর সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।

ভদ্রলোক মুসলমানরা সাদা সুতী লম্বা জামা পরেন। জামা তাঁদের গোড়ালি অবধি লম্বা। এই জামার কাপড় খুব মিহি। জামার তলায় তাঁরা কাপড়ের কোমরবন্ধ পরেন, আর গায়ে রেশমের স্কার্ফ পরেন। কোমরবন্ধে ছোরা রাখেন। উচ্চপদস্থ লোকেদের ছোরার হাতলে সোনা বা রূপার পাত মোড়া থাকে। এঁরা আঙুলে মণি বসানো আংটি আর মাথায় পাগড়ি পরেন। আর এঁরা থাকেন বিলাসী ভাবে, ভাল খান আর মুক্ত হস্তে খরচ করেন। অন্য ভাবেও এঁরা খুব খরচ করেন। এঁদের স্নান করবার জন্য বাড়িতে বড় বড় পুকুর আছে, প্রত্যেকেরই তিনটি বা চারটি বা সামর্থ অনুসারে আরও বেশি পত্নী আছে। পত্নীদের সাবধানে ঘরের মধ্যে রাখা হয়, তবে এঁরা তাদের খুব যত্ন করেন, আর প্রত্যেককেই সোনা, রূপার জিনিস ও ভাল রেশমের বস্ত্র

ইত্যাদি দেন। এই মেয়েরা রাত্রি ছাড়া কখনও কারুর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে যায় না। দেখা করতে গিয়ে এরা খুব আমোদ আহ্লাদ করে, আর তখন এরা তাদের গুড়ের তৈরি মদ খুব খায়। মেয়েরা নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে খুব পারদর্শী। শহরের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা হাঁটুর কাছাকাছি অবধি লম্বা জামা পরে, আর মাথায় তিন চার ফের দেওয়া ছোট পাগড়ি পরে। সকলেই জুতা পরে, কেউ বুট জুতা, আর কেউ বা চটি। জুতাগুলি বেশ মজবুত, আর সোনার পাত লাগান। লোক সংখ্যা এ দেশে বহু, আর এদের রাজা খুব ধনী আর শক্তিশালী। প্রায় প্রতিদিনই কিছু ধর্মহীন লোক শাসকদের অনুগ্রহ ভাজন হবার জন্য মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বঙ্গাল শহর ছাড়া দেশের ভিতর দিকে বা সমুদ্রের ধারে আরও অনেক শহর আছে। সেখানে মুসলমান আর ধর্মহীনরা বাস করে। সকলেই এই রাজার অধীন। রাজা সেই সব শহরে শাসন ও সীমা-শুল্ক ও অন্য কর আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন।

এই উপসাগরের সব শহরই সমুদ্রের ধারে। কিছুদূর গিয়ে সমুদ্রকূল আবার দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে।

[সমাপ্ত]

জোয়াও দে বাররোস [João de Barros]

জোয়াও দে বাররোস পোর্তুগালের একজন ঐতিহাসিক। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁর রচিত দেকাদাস [*Decadas*] গ্রন্থে যে ভৌগলিক বিবরণ আছে তার বাঙ্গালা দেশ অংশের অনুবাদ নীচে দেওয়া হ'ল। বাররোস নিজে বোধহয় কখনও এ দেশে আসেন নি তাঁর লেখার ইংরেজি অনুবাদ হাকলুইট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *The book of Duarte Barbosa* গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে আছে।

প্রথম দে কাদা

এই [সেগোগোরা] অন্তরীপকে আমাদের দেশের লোকে পালমাইরাস (Palmeiras) বলে। এই খানেই, ২১ ডিগ্রিতে, উড়িষ্যা রাজ্য শেষ হয়। বাঙ্গালার অপর সীমানা চাটিগাঁও [Chatigao] ২২ ডিগ্রিতে অবস্থিত, এখান থেকে প্রায় ১০০ লিগ হবে। সেগোগোরাতে উড়িষ্যা দেশে ঢোকবার একটি জলপথ আছে। এটি হ'ল গঙ্গা [Ganga] নদী। এই নদী উড়িষ্যা রাজ্যের অধিকাংশ ভাগের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, আর এই রাজ্যের প্রধান শহর রমনার [Ramana] পাশ দিয়ে গিয়ে গ্যাঞ্জেস [Ganges] নদীতে পড়েছে। এই খানেই এই নদী সমুদ্রে পড়ে। সেগোগোরা থেকে চাটিগাঁও অবধি দেশ বর্ণনা না করে নক্শা এঁকে ভাল বোঝানো যায়। কারণ সমস্ত দেশটিতেই কোথাও নদী আর কোথাও বা অগভীর জল। গ্যাঞ্জেস নদীর মোহনায় প্রচুর জলের জন্য এই সব দ্বীপ তৈরি হয়েছে। এই সব দ্বীপের নগরগুলির নাম না করে, যে সব কৌতূহলী পাঠক এদের অবস্থান জানতে চান তাঁদের আমার ভূগোলের ম্যাপগুলি দেখতে বলব। [ম্যাপগুলি কোনদিন প্রকাশিত হয়নি।]

চতুর্থ দে কাদা

ভারতবর্ষের সমুদ্র তটের যে সাধারণ বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি, তাতে আমরা বাঙ্গালা সম্বন্ধে বাঙ্গালার উপসাগরের বিস্তার ও গ্যাঞ্জেস [যাকে ঐ দেশের লোক গঙ্গা বলে] নদীর মোহনার কথা ছাড়া আর কিছু বলিনি। তাই আমার মনে হয় যে সেই দেশে আমাদের লোকেদের কি কি হয়েছিল, ও সেই দেশের লোকেদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। যে দেশের মধ্যে দিয়ে গ্যাঞ্জেস নদীর দুই প্রধান শাখা পূর্ব সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে সেই দেশকে বাঙ্গালা রাজ্য বলা হয়। এই খান থেকে জলরাশি পিছনে হটে গিয়ে সেই বিশাল উপসাগর তৈরি করছে যাকে ভৌগলিকরা গাঙ্গেয় বলেন আর আমরা এখন বঙ্গোপসাগর বলি। এই দুই শাখার মোহনার মধ্যে দুটি বড় নদী একটি পূর্ব থেকে আর অন্যটি পশ্চিম থেকে এসে পড়েছে। এই দুটি নদীই এদেশের দুই সীমানা। এদের মধ্যে একটিকে আমাদের লোকেরা চাটিগাঁয়ের নদী বলে। এই নদীটি গ্যাঞ্জেসের পূর্ব দিকের মোহনায় এই নামের শহরের কাছে পড়েছে। এই (চাটিগাঁও) শহরটিই এই রাজ্যের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ আর সম্পদশালী শহর, কারণ এখানকার বন্দরেই পূর্ব দেশের সমস্ত বাণিজ্য সম্ভার এসে পৌঁছয়। অন্য নদীটি গ্যাঞ্জেসের পশ্চিম শাখায় গিয়ে পড়ে। এই নদীটি যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে

সাতিগাম [Satigam, সাতগাঁ] শহর। এটিও বেশ বড় জায়গা তবে এখানে জাহাজ যাওয়া আসার অত সুবিধা নেই বলে জাহাজ চলাচল কিছু কম। চাটিগাঁয়ের নদী আভা [Ava] ও ভাগারু [Vagaru] রাজ্যের পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। এটি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়েছে। এর এক পারে বাঙ্গালার রাজ্য আর অন্য পারে খুদা-বখ্‌শ খানের [Codavascam] রাজ্য। এই নদীর ধারেই তিপোরা [Tipora] ও ব্রেম-লিম্ম [Brema-Limma] রাজ্য। এই দুই রাজ্য বাঙ্গালাকে পূর্ব দিক দিয়ে ঘিরে আছে। পাহাড় গুলি পূর্ব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে বাঙ্গালাকে পাটনা [Patanes] দেশ থেকে, আর নীচে দক্ষিণে গিয়ে উড়িষ্যা দেশ থেকে পৃথক করে। অর্থাৎ বাঙ্গালার সমতলভূমি, পাহাড়গুলি এবং গ্যাঞ্জেসের মধ্যে পড়ে। অন্য নদী (কাঁসাই ?) যেটি সাতিগাঁয়ের কাছে গ্যাঞ্জেসে পড়ে সেটি উড়িষ্যা দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। এর উৎপত্তি স্থান কে গাটে [gate, ঘাট ?] বলে। জায়গাটি চৌলের [chaul] কাছাকাছি। এই নদীটিও বৃহৎ ও বহুদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যায় বলে এ দেশের লোকেরা গ্যাঞ্জেসের নকলে অর্থাৎ যেখানে এই নদীটি এসে পড়েছে সেই নদীর নকলে একেও গঙ্গা বলে। আর এর জলকেও গঙ্গার জলের মত পবিত্র মনে করে। এই ভাবে বাঙ্গালা রাজ্য সমুদ্রের উত্তর দিকে ও এই দুই নদীর মধ্যে অবস্থিত। গ্যাঞ্জেসের দুই শাখা এই দেশের মধ্যে দিয়ে গ্রীক অক্ষর ডেলটার আকারে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। যে সব বড় নদীর অনেকগুলি মুখ তারাও এই ভাবে সমুদ্রে মেশে।

পূর্ব দিকের মুখের দ্বীপ সমূহ

Tranquetia, Sundiva, Ingudia, Mularangue, Guacala, Tipuria, Bulnei, Sornagam, Angara, Merculiz, Noldiz Cupitavaz, Pacuculij Agrapara,

খুদাবক্স খানের এলাকা : ইনি একজন মুসলমান রাজা। এঁর বিশাল রাজত্ব বাঙ্গালা ও আরাকানের মধ্যে অবস্থিত।

বাঙালীরা এই রাজ্য তিপোরাকে নিজেদের রাজ্যের (দেশের) মধ্যেই ধরে। তবে এই জায়গাগুলি বেশী পাহাড়ী আর এখানকার সর্দাররা বেশ শক্তিশালী, তাই এরা বাঙ্গালার রাজার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর যেমন দুই পাশাপাশি রাজ্যের মধ্যে সাধারণতঃ হয় বাঙালী আর তিপোরা বাসীদের মধ্যে ঘৃণা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আছে। দুই দেশের লোকই ভাবে যে তারা একে অন্যের চেয়ে বড়। তাই তিপোরা বাসীরা কু [cou, কুচবিহার (?)] রাজ্যের লোকেদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে। এই রাজ্য বাঙ্গালার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন।

(এর পরে লেখক বলেছেন যে যদিও এই দুই পাহাড়ী রাজ্যে সৈন্য আর অশ্বের অভাব নেই তবু বাঙ্গালার মুসলমানরা তাদের সামরিক নিয়মশৃঙ্খলা ও কামানের সাহায্যে কি ভাবে এদের জয় করেছে।)

ভারতের প্রধান রাজ্যগুলি সম্বন্ধে এই সব কথা প্রচলিত আছে : বাঙ্গালা তার অসংখ্য পাদাতিকের জন্য প্রসিদ্ধ

উড়িষ্যা তার হাতির জন্য

বিসনগা তার সুকৌশলী ঢাল তলোয়ারওয়ালা সৈন্যদের জন্য

দেলিজ তার নগর আর গ্রামের জন্য

কু তার অশ্বের জন্য

তাই তাদের নাম

এসপতিজ [অশ্বপতি] = কু [কুচবিহার]

গসপতিজ [গজপতি] = উড়িষ্যা

নোরোপতিজ [নরপতি] = বাঙ্গালা

বুয়াপতিজ [ভূমিপতি] = দিল্লী

কোয়া (বা সোয়া ?) পতিজ [সর্বপতি] = বিজয়নগর

এই রাজ্যের প্রধান শহর গৌড় ; এটি গঙ্গার ধারে অবস্থিত। শহরটি প্রায় তিন লিগ লম্বা আর এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা দু লক্ষ। এই শহর এক দিকে নদীর দ্বারা রক্ষিত। এখানকার আর বাঙ্গালা রাজ্যের বাণিজ্য এত বেশি ছিল যে পাটনার (patanes) লোকেরা অধিকার করে নেবার আগে (গুজরাতের) সুলতান বাহাদুর শাহ [Solthan Badur] বলতেন যে তিনি নিজে এক, নরসিঙ্গার (বিজয় নগরের) রাজা দুই, আর বাঙ্গালার রাজা তিন। অর্থাৎ বাঙ্গালার রাজা একাই তাঁর ও নরসিঙ্গার রাজা এই দুজনের সমান।

[সমাপ্ত]

সিজার ফ্রেডারিক

সীজার ফ্রেডারিকের [Caesar Frederick] বিবরণ। এই বিবরণ প্রকাশিত হয় 'পারচাজ হিজ পিলগ্রিমস' [Purchas His Pilgrims] গ্রন্থের দশম খণ্ডে।

আমি সীজার ফ্রেডারিক ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিস শহরে ছিলাম। পৃথিবীর পূর্ব দিকের দেশগুলি দেখতে আমি ভেনিস থেকে অ্যালেপ্পো রওনা হই।...

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। উড়িষ্যা থেকে আমি বাংলার [Bengala] ছোট বন্দরের (হুগলি) দিকে রওনা হই। উড়িষ্যা থেকে এই জায়গা ১৭০ মাইল। সমুদ্রের ধার বরাবর চুয়ান্ন মাইল দাঁড় টেনে যেতে হয়। আর তারপর আমরা গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করি। নদীর মুখ থেকে সাতগাঁ [Satagan] শহর, যেখানে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য নিয়ে জড়ো হয়, ১০০ মাইল দূর। জোয়ারের সময় এই পথ দাঁড় টেনে যেতে আঠার ঘণ্টা লাগে। এই নদীতেও টেমস নদীর মত জোয়ার ভাটা হয়। ভাটার সময় দাঁড় টেনে যাওয়া যায় না; জলের বেগ এত বেশি যে হালকা আর অনেক দাঁড়ের নৌকাও তখন যেতে পারে না। তাই যতক্ষণ না আবার জোয়ার আসছে নৌকাগুলিকে তীরের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়। এই নৌকাগুলিকে এরা বজরা [Bazaras] আর পটুয়া [Patua, Patela (?)] বলে। এরা দাঁড় টানে প্রায় (দ্রুতগামী নৌকা) গালিয়টের [galliot] মত। আমি এর চেয়ে জোরে দাঁড় টানতে কোথাও দেখিনি। সাতগাঁ পেঁছবার প্রায় এক জোয়ার আগে বেতোড় [Buttor] বলে একটি জায়গা। এর পর আর জাহাজ যেতে পারে না, কারণ এর পর নদী অগভীর, আর নদীতে জল খুব কম। এরা প্রতি বছর বেতোড়ে একটি গাঁ বানায়। গাঁয়ের বাড়ী আর দোকান খড় আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে বানানো হয়। যত দিন জাহাজগুলি বেতোড়ে থাকে ততদিন এই গাঁ থাকে। জাহাজগুলি ইণ্ডিজে [গোয়া বা মালাক্কা] চলে গেলে লোকেরা নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার এই ব্যাপার দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছিল। যখন আমি সাতগাঁর দিকে যাই তখন আমি এই গাঁটিকে দেখেছিলাম। তখন এখানে বহু লোকজন আর নদীতে অজস্র জাহাজ আর বজরা। ফেরবার সময় আমার দেরি হয় কারণ আমি শেষ জাহাজের ক্যাপ্টেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন দেখে অবাক লাগল যে গাঁটিকে তারই মধ্যে পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোড়া বাড়ীর চিহ্ন ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

ছোট জাহাজগুলি সাতগাঁ অবধি যায়। সাতগাঁ বন্দরে ছোট বড় মিলিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশটি জাহাজের মাল বোঝাই করা হয়। এই সব পণ্যের মধ্যে আছে চাল, নানা রকম সুতী [bombast] কাপড়, গালা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, শুকনো বা আচার করা আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি, লঙ্কা, তিলের তেল [oyle of zerzeline] ও অন্যান্য বহু জিনিস। সাতগাঁ মুসলমানদের শহর হিসেবে বেশ বড় শহর। সব জিনিসই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাটনার রাজা এই দেশ শাসন করেন। তিনি এখন মহা মুঘলের অধীন। এই রাজ্যে আমি চার মাস ছিলাম। অনেক ব্যবসায়ী নৌকা ভাড়া করে, কিংবা কিনে,

সাতগাঁ থেকে যে সব পণ্য রপ্তানি করা হয়

উজানে বা ভাটায় গঙ্গার উপর ঘুরে বেড়ান, আর সস্তায় জিনিস পত্র কেনেন। কারণ সপ্তাহের প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও হাট বসে। আমিও এই রকম একটা নৌকা ভাড়া করে নদীতে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের কাজ কর্ম করতাম। এই সময় আমি কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখি। বাংলার রাজ্য অতীত কালে মূর (মুসলমানদের) অধীন ছিল। তা সত্ত্বেও এখানে বহু ধর্মহীন [gentiles] বাস করে। আমি যেখানে ধর্মহীনদের কথা বলছি সেখানে বুঝতে হবে আমি মূর্তিপূজকদের কথা বলছি। তেমনি মূর বলতে আমি মুসলমান সম্প্রদায়ের [Mahomet sect] কথা বলেছি। ঐ সব লোকেরা, বিশেষ করে, যারা দেশের অভ্যন্তরে বাস করে তারা গঙ্গা নদীকে খুব ভক্তি করে। কারু অসুখ করলে তাকে তার দেশ থেকে গঙ্গার তীরে নিয়ে আসা হয়, আর একটা খড়ের ঘর বানিয়ে তাকে রাখা হয়। গঙ্গার জল দিয়ে সেই অসুস্থ লোককে প্রতিদিন ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এতে অনেকের মৃত্যু হয়। মারা গেলে পর ডালপালা দিয়ে একটা ঢিপি বানিয়ে, তার উপর শবকে রেখে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না শব আধপোড়া হয় ততক্ষণ তারা এমনি ভাবেই ফেলে রাখে, আর তারপর শবকে আগুন থেকে বার করে গলায় একটা শূন্য কলসি বেঁধে জলে ফেলে দেয়। অন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমি যখন নদীতে দুমাস আনাগোনা করে হাটে জিনিস কিনতাম তখন প্রতি রাত্রে আমি এই সব দেখেছি। আর এই জন্যই পোর্তুগালের লোকেরা গঙ্গার জল খায় না। কিন্তু দেখতে এই জল নীল নদের জলের চেয়ে অনেক পরিষ্কার।

ছোট বন্দর (হুগলি) থেকে আমি কোচিন যাই, আর সেখান থেকে মালাক্কা। মালাক্কা থেকে তারপর আটশ মাইল দূরে পেগুর জন্য রওনা হই।

(সীজার ফ্রেডারিক এর দু বছর পরে আর একবার বাঙ্গালা দেশে আসেন। এবারে তিনি শুধু চাটগাঁতে যান।)

সন্দীপের অধিবাসী সবাই মুসলমান। এখানকার মুসলমান রাজা খুব ভাল লোক। আমরা সন্দীপ থেকে চাটগাঁ রওনা হই। চাটগাঁ বাংলার বড় বন্দর। এই সময় পোর্তু-গীজরা এই নগরের শাসকদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে ফেলেছিল। শান্তির একটি শর্ত এই ছিল যে তাদের প্রধান ক্যাপ্টেন (বন্দর থেকে) আর মাল না তুলে তাঁর জাহাজ নিয়ে চলে যাবেন। এই সময় সেখানে ছোট বড় আঠারটি পোর্তুগীজ জাহাজ ছিল। এই ক্যাপ্টেন বিশেষ সাহসী আর ভদ্রলোক ছিলেন। তাই নিজের অনেক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, আর ইণ্ডিজে যাবার নিরাপদ সময় শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর এখানকার বন্ধুদের বিপদে না ফেলে চলে যেতে রাজি হলেন। যাত্রার আগের দিন রাত্রে অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনরা নিজেদের মাল প্রধানের জাহাজে তুলে দিলেন, যাতে তাঁর ভদ্রতার জন্য তাঁর যা ক্ষতি হচ্ছিল তার কিছুটা পূরণ হয়। এই সময় প্রতিবেশী রাজ্য রাকিম [Rachim, আরাকান] থেকে এক সংবাদ বাহক এসে ক্যাপ্টেনকে তার রাজার তরফ থেকে বলল যে ক্যাপ্টেন যেন তাদের বন্দরে যান, যেখানে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হবে। ক্যাপ্টেন সেই দেশে গিয়ে রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হ'ন।

[সমাপ্ত]

র‍্যাল্‌ফ ফিচ্

[Ralph Fitch] (১৫৮৩-১৫৯১)

ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইংরেজ বণিকদের ভারতের বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি যায়। সেই সময় সমুদ্রপথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য পোর্তুগীজরা প্রায় একচেটে করে রেখেছিল। অন্য কোন দেশের লোক ভারতের সঙ্গে এই পথে বাণিজ্য করতে চাইলে পোর্তুগীজরা তাদের বাধা দিত। ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের পোর্তুগীজদের সঙ্গে শত্রুতা করবার ইচ্ছা ছিল না। পোর্তুগাল তখন স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্‌সের অধীন। তাঁকে ঘাঁটাবার সাহস এলিজাবেথের তখন ছিল না। তাই তখন স্থলপথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করা যায় কিনা এই বিষয়ে খোঁজ খবর নেবার কথা ভাবা হয়। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদা তুলে একটি দলকে এই উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। দলের অধিকাংশ লোককে বলা হয় যে তাঁরা যেন পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি ঘুরে দেখেন। দলের শুধু দুজনকে ভারতবর্ষ অবধি যেতে বলা হয়। এঁদের নাম নিউবেরী আর ফিচ। ভারত সম্রাট আকবর আর চীনের সম্রাটের নামে একটি করে চিঠি এলিজাবেথ তাঁদের হাতে দেন।

১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দল পারস্য উপসাগরের অরমুস [Ormus, Hormuz] বন্দরে এসে পৌঁছায়। সেখানে তাদের পোর্তুগালের রাজার শত্রু বলে সন্দেহ করে বন্দী করা হয় ও গোয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এপ্রিল ১৫৮৪তে নিউবেরী আর ফিচ গোয়া থেকে পালাতে সমর্থ হন। ফিচ আগ্রাতে ও তারপর সেখান থেকে নতুন রাজধানী ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে চলে আসেন। তারপর তিনি বাঙ্গালা দেশের দিকে যাত্রা করেন। কিছুদিন বাঙ্গালা দেশের নানা জায়গায় থেকে ফিচ বর্মা, মালাক্কা প্রভৃতি দেশে যান। ফেরবার পথে তিনি আবার বাঙ্গালাদেশে এসে এখানে থেকে সমুদ্র পথে কোচিন হয়ে দেশে ফিরে যান। দেশে গিয়ে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। বর্তমান অনুবাদ শুধু তার বাঙ্গালা দেশে ভ্রমণের বিবরণ থেকে করা।

ফিচের ভ্রমণ কাহিনী হাকলিউটের *Principall Navigations* পুস্তকে প্রকাশিত হয়। পরে এটি উইলিয়ম ফস্টারের সম্পাদিত *Early Travels in India* গ্রন্থে ১৯২১ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়।

"পাটনা (Patanaw) থেকে আমি গৌড়দেশের টাণ্ডা [গৌড় নগর শেষ হয়ে যাবার পর মালদা জেলার টাণ্ডা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। টাণ্ডার সঠিক অবস্থান জানা নাই।] যাত্রা করলাম। আগে এই দেশ একটি আলাদা রাজ্য ছিল, কিন্তু এখন দেশটি জলালুদ্দীন আকবরের (Zelabdin Echebar) অধীন। এদেশের প্রধান পণ্য হল তুলা আর সুতী কাপড়। এখানকার লোক প্রায় নগ্নই থাকে, এদের কোমরে শুধু একটু কাপড় জড়ানো। টাণ্ডা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে। এখানে অনেক বাঘ, জংলী মহিষ, আর প্রচুর জংলী মুরগী। এ দেশের লোক ঘোরতর মূর্তি পূজক। টাণ্ডা শহর গঙ্গা নদী থেকে এক লিগ দূরে। অতীত কালে একবার বর্ষার সময় গঙ্গা নদী বন্যায় তীর ছাপিয়ে অনেক গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আর নদী তখন সেই পথেই থেকে যায়। গঙ্গার পুরানো পথ

এখন শুকনো পড়ে আছে, তাই এই শহর নদী থেকে এতো দূরে। আগ্রা থেকে প্রথমে যমুনা পরে, গঙ্গা হয়ে বাঙ্গালা পৌঁছতে আমার পাঁচ মাস লেগেছিল; অবশ্য ইচ্ছা করলে অনেক কম সময়ের মধ্যেই এখানে আসা যায়।

বাঙ্গালা দেশ থেকে আমি কোচদের [Couche] দেশে যাই। টাণ্ডা থেকে এই জায়গা ২৫ দিনের পথ। এখানকার রাজা ধর্মহীন [gentile]। তাঁর নাম স্থকেল কৌন্‌স [Suckel Counse, শুক্ল কোচ? শুক্ল ধ্বজ? তবে শুক্ল ধ্বজ ফিচ কুচবিহারে যাবার কয়েক বছর আগেই মারা যান]। তাঁর দেশ বিশাল, আর কোচিন-চীন (Couchin-China) থেকে বেশি দূরে নয়, কারণ সেই দেশ থেকে এরা গোলমরিচ আনায়। (ফিচ, মনে হয়, এখানে কিছু গোলমাল করেছেন।) এদের বন্দরের নাম কচ্ছি-ঘাট (Cacchegate, বোধহয় আলিপুর দুয়ারের কাছে চেছাকাটা তালুক।) সারা দেশ বাঁশ আর বেতের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এগুলির দুই দিক ধারালো করে চেঁছে নিয়ে এক দিক মাটিতে পোঁতা হয়। বেড়ার মধ্যে দিয়ে জল এসে জমি হাঁটু অবধি ডুবিয়ে দেয়, তাই মানুষ বা ঘোড়া কেউই তখন এদেশে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধের সময় এরা সব জলে বিষ মিশিয়ে দেয়। এখানে রেশম আর কস্তুরি প্রচুর পাওয়া যায়, আর সুতী কাপড়ও। এখানকার লোকেদের কান অদ্ভুত রকম লম্বা, প্রায় এক বিঘত। কম বয়স থেকেই টেনে এগুলি লম্বা করা হয়। এরা সকলেই ধর্মহীন। কোন জন্তুকে এরা মারেনা। ভেড়া, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, পাখী আর সব রকম জীব জন্তুর জন্য এদের হাসপাতাল আছে। জন্তুরা বৃদ্ধ বা পঙ্গু হয়ে গেলে তাদের এখানে এনে রাখা হয়। যদি কেউ কোন জন্তু কিনে বা ধরে এখানে আনে, তাহলে এরা সেগুলি টাকা বা অন্য কোন দ্রব্য দিয়ে কিনে নেয়, আর সেই জন্তুকে হাসপাতালে রাখে বা ছেড়ে দেয়। এরা পিঁপড়েদের খেতে দেয়। এদের ছোট মুদ্রা হল বাদাম। বাদামগুলি এরা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করে।

এখান থেকে হুগলি ফিরে আসি। হুগলি বাঙ্গালাদেশে পোর্তুগীজদের একটি ঘাঁটি। এটি ২৩ ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত, আর সাতগাঁ থেকে এক লিগ দূরে। হুগলিকে ওরা পোর্তো পিকেনো [Porto piqueno, ছোট বন্দর] বলে। আমরা জঙ্গলের পথে গিয়েছিলাম, কারণ সোজা পথে ভীষণ চোরের উপদ্রব। আমরা গৌরেন [Gauren, গৌড়?] দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। পথে গ্রাম প্রায় নেই, সবই প্রায় জঙ্গল। আমার এখানে অনেক মহিষ, শুয়োর, হরিণ, আর বহু বাঘ দেখি। ঘাস এখানে মানুষের চেয়ে লম্বা। পোর্তো পিকেনো থেকে কাছেই উড়িষ্যা দেশের আঙ্গেলি (হিজলি) নামে পোতাশ্রয়। এককালে এটি একটি আলাদা রাজ্য ছিল, আর এখানকার রাজা বিদেশীদের বন্ধু ছিলেন। পরে প্রতিবেশী পাঠান রাজা এই দেশ অধিকার করেন। তবে বেশি দিন তিনি এই রাজ্য ভোগ করেননি। কারণ তারপর আগ্রা, দিল্লী ও ক্যাম্বের রাজা জালালুদ্দীন আকবর এই দেশে অধিকার করেন। উড়িষ্যা সাতগাঁ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ছয় দিনের পথ। এদেশে খুব ধান হয়, আর সুতী কাপড়ও প্রচুর হয়। তাছাড়া একরকম ঘাস থেকে এখানে প্রচুর পরিমাণে কাপড় তৈরি হয়। এই

ঘাসের নাম ইয়েরুয়া [yerua] ; আর এই কাপড় রেশমের মত। এরা এই কাপড় বেশ ভাল বানায়, আর পোর্তুগীজ ভারতে ও অন্য জায়গায় রপ্তানি করে। হিজলি পোতাশ্রয়তে পোর্তুগীজ ভারত, নেগাপটম, সুমাত্রা, মালাক্কা ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রতি বছর অনেক জাহাজ আসে, আর এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি, লঙ্কা, মাখন (ঘি ?) ও অন্যান্য খাদ্য নিয়ে পোর্তুগীজ ভারতে যায়। মুসলমানদের শহর হিসাবে সাতগাঁ বেশ বড় শহর, আর সব রকম জিনিস এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে প্রতিদিনই কোথাও বড় বড় বাজার বসে। এই বাজারের নাম চান্দু [chandeau]। পারগো (purgo) নামে এক রকম বড় বড় নৌকা করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে এরা চাল আর অন্যান্য জিনিস কেনে। এই নৌকাগুলির দাঁড়ীর সংখ্যা ২৪ বা ২৬। নৌকাতে অনেক মাল ধরে তবে এগুলি ঢাকা নয় এখানকার বিধর্মীরা গঙ্গা জলকে খুব শ্রদ্ধা করে। আর নিকটে ভাল জল থাকলেও বহুদূর থেকে গঙ্গাজল নিয়ে আসে। খাবার জন্য যদি পর্যাপ্ত গঙ্গাজল না থাকে, তাহলে এই জল গায়ে একটু ছিটিয়ে নিলেই এরা নিজেকে বেশ ভাল মনে করে। সাতগাঁ থেকে আমি তিপারার [Tippara] রাজার দেশ বা বড় বন্দর (পোর্তো গ্রান্দে, চাটগাঁ) যাত্রা করি। এদের সঙ্গে মগেদের [Mogores or Mogen] সমানেই যুদ্ধ লেগে আছে। মগরা আরাকান (রেকন) ও রামে [Rame, বর্তমান রামু (Ramu) গাঁয়ের আশপাশের এলাকা] দেশের রাজা আর তিপারার রাজার চেয়ে অধিক শক্তিশালী বলে চাটিগাঁ [chatigan] বা বড় বন্দর প্রায়ই আরাকানের রাজার অধিকারে থাকে।

পূর্ববর্ণিত কোচ বা কুইচু (Quicheu) রাজ্য থেকে চার দিনের পথে একটি রাজ্য আছে। তার নাম ভুটান [Bottanter]। নগরের নাম বোটিয়া [Bottia] আর রাজাকে তারা দারমেন [Darmain] বলে। এই দেশের লোক খুব লম্বা ও বলিষ্ঠ। এখানে চীন দেশ থেকে আগত সওদাগরেরা আছে। অনেকে বলে যে মাস্কোভিয়া [Muscovia] আর টার্টারী থেকেও সওদাগররা এখানে আসে। এখানে তারা কস্তুরী, কম্বল, অ্যাগেট পাথর, রেশম, মরিচ আর পারস্যের জাফরানের মত জাফরান কিনতে আসে। দেশটি বিশাল, একদিক থেকে অন্যদিক যেতে তিন মাস লাগে। এখানে খুব উঁচু উঁচু পাহাড়, আর কয়েকটি এত উঁচু যে ছয় দিনের পথ থেকেও এদের দেখা যায়। এই পাহাড়গুলিতে এমন সব লোক থাকে যাদের কান এক বিঘত (span) লম্বা ; যাদের কান লম্বা নয় তাদের এরা বন-মানুষ (apes) বলে। এদেশের লোকে বলে যে তারা পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে জাহাজ আসা যাওয়া দেখতে পায়, তবে এই জাহাজ কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায়, তা তারা জানে না। এখানে যে সব সওদাগরেরা পুব দিকে সূর্যের নীচে থেকে, অর্থাৎ চীন দেশ থেকে আসে তাদের দাড়ি নেই, আর তাদের দেশে নাকি বেশ গরম। কিন্তু যারা পাহাড়ের ওপার থেকে আসে তারা বলে যে তাদের দেশে খুব ঠাণ্ডা। এই উত্তর দেশের সওদাগরেরা পশমের কাপড়, হ্যাট, সাদা লম্বা মোজা আর বুট জুতা পরে। এই জুতা নাকি মাসকোভিয়া বা টার্টারী দেশের। তারা বলে যে তাদের দেশের ঘোড়া খুব ভাল, তবে ছোট। কিছু

লোকের চার, পাঁচ বা ছয় শ ঘোড়া আর গরু আছে। তারা দুধ আর মাংস খায়। তাদের দেশের গরুর ল্যাজ কেটে চড়া দামে বিক্রি করা হয়। এই ল্যাজের খুব চাহিদা সে দেশে এই গুলির খুব কদর। ল্যাজের চুল এক গজের চেয়ে বেশি লম্বা আর গরুর রাঙের চেয়ে এক বিঘত বেশি। এগুলি তারা হাতির মাথায় ঝুলিয়ে সাজিয়ে দেয়। চীন আর পেগুতেও এগুলি খুব ব্যবহার হয়। এগুলি এরা কুড়িটা করে গোছা করে বেচে। লোকেরা এখানে খুব দ্রুত হাঁটে।

বাংলা দেশের চাটিগাঁও থেকে আমি বাকোলাতে [Bacola] আসি। এখানকার রাজা ধর্মহীন। লোকটি ভদ্র আর বন্দুক ছুড়তে ভালবাসেন। তাঁর রাজ্য বিশাল আর সুফলা। তাঁর ধান, সুতী আর রেশমী কাপড়ের বড় বড় ভাণ্ডার আছে। এখানকার বাড়ি গুলি সুন্দর উঁচু, আর রাস্তাগুলিও বেশ বড়। লোকেরা কোমরে একটু কাপড় জড়িয়ে রাখে, বাকি শরীর নগ্ন। মেয়েরা গলায় আর হাতে অনেকগুলি করে রূপার হার আর চুড়ি পায়ে। পায়ে তাদের রূপার বা তামার মল আর হাতির দাতের আংটি।

বাকোলা থেকে আমি সিরিপুর যাই। এটি গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। রাজার নাম চাঁদ রায় [Chondery] কাছাকাছি সব দেশের লোকেরা জালালুদ্দীন আকবরের বিরোধী। এদেশে এত নদী আর দ্বীপ যে লোকে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে পালিয়ে যায়, আর আকবরের ঘোড়সোয়াররা তাদের কিছুই করতে পারে না। এখানে প্রচুর পরিমাণে সুতী কাপড় তৈরি হয়।

সোনার গাঁও [Sinner gan] সিরিপুর থেকে ছয় লিগ দূরে। ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে ভাল আর আর মিহি কাপড় এইখানে তৈরি হয়। এই সব দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশাখান (Isacan)। তিনি অন্য সব রাজাদের প্রধান, আর খ্রীষ্টানদের বিশেষ বন্ধু। ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গার মত এই দেশের বাড়িগুলিও খুব ছোট। বাড়িগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া, আর দেওয়াল বলতে চারদিকে কতকগুলি মাদুর ঝোলানো। আর বাঘ শিয়াল ঠেকানোর জন্য দরজাও তাই। অনেকেই বেশ ধনী। এখানে এরা কোন রকম মাংস খায় না। আর পশুবধও করে না। এরা ভাত, দুধ আর ফল খেয়ে থাকে। সামনে সামান্য একটু কাপড় ছাড়া এদের শরীর নগ্ন। এখন বহু পরিমাণে সুতী কাপড়, আর অনেক চাল ভারতবর্ষের অন্য জায়গায়, সিংহলে [Ceilon] পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও অন্যান্য বহু জায়গায় যায়।

সিরিপুর (Serrepore) থেকে ২৮শে নভেম্বর ১৫৮৬ আমি অ্যালবার্ট কারা-ভেলোস (Albert Caravallos) বলে একজনের একটি ছোট জাহাজে পেগু যাত্রা করি গঙ্গা বেয়ে নেমে এসে, সন্দীপের (Sundiva) আর বড় বন্দরের বা তিপারা দেশের পাশ দিয়ে গিয়ে, আরাকান আর মগ রাজ্যকে বাঁ দিকে ছেড়ে, উত্তর পশ্চিমের সুবাতাসে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে পেগুর কাছে নেগ্রাইসের (Negrais) বারে (bar) গিয়ে পৌছলাম…বাঙালা থেকে পেগু নব্বই লিগ দূরে।

জেস্থইট মিশনারিদের চিঠি

বাংলা, আরাকান ও বর্মা থেকে জেস্থইট মিশনারিদের চিঠি (১৫৯৯-১৬০০) [Jesuit Letters from Bengal, Arakan and Burma (1599-1600)]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে জেস্থইট ও অগষ্টিনীয় এই দুই সম্প্রদায়ের মিশনারিরা বাঙ্গালা দেশে আসতে আরম্ভ করেন। অগষ্টিনীয়রা নিজেদের কাজ কর্ম সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দিতেন কিনা জানা নেই। জেস্থইটরা কিন্তু গোড়ার দিকে নিজেদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে বেশ লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন। তবে ১৬১০ এর পর তাঁদের পাঠানো চিঠি বা রিপোর্ট বিশেষ পাওয়া যায় না।

জেস্থইটদের চিঠিতে দক্ষিণ বঙ্গের অবস্থা ও বিশেষ করে বার ভুঁইয়াদের কয়েকজনের কথা খানিকটা জানা যায়। এই বার ভুঁইয়াদের মধ্যে একজন ছিলেন চাঁদেকানের রাজা। জেস্থইটরা এই রাজার নাম বলেন নি। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "এই রাজা যে প্রতাপাদিত্য সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বাকলার রাজা (রামচন্দ্র) ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আট বৎসরের শিশু এবং চাঁদেকানের রাজার জামাতা বলিয়া বর্ণিত, এবং বাকলা হইতে চাঁদেকান আসিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শেষোক্ত রাজ্য সুন্দরবন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারেনা।" (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৫৫, পৃঃ ২১৮। "প্রবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

চিঠিগুলি ফাদার হোস্টেন [H. Hosten, S. J.], *Bengal Past and Present* পত্রিকাতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করেন।

গোয়া, ১লা ডিসেম্বর ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। এর পর বাঙ্গালা দেশের মিশনের কথা। এই মিশনের জন্ম সম্বন্ধে আমি আপনাদের গত বছর লিখেছিলাম। এখন আমি এই মিশনের প্রগতি সম্বন্ধে আরও কিছু লিখছি। সেখানকার ফাদাররা ঐ দেশ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ পাঠিয়েছেন, আর ঐ মিশনের সাফল্য সম্পর্কে (এখন) আরও কিছু আশা করা যেতে পারে।

২. বাঙ্গালা (Bengala) অতি বিরাট দেশ; সব দিকেই এই দেশ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। পুব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতট বরাবর প্রায় ছয় শ মাইল লম্বা। এই দেশের আদি আর আসল অধিবাসী হ'ল তারা যাদের আমরা বাঙ্গালা (Bangalas) বলি। এদের ধার্মিক আচরণ অনেকটা হীদেনদের (heathen, ধর্মহীন) মত। এই দেশের কিছু মুসলমান পাঠান (Patanes) একবার বিদ্রোহ করেছিল, তবে এই অন্যায় ভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতা তারা বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি। মোঙ্গোল বা মোগোর (Mongols or Mogores) বলে যে জাতি বাঙ্গালা দেশের সীমানার কাছে থাকে, তারা এই পাঠানদের রাজা আর সর্দারদের মেরে বা তাড়িয়ে দিয়ে এই রাজ্য দখল করে নিয়েছিল। বার জন রাজা, যাদের ভুঁইয়া (Boyones) বলে, তারা এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তারা এখানে বারটি প্রদেশে শাসন করে। এরা সব এক জোট হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, আর এই ঐক্যের জন্যই এখনও তারা নিজেদের রাজ্য ভোগ করছে। খুব ধনী আর সৈন্য সংখ্যা প্রচুর বলে এরা নিজেদের রাজা বলে মনে করে। এদের মধ্যে

প্রধান হল সিরিপুরের রাজা যাকে কেদার রায় ও [Cadaray] বলে, চাঁদেকানের রাজা, আর বিশেষ করে মসন্দোলিন [Masondolin, নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজর-পুরের ভুঁইয়া ঈশা খানের উপাধি ছিল মসনদ-ই-অলি।]। পাঠানরা এখন এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে এই সব ভুঁইয়াদের প্রজা হয়ে গেছে। অবশ্য এই বার জন ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে মাত্র তিন জন হিন্দু (gentiles)। এরা হল চাঁদেকান, সিরিপুর আর বাকলার [Bacala] রাজা। অন্তরা মুসলমান বলে তাদের দেশের লোকেদের খ্রীষ্টান করতে অনেক বেশি বাধা। মগেরা বাঙালীদের প্রতিবেশী। তাদের রাজাকে চাঁদেকানের [চাটিগ্রামের হবে] রাজা বলা হয়, তবে বাঙ্গালার কিছু কিছু অংশ এই রাজার অধীন। বাংলার মধ্যে যে সব পোর্তুগীজরা থাকে তাদের বসতিগুলিকে বান্দেল [bandeles] বলা হয়। এদের মধ্যে কতকগুলিকে রাজা জমি ও সম্পত্তি দিয়েছেন। এই পোর্তুগীজরা বেশ ধনী ও শক্তিশালী। মাঝে মাঝে একজন পাদরি (priest) গিয়ে তাদের ধর্মোপদেশ দেন (administers them the sacraments) তবে এই পাদরিকে ঐ পোর্তুগীজদের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয় বলে, তাদের কথামতই এঁকে চলতে হয়। এখন অবধি হিন্দুদের মধ্যে থেকে খ্রীষ্টান হবার ঘটনা বিরল। তবে এই সব বসতিতে কিছু নব খ্রীষ্টান আছে। পোর্তুগীজরা এদের অন্য জায়গা থেকে এনেছে। এদের মধ্যে কিছু লোক পোর্তুগীজদের উপর নির্ভরশীল বা তাদের অনুচর বলে খ্রীষ্টান হয়েছে। ভাল ধর্মোপদেশ যে এদের কত বেশি দরকার তা এদের দেখলেই বোঝা যায়।

৩. দেশটি বিশাল আর উর্বর। সমুদ্রের দিকে যেখানে গঙ্গা গিয়ে পড়েছে, সেখানে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ। তাদের মধ্যে দিয়ে যে সব নদী গিয়েছে তাদের গঙ্গা বলা হয়, কারণ লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এগুলি গঙ্গারই শাখা। এদের উৎপত্তির স্থানগুলি নদী বেয়ে আট দশ দিন গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। ছোট বন্দরের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তার উৎপত্তি স্থল জানা যায়নি। [হুগলি নদীকে এখানে গঙ্গার মূল ধারা বলে ধরা হয়েছে। ছোট বন্দর, porto pequeno, বোধ হয় আগে সাতগাঁকে বলা হ'ত, আর পরে হুগলিবন্দরকে বলা হত।] এই সব গঙ্গায় জোয়ার বা ভাটার সময় জাহাজ নিয়ে চলাচল করা যায়। স্রোত বিপরিত হলে, স্রোত ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে হয়। জাহাজগুলি খুব জোরে যায়। এদের অনেকগুলি মিওপারোসের (myopa-ros, জলদস্যুদের নৌকা) মত তৈরি। সব চেয়ে বেশি ব্যবহার হয় জালিয়া (jalea) নৌকার। এগুলি এক একটি গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানান। জালিয়াতে ত্রিশ জন করে দাঁড়ী বসে। মাল নিয়ে যাবার জাহাজকে বাউরিন (baurine) বলে। এতে দাঁড়ীর সংখ্যা জালিয়ার চেয়ে কম। জোয়ারের সময় এগুলি বাতাসের চেয়েও বেগে চলে। আমাদের দেশের কোন জাহাজই এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। এই সব নদীতে নৌকা চলাচলের বিপদ তিনটি। প্রথম হ'ল ডাকাত। এরা জাহাজ আক্রমণ ক'রে, যাত্রীদের সর্বস্ব লুটে নিয়ে তাদের মেরে ফেলে। তার পর হ'ল কুমীর। এরা যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না। তৃতীয় হ'ল বাঘ। বাঘেরা মানুষের মাংস খেতে এত ভালবাসে

যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এমন বাঘও আছে যারা ষাট মাইল অবধি জাহাজের অনুসরণ করে, আর কেউ জাহাজ থেকে নামলে তাকে খেয়ে ফেলে। রাত্রে তারা নাবিকদের আক্রমণ করে, আর এক বারে পনর কুড়ি জনকে মেরে ফেলে। একবার একজন এদেশী লোকের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা প্রায় অবিশ্বাস্য গল্প। ফাদারদের আসবার বেশি আগের ঘটনা এটি নয়। একজন পোর্তুগীজ আর তার এদেশী চাকর একটি বড় জাহাজে করে যাচ্ছিল। এক রাত্রে সেই চাকর স্বপ্ন দেখে যে একটা বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। পরের রাত্রে সে ভয় পেয়ে তার মনিবের খাটের তলায় লুকিয়ে থাকে। মনিব তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করাতে সে তার স্বপ্নের কথা বলে। গল্প শুনে সেই পোর্তুগীজ তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। সে বেচারা তখন জাহাজের সামনের দিকে একটা জায়গা খুঁজে নেয়। কিছুক্ষণ পরেই পাশের বন থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে আসে। জাহাজ তখন তীরে বাঁধা ছিল। বাঘটা জাহাজে উঠে প্রায় ত্রিশ জন লোককে ডিঙিয়ে ঐ লোকটাকে ধরে নিজের পিঠে ফেলে জঙ্গলে নিয়ে যায়। এক বার এক জন লোককে একটা বাঘ জঙ্গলের দিক থেকে, আর একটা কুমীর জলের দিক থেকে আক্রমণ করেছিল। বাঘটা ব্যস্ত হয়ে এত জোরে লাফিয়েছিল যে মানুষটাকে পেরিয়ে, তার মাথা জাহাজেব ধারে লেগে সে সোজা কুমীরের মুখে পড়ে। এই ভাবে সেই লোকটা দুই দিকের বিপদ থেকে এক সঙ্গে বেঁচে যায়।

৪. বাঙ্গালীরা বাঘকে এত ভয় পায় যে বাঘের নাম মুখে আনেনা, পাছে নাম করলে বাঘ তাদের খেয়ে ফেলে। কিন্তু, ঈশ্বরের কী মহিমা, প্রকৃতি এরও একটা উপায় করেছে। পেবা (peva) বলে ছোট কুকুরের আকারের একটি জন্তু আছে। এরা বাঘ দেখলেই ডাকতে আরম্ভ করে। এমনি করে এরা সমস্ত পশু পক্ষীদের সাবধান করে দেয়। তার পর এরা এমন ভাবে বাঘের পিছনে লেগে থাকে যে বাঘ কদিন পরে না খেতে পেয়ে মারা যায়। একটা বাঘ মরলেই তারা অন্য বাঘের খোঁজে থাকে, আর তাকেও এমনি ভাবে মেরে ফেলে।

৫. আবার নিজেদের কথায় ফিরে আসা যাক। যেমন আমি আপনাদের আগেই লিখেছি, ফ্রানসিস ফারনান্দেজ (Francis Fernandez), দোমিনিক সোসা (Dominic Sosa), মেলচিওর ফোনসেকা (Melchior Fonseca), আর জন এনড্রু বোভেস (John Andrew Boves) (এই কজন) পাদরিকে বাঙ্গালা দেশে এই জন্য পাঠানো হয়েছিল যে তাঁরা এই দেশে সুসমাচার প্রচারের পথ প্রস্তুত করে দেবেন, আর যে সব পোর্তুগীজরা এই দেশে বাস করছেন তাদের ধর্মোপদেশ দেবেন ও তাদের জন্য মাস [Mass] পালন করবেন। ঈশ্বরের অপার কৃপা যে গোড়া থেকেই আমাদের সোসাইটির সদস্যরা বাঙ্গালা দেশের রাজাদের সদিচ্ছা লাভ করতে পেরেছিলেন। আর এই রাজারা স্বেচ্ছায় তাঁদের ঘর, আর বাড়ী বানাবার, ঈশ্বরের ধর্ম প্রচারের, আর এই সব দেশের যে লোকেরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হতে চায় তাদের খ্রীষ্টান বানাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই পাদরিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামত জায়গায় পাকাপাকি থাকবার বন্দোবস্ত করে নেন। দুজন করে এই বাস-

স্থানে থাকবেন, আর দুজন ধর্ম প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াবেন। ঈশ্বর যদি আরও সাহায্যকারী পাঠান, তাহলে আরও বাসস্থান বানাতে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ এখানকার পোর্তুগীজরা ধার্মিক, হিন্দুরাও খুব ব্যগ্র, আর সকলেরই আমাদের সম্প্রদায় (order) সম্বন্ধে ভাল ধারণা। এই সব জিনিস বিশদ ভাবে বোঝাবার জন্য পাদরিরা নিজেরা এই বিষয় কি লিখেছেন তাই বলছি। দুটি চিঠির নকল দিলাম :

ফাদার ফ্রানসিস ফারনানদেজের চিঠি, দিয়াঙ্গা থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা।

"গত বছর জাহাজগুলি চলে যায় তখন ফাদার দোমিনিক সোসা আর আমি দিয়াঙ্গাতেই থেকে যাই। (দিয়াঙ্গা চাটগাঁর কয়েক মাইল দক্ষিণে কর্ণফুলির উপর একটি বন্দর।) এই দেশের মাস্টার (Master) আর ক্যাপ্টেনের [Captain] নাম মানোএল দে মাতোস [Manoel de Matos]। তিনি চাটিগাঁ (Chatigan) বন্দরে থাকেন। এখানে ইণ্ডিয়া (গোয়া, কোচিন, প্রভৃতি) থেকে জাহাজ আসে। আমাদের এখানে বেশ কিছুদিন আটকে থাকতে হয়েছিল, কারণ দুবছর এখানে কোন কনফেসর (confessor) আসেন নি। তাই দেশীও পোর্তুগীজ দুই জাতেরই অনেকের পাপস্বীকারোক্তি দেবার ছিল। অনেকেই তাই পবিত্র ইউকেরিস্ট গ্রহণ করতে আর স্বীকারোক্তি দিতে আসত। এই কাজের জন্য কেউ আসেনি এমন একদিনও যেতনা। তবে এখানে কোন গির্জা ঘর ছিল না বলে আমরা নিজেদের বাড়ীতেই একটা বেদী বানিয়ে নিয়েছিলাম। অবশেষে আমাদের পরামর্শে একটা গির্জা ঘর বানানো হয়েছে। এইটিকেই এখন আমরা ব্যবহার করি। আমরা থাকতে অনেকে ধর্মের পথে ফিরে এসেছে, বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এটা একটা চমৎকার ঘটনা বলতে হবে। অনেকে তাদের বাড়ীতে পাপের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে, কারণ অনেকেই এখানে বিয়ে না করে, অবৈধ ভাবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। আমাদের প্রধান সাফল্য হ'ল এই পুরানো খ্রীষ্টানদের উদ্ধার করা। আমাদের এত বেশি স্বীকারোক্তি শুনতে হ'ত যে লেন্ট [Lent] আরম্ভ হবার আগে অবধি আমরা সবাইকে শুনতে পারিনি। আমি সিরিপুরের লোকেদের কথা দিয়েছিলাম যে লেন্টের সময় আমি তাদের ধর্মোপদেশ দেব। তাই আমি সেখানে চলে গেলাম। ফাদার দোমিনিক সোসাকে দিয়াঙ্গাতে ছেড়ে গেলাম। কারণ সেখান থেকে তখন অনেকে পেগুর বন্দরগুলিতে যাচ্ছিল। (হোস্টেন লিখেছেন যে, এই পোর্তুগীজরা পেগুর বিরুদ্ধে আরাকানের রাজাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিল।) তাদের মধ্যে যত জনের সম্ভব কনফেসন নিতে পারেন তার জন্য দিয়াঙ্গাতে একজন পাদরির থাকা দরকার ছিল। লেন্টের রবিবার আর শুক্রবারে আমি ঠিক যেমন গোয়াতে হয় তেমনি ভাবে প্রভুর প্যাশন (যীশুর ক্রুশের উপর যন্ত্রণা) সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ দিতাম। বাঙালীদের কাছে এটি একটি নতুন আর অসাধারণ জিনিস। তাই এই উপদেশে তাদের মধ্যে একটা অভাবনীয় প্রভাব হ'ত। শোভাযাত্রাকে আরও বাড়াবার জন্য প্রথমে এক লাইন প্রায়শ্চিত্তকারীদের [disciplinants] দেওয়া হ'ত, আর তারপর ছেলেমেয়েরা সাদা পোশাক [surplices] পরে চলত। ধর্মোপদেশে ব্যস্ত

থাকলেও আমাকে কনফেসন শোনবার জন্য সময় দিতে হত। অন্য অনেকের ছাড়া আমাকে বসতির প্রধানদেরও কনফেসন শুনতে হ'ত। এদের মধ্যে একজন ধর্মোপদেশ শুনে এসে তার একজন উত্তমর্ণকে ছোট একটা ধার শোধ দেয়। আমি সারা বর্ষাকাল (winter) সিরিপুরে এমনি সফল ভাবে কাটাই। হিন্দুদের মধ্যে আমি কোন সাফল্য লাভ করতে পারি নি। এক তো দেশটি (এই বিষয়ে) অনুর্বর, আর তাছাড়া আমি একলা ছিলাম আর বাংলা ভাষা জানতাম না। একজন ধনী মুসলমান সওদাগরকে পোর্তুগীজরা মেরে ফেলেছিল। তাঁর স্ত্রী বুদ্ধিমতী আর গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। তিনি দোভাষীর সাহায্যে কয়েকবার সত্য ধর্মের উপদেশ শোনবার পর ব্যাপতিজম গ্রহণ করেন। একজন লোক অন্যায় ভাবে একজন সচ্চরিত্র আর উচ্চবংশের ছেলেকে তার বাপের দেনার জন্য দাস বানাবার চেষ্টা করছিল। আমি ঠিক সময় ছেলেটিকে সাহায্য করি, ও তাকে খ্রীষ্টান ধর্মের শিক্ষা দিই। সে খুব তাড়াতাড়ি সেটা মুখস্থ করে ফেলে আর যে উপদেশ সে লেণ্টের সময় শিখতে আরম্ভ করেছিল সেই উপদেশ সে ঈস্টরের মধ্যে নিজেই চাকরদের শিখিয়ে দিতে আরম্ভ করে দেয়, আর মাস (Mass) এর সময় সে পুরোহিতদের সাহায্য করতে আরম্ভ করে। একবার একটি ছেলে রাস্তায় প্রায় শেষ অবস্থায় পড়ে আছে শুনে আমি তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী এনে ব্যাপতিজম দিই, আর তার আত্মা তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যায়।

৭. যেমন আমি আগেই বলেছি ফাদার দোমিনিক সোসা এক পক্ষকাল দিয়াঙ্গাতে থেকে যান। সেই সময় তাঁকে এত বেশি কনফেসন শুনতে হ'ত যে তিনি খাবার সময় অবধি পেতেন না। তিনি সেখানে ঈশ্বরের মহিমার জন্য অনেক কিছু করেন। কেউ কেউ হিংসা [hatred] ছেড়ে দেয়। অনেকে যে সব পাপ কাজে জড়িয়ে ছিল তাই ছেড়ে দেয়। কিছু লোক বৈধভাবে বিবাহ করে নেয়। ইতিমধ্যে আমি চাঁদেকান থেকে চিঠিতে আর লোক মারফত খবর পাই যে সেখানকার ক্ষুদ্র (petty) রাজা আমাদের ফিরে আসা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন। আমি তাই ফাদার দোমিনিক সোসাকে সেখানে পাঠাতে বাধ্য হই। তাঁর যাওয়াতে সেখানকার পোর্তুগীজরা খুব খুশি হয়। তারা ভেবেছিল যে ফাদার বুঝি আসবেন না। তিনি পৌছিয়েই ধর্মোপদেশ দেওয়া আরম্ভ করে দেন, আর তাদের কনফেসনের জন্য তৈরি হতে বলেন। তারা সযত্নে তাই করে,আর তিনি লেণ্টের যে দু সপ্তাহ বাকি ছিল তার মধ্যেই সবাইকার কনফেসন শুনে নেন। পবিত্র সপ্তাহের কাজ তিনি এত সুচারু ভাবে করেছিলেন যে সকলেরই চোখ সজল হয়ে যেত, আর প্রায়ই গির্জাঘরের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস আর কান্নার শব্দ পাওয়া যেত। তবে ঈষ্টরের সময় পুনর্জীবনের আনন্দ উৎসবে তাদের সব শোক শেষ হয়ে যায়। চাঁদেকানের পাঠানরা সেখানকার পোর্তুগীজ প্রধানকে মেরে ফেলেছিল। সেখানকার রাজা [petty king] তাকে প্রিফেক্টের [prefect] উপাধি দিয়েছিলেন। রাজা সেই পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি ফাদারকে দেবার আদেশ দেন, কিন্তু ফাদার তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। খুনের জন্য ফাদার তাঁর উপর রেগে আছেন ভেবে রাজা ফাদারকে ডেকে পাঠান আর তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে মৃতের প্রভুত

সম্পত্তি যেন চার্চ গ্রহণ করেন। ফাদার তখন তাকে স্পষ্ট বলেন যে আমাদের নিয়ম অনুসারে আমরা অন্যের সম্পত্তি নিতে পারি না। এই কথায় রাজা তাঁকে অনেক প্রশংসা করেন, আর তারপর তাঁকে সেই সম্পত্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কারণ তিনি বলেন যে ফাদারের অনুমতি ছাড়া তিনি কিছুই করবেন না। আমাদের সম্বন্ধে তাঁর এই ভাল ধারণার কারণ এই যে তিনি জানতেন যে আমরা সব সময় সত্য কথা বলি, আর তাঁর কাছে কিছুই চাই না, আর কারু অনিষ্ট কামনা করি না। আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে তিনি সকলের মুখেই আমাদের সোসাইটির সততার প্রশংসা শুনতে পান। রাজা তারপর ফাদারকে গির্জা আর বাড়ি বানাবার জন্য আর একটি জমি দেন। এই জমিটা আগেরটার চেয়ে নিরাপদ, কারণ আগেরটা একজন পাঠানের দখলে ছিল। এ ছাড়া তিনি মজুর আর কারিগর পাঠিয়েও সাহায্য করেছিলেন। পোর্তুগীজদের মামলা তিনি ফাদারদের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফাদারদের সঙ্গে তিনি একান্তে কথা বলতেন; অন্যদের সাথে তিনি খোলা জায়গায় সকলের সঙ্গে এক সাথে কথা বলতেন।

৮. মে (১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের) মাসে ফাদার দোমিনিক সোসা গোলিন (উগোলিম, হুগলি) যাত্রা করেন। পথে ডাকাতরা তীর ছুঁড়ে তাঁদের জাহাজকে আক্রমণ করে, তবে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বেঁচে যান। রাজার কাছ থেকে তিনি বিদায় গ্রহণ না করেই ফিরে গিয়েছিলেন বলে রাজার মনে ভয় ছিল যে তিনি হয়তো ফিরবেন না। তাই যখন তিনি ফিরে এলেন রাজা খুব খুশি হন আর ফাদারের সঙ্গে সখ্যতা বাড়াতে ইচ্ছা করেন। পাঠানদের বিরুদ্ধে পোর্তুগীজদের যে নালিশ ছিল তা ফাদার রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁকে বলেন। চাঁদেকানের পাঠানরা পোর্তুগীজদের দেখতে পারতো না আর তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। ফাদার রাজাকে এই সব কথা আর অন্য জরুরী কথা বললেন। রাজা তাঁকে বললেন যে তিনি ফাদারের বন্ধুত্ব এই জন্যই চান যে তাঁর পরামর্শ মত তিনি যাতে এই সব দোষ নিবারণ করতে পারেন। আর রাজা সত্যই তাই করতেন।

৯. এপ্রিল (১৫৯৯ খ্রী:) মাসে আমি কাটাব্রো [Catabro, কাটরাবো,] যাই। এটা মসোন্দোলিন (ঈশা খান) রাজার রাজত্বে। এখানে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করা যায় কিনা দেখতে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে সবাই মুসলমান। তাছাড়া এখানে ব্যবসার জন্য আকবরের রাজত্বে আগ্রা আর লাহোরে প্রায়ই যায়। এরা বেশ চালাক আর খুব নিজেদের বিদ্যা জাহির করতে চায়। একবার অনেক লোকের মাঝখানে এদের সঙ্গে আমার খ্রীষ্টান নিয়ম আর আচরণ নিয়ে আলোচনা হয়। এদের মধ্যে একজন বড়াই করে বলে যে হিন্দুদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে পুরানো। সে ভেবেছিল যে এই এক তর্কেই সে আমাকে হারিয়ে দেবে। আমি বললাম যে তার কথা ভুল, আর আমাদের ধর্মই বেশি প্রাচীন, কারণ আদম আর ঈভ যাঁরা মনুষ্য জাতির আদি তাঁরাও ঠিক এই ধর্মেই চলতেন যা আমরা মানি। আর সেই সুযোগে আমি বুক অব উইজডমে [Book of wisdom] মূর্তি পূজার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও স্পষ্ট

বুঝিয়ে দিলাম। আমার জবাব শুনে তারা একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল, আর বুঝতে পারল যে আর কোন কথা বলা নিরর্থক। পৃথিবীতে লোকে এতো অবুঝ হয়, এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। হেরে গিয়েও, আর আমাদের ধর্ম যে সত্য আর ভালো তা মেনে নিয়েও তারা নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে থেকে খুশি থাকে।

১০. "অক্টোবর (১৫৯৯ খ্রীঃ) মাসে ফাদার ডোমিনিক সোসা আমাকে লেখেন যে রাজার সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাকা করে নেবার জন্ত আমাকে চাঁদেকান যেতেই হবে। একটা সুযোগ পাওয়া গেছে; তার পুরো উপযোগ করে না নিলে পরে আবার অসুবিধা হতে পারে। ইণ্ডিয়া থেকে আগন্তুক ফাদারদের বাসস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে আমি দিয়াঙ্গার জন্ত তখন রওনা হচ্ছিলাম। তবু দুটো কাজেরই সময় পাব ভেবে আমি চাঁদেকান রওনা হলাম। ছ মাস পরে আবার দেখা হওয়াতে আমরা যে কি খুশি হয়েছিলাম তা আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না। রাজা আমরা আসাতে কত খুশি হয়েছেন, আর তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান এই কথা জানাবার জন্য আমরা পেঁ ছবা মাত্রই তার প্রধান ব্রাহ্মণকে (Brachman) আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। পরদিন আমি ফাদার সোসাকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে একান্তে অনেক কথা বললেন। আর তারপর বলতে আরম্ভ করলেন যে তাঁদের ধর্ম আর আমাদের ধর্ম এক। তিনি ফাদার দোমিনিক সোসার কাছে আমাদের ধর্মের বিধানগুলি শুনেছেন, আর তাঁর মনে হয় যে এগুলি তাঁর ধর্মের মতই। তাতে আমি জবাব দিলাম যে এ কথা হতেই পারেনা, কারণ দুই ধর্মে আকাশ পাতাল তফাত। তিনি তখন ফাদারকে দেশী ভাষায় বিধানগুলি (commandments) বলতে বললেন। ফাদার বলতে আরম্ভ করলে আমি রাজাকে প্রথম বিধানেই ধরলাম যে আমাদের ধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসনা করার কথা আছে, আর ওঁরা অনেক দেবতার পূজা করেন। রাজা বললেন যে সত্য ঈশ্বর একই, আর অন্তরা হলেন ঈশ্বরের পরিবার পরিজন, আমাদের যেমন সেণ্টরা। আমি বললাম যে আমরা সেণ্টদের ভক্তি ও (adore) করি না, আর তাদের পূজাও দিই না, আর হিন্দুরা কোন প্রভেদ না করে সবাইকে পূজা করে। এই থেকেই প্রমাণ হয় যে তারা অনেক দেবতাকে মানে। আর এই বিশ্বাস আমাদের ধর্মের একেবারেই বিপরীত। আমার কথা শুনে রাজা ঘাবড়ে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে দিলেন।

আমি তাঁর ছেলে অর্থাৎ রাজপুত্রকে ডাকতে বললাম। (লোকেরা) তাকে ডেকে নিয়ে এলো। বছর বারোর ছেলে; খুব বুদ্ধিমান দেখতে। তাকে তার বাপের সামনে অনেক প্রশংসা করার পর আমি রাজাকে বললাম যে আমাদের সনদে যেন তাঁর ছেলে দস্তখত করে। আমরা যে তার বাপকে অনুরোধ করে এই সনদ লাভ করেছি তা ছেলে রাজত্ব পেলে তাকে দেখাব। রাজা আমাদের কথা শুনে খুশি হলেন, আর ছেলেকে সই করতে বললেন। সে তখন স্নান করে ফেলেছিল, আর ওদের ধর্মে তখন এই কাজ করতে নেই। তবুও সে খুশি হয়ে সই করতে রাজি হল। (স্থানীয়) পোর্তুগীজদের মতে কাজটা এই ভাবে করাতে আমরা আমাদের জমির ও গির্জার সম্পত্তি পাকাপাকি ভাবে পাব। আমি পুরো মাস চাঁদেকান ছিলাম, আর রাজা আমার প্রতি সব সময়ই

সদয় থাকতেন। ফাদার দোমিনিক সোসাকেও তিনি এখনও তেমনিই সম্মান করেন। সম্প্রতি ফাদারের চিঠি থেকে জানতে পেরেছি যে ফাদার একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সেদিন সময় দিতে পারেন নি। তবে পরদিন তিনি গির্জাতে এসে বলেছিলেন যে অন্য কাজের জন্য সেদিন সময় দিতে না পারার জন্য তিনি দুঃখিত।

১১ চাঁদেকান থেকে ফেরার পর আমাকে অনেক খাটতে হয়েছিল, আর কয়েকবার আমি ডাকাতদের মুখেও পড়েছিলাম ; তবে ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে গেছি। তারপর দশ-দিন যদিও আমি ঘুমানো ছাড়া কিছুই করিনি, তবু অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করে-ছিলাম। সিরিপুরে ফেরবার পর আমি ফাদার মেলচিওর ফোনসেকা [Melchior Fonseca] আর ফাদার এনড্রু বোভেসের [Andrew Boves] কাছ থেকে চিঠি পাই। তাঁরা দিয়াঙ্গা পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে যাবার জন্য রওনা হচ্ছিলাম ; এমন সময় আমি এক কঠিন ও কষ্টকর রোগে পড়ি। তখন লোকে আমার জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। খবর পেয়ে তাঁরা আমার কাছে ছুটে আসেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি এতো ভাল বোধ করেছিলাম যে আমি তখনই তাঁদের সঙ্গে আমাদের এই দিয়াঙ্গার বাসাতে চলে আসি। এক মাস আমার শরীর খুব ভাল ছিল না। কখনও বা জ্বর ছেড়ে যেত, আর পরে কিছু দিন ছেড়ে ছেড়ে আবার আসত। এখন মনে হয় আমি ভাল আছি, তবে এখন আমার স্বাস্থ্য বৃদ্ধদের মত, শরীরে পুরো জোর কখনই পাই না। আমরা যখন দিয়াঙ্গাতে আসি তখন মানোয়েল দ্য মাতোস [Manoel de Matos] আর অন্য পোর্তুগীজরা আরাকানের রাজার কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সেই রাজা তখন পেগু আক্রমণ করে ফিরেছেন। চাটিগাঁও [Chati-gan] বন্দর তাঁর রাজত্বের মধ্যে হলেও তিনি এই বন্দর প্রায় পোর্তুগীজদের দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সব কাজ কারবার রাজার সঙ্গে ঠিক করে নেবার জন্য তারা আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল। আমার শরীর খারাপ থাকার দরুণ আমি জেরোম মন্তীরো [Jerome Monteiro] নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করি যে তিনি যেন এই কাজটা করে দেন। তিনি রাজার বন্ধু, আর তা ছাড়া আমাদের সোসাইটিকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি কাজটা করতে রাজি হন। আমিও রাজাকে একটা চিঠি লিখে দিই। আমার চিঠি পেয়ে, আর জেরোম মন্তীরো ও অন্যান্য পোর্তুগীজদের কাছে আমাদের কথা শুনে রাজা খুব খুশি হ'ন, আর আমাদের এই কথা লিখে পাঠান :

১২. "জেসুইট সোসাইটির ফাদারদের উদ্দেশে আরাকান, তিপারা, চাকোমা [chacoma] ও বাঙ্গালা রাজ্যের রাজা ও পেগু প্রভৃতি রাজ্যের মালিকের পত্র। আপনাদের চিঠি পেয়ে খুব সুখী হয়েছি। চিঠিতে ঈশ্বরেরর প্রতি আপনাদের ভক্তিভাব দেখে, আর মানোয়েল দ্য মাতোস ও জোরোম মন্তীরো আপনাদের গুণাবলী সম্বন্ধে যে সব কথা আমাকে বলেছেন তাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। পোর্তুগীজদের কাজ কারবার এখানে গির্জা বানাবার বন্দোবস্ত ও যারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হতে চায় তাদের ধর্মান্তর করণের ব্যাপার ইত্যাদি নিয়ে সব কথাবার্তা ঠিক করে ফেলার জন্য আপনারা

যদি এখানে আসেন তাহলে আমি বিশেষ সুখী হব। আমি এর জন্য অর্থ ও অন্য সাহায্যও করব। আরাকানের রাজার সীল অনুযায়ী।"

১৩. তিনি তখনই গির্জা আর খ্রীষ্টান অধিবাসীদের বাড়ি বানাবার জন্য একটি উপযুক্ত জমি পরিষ্কার করবার আদেশ দিলেন। যাঁরা এই সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাঁরা বললেন যে এই সনদের জন্য রাজা আমাদের চাটগাঁ বন্দরে আর আরাকান শহরে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা দিতে বাধ্য। তাই আমি ফাদার এনড্রু বোভেসের সঙ্গে ঠিক করলাম যে আমি তখনই সেখানে গিয়ে সব কিছু দেখে শুনে, আর ঈশ্বরের যা কিছু প্রিয় তার ব্যবস্থা করে ফিরে আসব।

১৪. দিয়াঙ্গার বাসাতে নেমেই ফাদার মেলচিওর ফনসেকা আপনাদের আজ্ঞা মত চাঁদেকান যাত্রা করলেন। সেখানকার পোর্তুগীজরা অনেকদিন থেকে চাইছিলেন যে ফাদাররা ওখানে আসেন। তাছাড়া ওখানকার পোর্তুগীজ আর নব-খ্রীষ্টানরা বহুদিন প্রায়শ্চিত্ত করেননি। তাই তাঁরা ফাদারকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রাজা তাঁকে নিম্নলিখিত সনদ দেন :

১৫. "আমি বাকালার রাজা, যে সব ফাদাররা সম্প্রতি বাঙ্গালায় এসেছেন তাঁদের এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের আমার রাজ্যে গির্জা বানাবার অনুমতি দিচ্ছি। তাঁরা সত্যধর্ম প্রচার করতে পারবেন, আর যারা স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টান হতে চায়, তাদের খ্রীষ্টান বানাতে পারবেন। ধর্মান্তরিত হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে না। আমি বরং তাদের উপর সর্বদা সদয় থাকব। আর আমার রাজ্যে যে সব সর্দার আর সামন্তরা আছেন, তাঁরাও এই সব খ্রীষ্টানদের প্রতি সদয় থাকবেন। কেউ যদি অন্যথা করে তবে ফাদাররা নালিশ করলেই আমি তাকে শাস্তি দেব।"

১৬. "ফাদার মেলচিওর ফনসেকার এক চিঠিতে জানলাম যে চাঁদেকানের রাজা তাঁর খুব আদর যত্ন করছেন। আর তাঁর আসাতে ওখানকার অধিবাসীরা খুব খুশি হয়েছে। ওখানকার অবস্থা বেশ ভালই। বাড়ি প্রায় ছাদ অবধি তৈরি হয়ে গেছে। গির্জা বাড়ি ওঁরা সবকমসিসনের ফীস্টের আগে তৈরি করে ফেলতে চান যাতে সেদিনকার মাস (Mass) ওখানেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। আপনাদের আজ্ঞা মত আমি এই গির্জাটিকে যীশুর মহাপবিত্র নামে উৎসর্গ করব। এই নামে এটা বাংলার প্রথম গির্জা হবে। এখন শুধু আপনার কাছে প্রার্থনা যে উৎসবাদি পালন করবার জন্য কিছু সাহায্যকারী পাঠিয়ে দিন, যাতে ঈশ্বরের কাজ ভাল ভাবে সারা প্রদেশের মধ্যে চলে, আর ঈশ্বরের মহিমা সমুন্নত হয়।"—এই অবধি ফাদার ফারনানদেজের চিঠি।

১৭. ফনসেকা চাঁদেকান থেকে ২০শে জানুয়ারী, ১৬০০ সালে জানিয়েছেন :

"চাটগাঁ থেকে রওনা হবার আগে আমি আপনাদের তখন অবধি যা কিছু ঘটনা আমার মনে ছিল সব জানিয়েছিলাম। এর পর আমি চাঁদেকানের সব ঘটনার কথা লিখব। এখন এখানে আমি আর ফাদার দোমিনিক সোসা আছি। আমরা বাংলার মিশন সম্বন্ধে বেশ সন্তুষ্ট আছি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের শ্রম সফল হবে। এখনই তার কিছু আভাস দেখা যাচ্ছে। আশাকরি এটা আপনি সুখবর বলে মনে করবেন।"

১৮. আমি চাটিগাঁ থেকে রওনা হই নভেম্বর মাসে। পথে কিছু ঘুরে আমি বাকালা হয়ে আসি। ওখানকার পোর্তুগীজরা দুবছরের উপর কোন যাজকের সাহায্য পায়নি। তাই তারা আমাকে ওখানে যেতে বলেছিল। ফাদার ফ্রান্‌সিস ফারনান্‌দেজ আমাকে এখানে না এসে আরাকান যেতে বলেছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে আমি যেতে পারি নি। মনে হয় এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে, কারণ এই সুযোগে আমি বাকালাতে একটা বাসা বানাতে আরম্ভ করি। আমি পৌঁছবা মাত্রই সেখানকার রাজা আমাকে ডেকে পাঠান। রাজা আট বৎসরের বালক মাত্র; কিন্তু বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আমি সব পোর্তুগীজদের নিয়ে রাজার কাছে যাই—তারা সব খুশি হয়েই আমার সঙ্গে গিয়েছিল। প্রাসাদে পৌঁছবামাত্রই রাজা লোক পাঠিয়ে দুবার খবর দেন যে তিনি আর সভাসদরা কেল্লাগুলির অধিপতিদের সঙ্গে আমার জন্য একটি বড় বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। আমি পৌঁছতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে প্রধান জায়গাটিতে এই গরীব ফাদার আর অন্য পোর্তুগীজদের জন্য একটি বড় কার্পেট বিছানো ছিল। যথা বিহিত নমস্কার বিনিময়ের পর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম যে আমি চাঁদেকানের রাজার কাছে যাচ্ছি। শুনেছি তিনিই এই বাকালার রাজার শ্বশুর হবেন। তবে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি তাঁর রাজ্যে এসে পড়েছি, তখন আমি তাঁকে সম্মান দেখাতে চাই আর অনুরোধ করতে চাই যে তিনি যেন তাঁর রাজত্বে ফাদারদের আমন্ত্রণ করেন ও তাঁদের তাঁর রাজত্বে গির্জা বানাবার আর একমাত্র ঈশ্বরের জ্ঞান প্রচারের অনুমতি দেন। তিনি খুব খুশি হয়ে আমার কথা মেনে নিলেন, এমনকি এ বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখালেন। আমাদের বিষয়ে শুনে আমাদের সম্বন্ধে ওঁর ভাল ধারণা হয়েছে। এরপরে আমি পোর্তুগীজদের প্রয়োজনের দিকে নজর দিলাম। অনেকের কনফেশন শুনলাম, তাদের পবিত্র ইউকেরিস্ট স্যাক্রামেণ্ট দিলাম, আর কিছু লোককে ব্যাপটাইজ করলাম। তারপর আমি আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম। পোর্তুগীজরা অবশ্য আমাকে ছাড়তে চাইছিলনা। তারা বলছিল যে আমি যেন ওখানেই থেকে যাই। আমি ওদের এই বলে শান্ত করলাম যে ফাদার ফ্রানসিস্ ফারনান্দেজ লেণ্টের [Lent] সময় ওখানে আসবেন, আর এই বছরের শেষে আপনি ওদের ধর্মজীবনের জন্য কিছু ফাদারকে পাঠিয়ে দেবেন।

১৯. "বাকালা থেকে চাঁদেকানের পথ খুব সুন্দর। সমস্ত পথে মিষ্ট জলে ভর্তি গভীর নদী। এক দিকে গভীর জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে খালি জায়গা। সেখানে গরু চড়ছে। অন্য দিকে যতদূর দেখা যায় ধানে ভর্তি খেত। আমরা নদীগুলিতে নৌকা করে যাচ্ছিলাম। দুপাশেই গভীর জঙ্গল সূর্যের কিরণ তা ভেদ করতে পারে না। গাছের ডাল থেকে অজস্র মৌমাছির চাক ঝুলছে, আর কোথাও বা বাঁদরেরা এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফাচ্ছে। কোথাও কোথাও আখের খেত। তবে বাঘ আর মানুষ খেকো কুমীরও আছে।"

২০. আমি চাঁদেকান পৌঁছই ২০শে নভেম্বর ১৫৯৯ সালে। ফাদার দোমিনিক সোসা ও অন্য পোর্তুগীজরা সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁদের বেশি আনন্দের

কারণ এই যে আমার আসাটা ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁরা ভেবেছিলেন যে আমি আরাকান চলে গেছি। পরদিন আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর জন্য আমি কিছু বিরিঙ্গী লেবু এনেছিলাম। পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। আমার উপহার পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, কারণ এই ফল এদেশে পাওয়া যায় না। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, আর কয়েকবার সেটি উচ্চারণ করলেন। তিনি যে আমার নাম মনে করে রাখতে চান, তাঁর এই স্নেহ দেখে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন। আমরা গেলেই উনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার করেন। যখন আমরা চলে আসি তখনও উনি তাই করেন। আমাদের তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, তার কারণ মনে হয় এই যে তিনি আমাদের ব্রহ্মচর্যের কথা লোক মুখে শুনে থাকেন। আর ব্রহ্মচর্যকে এদেশে পরম শ্রদ্ধা করা হয়। তাঁর কাছে আমরা আমাদের বাসার কাছে খানিকটা জমি চাইলাম, যাতে নব দীক্ষিতেরা গির্জার কাছাকাছি থাকতে পারে। তিনি সহজেই এই কথা মঞ্জুর করলেন, এবং আমাদের জমির সনদ দিলেন, আর হুকুম দিলেন যে ওখানে যে সব হিন্দুরা থাকে তারা রাজাকে যে কর দেয় তা যেন এখন থেকে ফাদারদের দেয়। ফাদার ফ্রানসিস ফারনান্দেজের কাছে শুনেছিলাম যে আপনার ইচ্ছা যে বাংলার প্রথম গির্জা যেন যীশুর মহাপবিত্র নামে উৎসর্গ করা হয়, তাই আমরা গির্জা বাড়িকে প্রাণপণে চেষ্টা করে সেইদিনই (১লা জানুয়ারী, যীশুর সুন্নতের দিন।) শেষ করেছিলাম।

২১. গির্জা বাড়িটি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছিল বলে, আর অর্থাভাবের জন্য যতটা চেয়েছিলাম তেমন হয়নি, তাহলেও এতে জায়গা আছে অনেক আর দেখতেও (মোটামুটি) সুন্দর। আর আমরা একে নানা রকম দামী পর্দা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। এই কাজে পোর্তুগীজরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল। সত্য বলতে কি, এরা আমাদের খুব ভালবাসে, আর বলে যে আমাদের এখানে আসা ওদের পক্ষে একটা আশীর্বাদ। আমাদের অধিকার অনুসারে আমরা জুবিলি বছর আরম্ভ করি। [১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ জুবিলি (Jubilee) বছর ছিল]। যত লোককে পারি প্রায়শ্চিত্ত আর ইউকেরিস্ট উপাসনা করাই। যথা সম্ভব, বিধি অনুসারে আমরা এই উৎসব পালন করেছিলাম। তার কারণ একতো এটা বাঙ্গালায় প্রথম (জুবিলি) উৎসব, আর তাছাড়া এই দেখে ধর্মহীনরাও (pagan হিন্দু) বুঝবে যে তারা কি দুর্দশায় রয়েছে।

২২. আগের দিন সন্ধ্যে বেলা আর উৎসবের দিন সকালে, আমরা চারিদিকে বাতি দিয়েছিলাম আর কামানের আওয়াজ করেছিলাম। সেন্ট টমাসের উৎসবের দিন সন্ধ্যে বেলা, যে দিন আমরা প্রথম গোরস্থানে ক্রস লাগাই সেদিনও এমনিই করেছিলাম রাজা খবর পাঠিয়েছিলেন যে আমরা যেন নতুন জমিতে তাঁর আগে প্রবেশ না করি, কারণ তিনি চাইছিলেন যে তিনি নিজে এসে আমাদের জমির মালিকানা দান করবেন। উৎসবের দিন সন্ধ্যে বেলা তিনি নিজের বাড়ির সব ভদ্রলোকদের নিয়ে খ্রীষ্টানদের বসতিতে এলেন। এটা জলপথে চার ঘন্টার পথ। এসেই তিনি ফাদাররা কোথায়

আছেন, জিজ্ঞাসা করলেন। ফাদাররা গির্জাঘর সাজাচ্ছেন শুনে তিনি তখনই সেখানে চলে এলেন। তিনি নৌকা থেকে নামতেই আমরা গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে খুব খুশি হলেন। আর ভদ্রতার খাতিরে আমরা যেমন সামনে পথ দেখিয়ে চললাম তিনিও আমাদের পিছু পিছু গির্জাতে এলেন। গির্জাতে তিনি খুব শ্রদ্ধা সহকারে আর জুতা খুলে ঢুকলেন, আর মাদুরের এক পাশে বসলেন। চেয়ারে বা কার্পেটে বসতে কিছুতেই রাজি হলেন না। বেদীতে যা কিছু হচ্ছিল তিনি তার সব কিছুর অর্থ জিজ্ঞাসা করছিলেন। এই সুঅবসর পেয়ে আমরা তাই ঈশ্বরের চর্চা করলাম। তিনি তাঁর দাড়িতে হাত দিয়ে শপথ করলেন যে তিনি এমন একটি গির্জা বানাবেন যা বাংলা দেশে যত গির্জা তৈরি হবে তার চেয়ে সুন্দর হবে। দেখা যাক তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেন কিনা। পরদিন, রাজপুত্র গির্জা আর তার সাজসজ্জা দেখতে এলেন, আর দেখে তিনি তাঁর পিতার মতই খুশি হলেন। বলতে ভুলে গেছি যে ওঁর পিতার চলে যাবার পর তিনি বাড়িটি দেখতে চেয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়, তাঁর অনুরোধে আমরা আগে আগে চলি, আর তিনি আমাদের পিছনে চলেন। বিদায় নেবার সময় তিনি পোর্তুগীজ যারা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা আর কি চাও? আমি তো আগেই পাদরী হয়ে গেছি"। এই প্রেম-পূর্ণ কথায় আমরা সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে কাজ যেমন আরম্ভ হয়েছে, পরিণামেও তাই হবে। ষোল দিন ধরে রোজ সব বয়সের আর সব অবস্থার অসংখ্য লোক গির্জা দেখতে এসেছিল। এখানকার হাজার হাজার হিন্দুদের (pagan) মধ্যে হয়তো একজনও বাদ যায় নি। কাছে এসে সব জিনিস পরীক্ষা করে দেখবার সময় তারা বলছিল, "যারা এসব করে তারা মানুষ নয় দেবতা"। কেউ কেউ বলছিল, "প্রভু, তুমিই একমাত্র ঈশ্বর"। অনেকে আবার রোগ ভাল হয়ে যাবার জন্য প্রার্থনা করছিল। কেউ হাঁটু গেড়ে বসে, আর কেউ বা দণ্ডবৎ হয়ে তাদের অজানা ঈশ্বরের কাছে পূজা আর ভক্তি জানাচ্ছিল। তাঁর কাছে এই প্রার্থনা যে তিনি এদের সামনে প্রকট হয়ে নিজেকে চিনিয়ে দিন। আমরা কিছু লোককে পরে বাপ্তিস্‌ম দেবো বলে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছি। শীঘ্রই আমরা একটা হাসপাতাল বানাব যাতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এই ফাঁদে তাদের খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারি। সোসাইটির জন্য আমাদের বাড়িটি বেশ উপযুক্ত, আর হট্টগোল থেকে দূরে। সমস্ত জমিটা পঁচিশ ফুট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এটা বানাতে আমাদের বেশ খরচ হয়েছে। ইণ্ডিয়াতে এই রকম অন্য জমির চেয়ে এই জমিটা শুধু বেশি সুন্দরই নয়, এখানে ধর্মজীবনের জন্য আরও কিছু সুবিধা আছে। যে সব ফাদারদের আপনারা এখানে পাঠাবেন বলে আমরা আশা করি তাঁরা এই সব সুবিধা ভোগ করবেন। আমরা প্রার্থনাতে মগ্ন থাকি, আর সর্বদা নিজেদের দোষগুলি নিয়ে চিন্তা করি, যাতে ঈশ্বর আমাদের এই মিশনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। এই কথাই আমি আপনাদের লিখতে চেয়েছিলাম। আপনাদের প্রার্থনা আর ত্যাগের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে শেষ করছি। চাঁদেকান, ফেব্রুয়ারী, ১৬০০ সালের ক্যালেন্ডসের [Calends] ১৩ দিন আগে।

[সমাপ্ত]

বার্নিয়ের [Francois Bernier]

বার্নিয়ের ২৫ বা ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাক্তারী পাস করেন। তার চার বছর পরে তিনি প্রাচ্য দেশের উদ্দেশে যাত্রা আরম্ভ করেন, ও ১৬৫৯ সালে ভারতবর্ষে এসে পৌছান। সুরাত বন্দরে নেমে তিনি যখন আমেদাবাদের কাছে গিয়ে পৌছেছেন তখন তাঁর সঙ্গে দারা-শুকোর দেখা হয়। দারা তখন অজমেরের কাছে দেওরার যুদ্ধে (১২-১৩ মার্চ, ১৬৫৯) আওরেঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হয়ে পালাচ্ছেন। বার্নিয়ের যে ডাক্তার এই কথা জানতে পেরে দারা তাঁকে জোর করে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। পরে দারা সিন্ধের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে বার্নিয়ের কোন রকমে দিল্লী পেঁছিতে সমর্থ হন। তারপর চার বছর মনে হয় তিনি দিল্লীতেই ছিলেন। ১৬৬৪র পর বার্নিয়ের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। দুবার তিনি বাঙ্গালা দেশে আসেন, তবে তার মধ্যে একটি যাত্রার তারিখই জানা আছে। ১৬৬৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ফরাসী জহরী তাভেনিয়েরের সঙ্গে তিনি বাঙ্গালা দেশের দিকে যাত্রা করেন। রাজমহল অবধি দুজনে এক সঙ্গেই ছিলেন। তার-পর বার্নিয়ের একলাই কাসিমবাজারের দিকে রওনা হন। বার্নিয়ের তাভেনিয়েরের নাম করেননি। ওঁরা দুজনে যে একসঙ্গে রাজমহল অবধি এসেছিলেন এ খবর পাওয়া যায় তাভেনিয়েরের বৃত্তান্ত থেকে। বার্নিয়ের বাঙ্গালা দেশ থেকে দক্ষিণে মসুলিপটম যাত্রা করেন, ও ১৬৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে সেখানে পেঁছন। অর্থাৎ, বার্নিয়ের এই বছরের পৌষ মাসটুকু বাঙ্গালা দেশে ছিলেন। ১৬৬৭ সালে বার্নিয়ের স্থল পথে দেশে ফিরে যান।

দেশে ফিরে গিয়ে বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। সেই সময় একজন পুস্তক প্রকাশক তাঁকে ভারতবর্ষ ও মিশর সম্পর্কে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর বার্নিয়ের তাঁর পুস্তকের শেষে দিয়েছেন। চতুর্থ প্রশ্নটি ছিল বাঙ্গালা দেশের উর্বরতা আর সৌন্দর্য সম্পর্কে। বার্নিয়ের এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন বর্তমান অনুবাদ শুধু সেই উত্তরের। বার্নিয়েরের মূল পুস্তকের নাম Travels in the Mogul Empire (1656-1668)। ১৮৯১ সালে পুস্তকটির ইংরেজি অনুবাদ করেন Archibald Constable। ১৯১৪ সালে ভিনসেণ্ট স্মিথ এই অনুবাদের একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। বর্তমান অনুবাদ এই সংস্করণ থেকে করা।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের উর্বরতা, সম্পদ ও সৌন্দর্যের বিবরণ।

যুগে যুগে মিশর দেশকেই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর উর্বর দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আধুনিক লেখকরাও বলেন যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের উপর পৃথিবী এত সদয় নন। তবে বাঙ্গালা দেশে দুবার ভ্রমণ করে আমার এই বিশ্বাসই হয়েছে যে এই সব প্রশংসা মিশরের চেয়ে বাঙ্গালা দেশেরই বেশি প্রাপ্য। বাঙ্গালা দেশে এত ধান হয় যে শুধু প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেই নয়, দূর দূর দেশেও এখান থেকে ধান সরবরাহ করা হয়। গঙ্গা নদী পথে এই ধান পাটনা অবধি নিয়ে যাওয়া হয়, আর সমুদ্র পথে মসুলিপটম ও করোমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ছাড়া, বিদেশে,

বিশেষ করে লঙ্কা দ্বীপে ও মালদিভে ধান পাঠান হয়। বাঙ্গালা দেশে চিনিও তেমনি প্রচুর উৎপন্ন হয়। গোলকুণ্ডা রাজ্য ও কর্ণাটকে যেখানে চিনি বেশি হয়না, সেখানে, ও মোকা ও বসোরার বন্দর দিয়ে আরব দেশে ও মেসোপোটেমিয়াতেও এখান থেকে চিনি রপ্তানি হয়। বন্দর আব্বাসী হয়ে পারস্যেও চিনি যায়। বাঙ্গালা দেশের মিষ্টান্ন ও প্রসিদ্ধ, বিশেষ করে যে সব জায়গায় পোর্তুগীজদের বসতি সেই সব জায়গার। পোর্তুগীজরা ভাল মিষ্টান্ন বানায়, আর তাদের ব্যবসার এটা একটা বড় সামগ্রী। যে সব ফল থেকে এরা আচার বানায় তার মধ্যে আছে এক রকম বড় লেবু, যা আমাদের ইয়োরোপেও পাওয়া যায়, আর তা ছাড়া একরকম সুস্বাদু কন্দ অনেকটা সারসাপারিলার মত লম্বা, আম যা ভারতবর্ষের সর্বত্র পাওয়া যায়, আনারস, এক রকম চমৎকার হরিতকি, লেবু আর আদা।

অবশ্য বাঙ্গালা দেশে যে মিশরের মত অত গম হয়না তা সত্য। তবে এ কথাটা যদি দোষের বলে ধরা হয়, তবে তার জন্য দায়ী এদেশের অধিবাসীরা, কারণ মিশরের লোকেদের তুলনায় এরা ভাত অনেক বেশি খায়, আর রুটি প্রায় খায়ই না। তবুও, গম এদেশের প্রয়োজন মত যথেষ্টই হয়, আর তাই দিয়ে বেশ ভাল, সস্তা আর সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী বিস্কুট তৈরি হয়। এই বিস্কুট ইয়োরোপীয়দের, অর্থাৎ ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পোর্তুগীজ জাহাজের নাবিকদের জন্য সরবরাহ করা হয়। তিন চার রকম সবজি, চাল আর ঘি. অর্থাৎ সাধারণ লোকেদের যা প্রধান খাদ্য তা কিনতে প্রায় কপর্দকও লাগেনা। আর এক টাকাতে কুড়িটি বা তারও বেশি ভাল মুরগি কিনতে পাওয়া যায়। হাঁস আর পাতিহাঁসও তেমনি সস্তা। আর তা ছাড়া ছাগল আর ভেড়াও পাওয়া যায় প্রচুর। শুয়োর এত সস্তা যে, যে সব পোর্তুগীজরা এদেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে তারা প্রায় শুয়োরের মাংস খেয়েই থাকে। এই মাংসে সস্তায় নুন মাখিয়ে নিয়ে ইংরেজ আর ওলন্দাজরা তাদের জাহাজের জন্য সরবরাহ করে। তাজা বা নুন মাখানো সব রকমের মাছও এখানে প্রচুর। এক কথায়, বাঙ্গালা দেশে জীবনধারণের জন্য সব জিনিসেরই প্রাচুর্য। এই প্রাচুর্যের জন্যই অনেক পোর্তুগীজ, দো আঁশলা, আর অন্য যে সব খ্রীষ্টানদের ওলন্দাজরা নিজেদের বসতি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা এই উর্বর দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জেসুইট ও অগষ্টিনীয় সম্প্রদায়ের বড় বড় গির্জা আছে। তারা একেবারে স্বাধীন আর অবারিত ভাবে নিজেদের ধর্ম চর্চা করতে পায়। এরা আমাকে বলেছে যে একমাত্র হুগলিতেই আট-নয় হাজার খ্রীষ্টান আছে, আর এই রাজ্যের অন্যান্য অংশে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারেরও বেশি। দেশের সমৃদ্ধি আর এদেশী মেয়েদের সৌন্দর্য আর নম্র স্বভাবের জন্য পোর্তুগীজ, ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে বাঙ্গালা দেশে প্রবেশের জন্য একশটি পথ আছে তবে বেরোবার পথ একটিও নেই।

যে সব দামী পণ্যের জন্য বিদেশীরা এ দেশের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি এমন আর কোন দেশ দেখিনি যেখানে এত বিভিন্ন প্রকারের এই সব দ্রব্য পাওয়া যায়। চিনি, যার কথা আমি আগেই বলেছি, তাকেও দামী পণ্যের

মধ্যে ধরা যেতে পারে। এ ছাড়া বাংলা দেশে এত সুতী আর রেশমের কাপড় হয় যে এই দেশকে ঐ দুই সামগ্রীর গুদামঘর বলা যেতে পারে। এই গুদামঘর শুধু হিন্দুস্থান বা মহামুঘলের সাম্রাজ্যেরই নয়, কাছাকাছি সব দেশের এমন কি ইয়োরোপের প্রয়োজনও মেটায়। শুধু ওলন্দাজরাই যে বিশাল পরিমাণে নানা রকমের মিহি ও মোটা সাদা বা রঙিন কাপড় নানা দেশে বিশেষ করে জাপানে আর ইয়োরোপে রপ্তানি করে তাই দেখে মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগত। ইংরেজ, পোর্তুগীজ আর এ দেশী বণিকরাও এই সব জিনিসের বেশ ব্যবসা করে। ঠিক এই সব কথা রেশম আর নানা রকম রেশমী জিনিস সম্বন্ধেও বলা যায়। বাংলা দেশ থেকে সারা মুঘল সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে লাহোর আর কাবুলে, আর বিদেশে কত সুতী কাপড় পাঠান হয় তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এখানকার রেশম অবশ্য পারস্য, সিরিয়া, সইদা বা বেইরুটের [সইদা ও বেইরুট লেবাননে ভূমধ্যসাগরের উপর বন্দর] রেশমের মত অত ভাল নয়, তবে দামে অনেক সস্তা। আমি অভিজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞ লোকের কাছে শুনেছি যে ভাল ভাবে বাছাই করলে আর যত্ন করে তৈরি করলে এখানকার রেশম দিয়েও সুন্দর জিনিস বানান যায়। ওলন্দাজরা তাদের কাসিমবাজারের রেশমের ফ্যাক্টরীতে সাতশ বা আটশ দেশী লোককে নিয়োগ করে। ইংরেজ ও অন্য ব্যবসায়ীরাও প্রায় ঐ রকম সংখ্যক লোক নিয়োগ করে।

বাঙ্গালাদেশ শোরারও প্রধান বাজার। পাটনা থেকে বহু শোরা এখানে আমদানি হয়। গঙ্গা বয়ে এই জিনিস নিয়ে যাওয়া খুব সহজ। ওলন্দাজ আর ইংরেজরা প্রচুর পরিমাণে শোরা ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় ও ইয়োরোপে রপ্তানি করে।

আর এই সুফলা রাজ্যেই সব চেয়ে ভাল জাতের লাক্ষা, আফিম, মোম, সিভেট (civet, গন্ধগোকুল), বড় লঙ্কা, আর নানা জাতের ওষধি পাওয়া যায়। আর ঘি যাকে আপনার অতি তুচ্ছ বস্তু বলে মনে হতে পারে তাও এদেশে এত বেশি পাওয়া যায়, যে রপ্তানি করার পক্ষে অসুবিধা জনক হলেও জাহাজে করে বহু দেশে পাঠান হয়।

অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে নতুন লোকের পক্ষে এখানকার আবহাওয়া, বিশেষকরে সমুদ্রের কাছের অঞ্চলগুলির আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। ওলন্দাজরা আর ইংরেজরা যখন প্রথম এদেশে বাস করতে আরম্ভ করে তখন তাদের মৃত্যুহার অত্যধিক হ'ত। বালাসোরে আমি ইংরেজদের দুটো সুন্দর জাহাজ দেখেছিলাম। ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল বলে জাহাজ দুটি সেখানে বছর খানেক ছিল। আর তারপর ফেরত যাবার সময় দেখা গেল যে তাদের অধিকাংশ নাবিক মরে গেছে বলে ফেরত নিয়ে যাবার লোক নেই। ইংরেজ আর ওলন্দাজ দু জাতই আজকাল খুব সাবধানে থাকে, তাই তাদের মৃত্যুহার কমে গেছে। নাবিকরা যাতে কম পাঞ্চ (মিশ্রিত মদ) খায় সেদিকে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা নজর রাখেন, আর এ দেশী মেয়েদের কাছে বা আরক বা তামাকের দোকানে ঘন ঘন যেতে দেন না। ভাল জাতের মদ (Vin de Grave or Canary and Chiras wines) মিত পরিমাণে খেলে দূষিত বায়ুর

কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমি তাই বলি যে সাবধানে থাকলে অসুস্থ হবার কোন কারণ নেই। সাবধানী লোকেদের মধ্যে মৃত্যুহার এদেশে অন্য দেশের তুলনায় বেশি হবে না। বুলপোঞ্জ (Bouleponge) বলে যে পানীয় এদেশে পাওয়া যায় তা আরক অর্থাৎ গুড়ের মদ, লেবুর রস, জল আর জায়ফল দিয়ে তৈরি হয়। এই পানীয় খেতে বেশ লাগে কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

বাঙ্গালা দেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করবার সময় একটা কথা বলা উচিত যে এই দেশে রাজমহল থেকে সমুদ্র অবধি প্রায় এক শ লিগ বিস্তৃত স্থানে গঙ্গার দুধারে পুরাকালে অনেক পরিশ্রম করে অজস্র খাল কাটা হয়েছিল। খাল গুলি মাল নিয়ে যাবার জন্য, আর জল সরবরাহের জন্য। ভারতীয়দের বিশ্বাস যে এত ভাল জল পৃথিবীতে আর নেই। খালগুলির দুধারে সারি দিয়ে শহর বা গ্রাম। সেগুলিতে ধর্মহীনদের (হিন্দুদের) বসতি। আর ধান, আখ, শষ্য, তিন চার রকমের তরকারি, সরষে, তেলের জন্য তিল, আর রেশমের কীটের খাবারের জন্য দু-তিন ফুট উঁচু তুঁত গাছের বড় বড় খেত। তবে বাঙ্গালার সব চেয়ে চমৎকারী সৌন্দর্য হল গঙ্গার দুই তীরের মাঝে বিশাল জায়গায় অবস্থিত বড় বড় দ্বীপ। এগুলি কয়েক জায়গায় ছয় সাত দিনের পথ অন্তর দেখা যায়। দ্বীপগুলি ছোট বড় নানা রকম, তবে সবগুলিই খুব উর্বর, বনে ঘেরা, তাতে অজস্র ফল গাছ, আনারস আর সবুজ গাছপালায় ঢাকা। তাদের মধ্যে দিয়ে যতদূর চোখ যায় হাজার হাজার খাল চলে গিয়েছে। এগুলির দুপাশে গাছের সারি। দেখে মনে হয় যেন ছায়ায় ঘেরা পথ। এই সব দ্বীপের মধ্যে সমুদ্রের কাছকাছি কয়েকটি দ্বীপে এখন আর জন বসতি নেই। আরাকানী জলদস্যুদের অত্যাচারে লোকে এখান থেকে পালিয়ে গেছে। এই সব অঞ্চল এখন জনশূন্য। শুধু কিছু হরিণ, বন্য শুয়োর আর মুরগী এখানে থাকে, আর এদের খাবার লোভে বাঘেরা কখনো কখনো এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে সাঁতরে বেড়ায়। গঙ্গার এই সব দ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছোট ছোট দাঁড় টানা নৌকা। এখানে অনেক জায়গায় নৌকা থেকে নামা বিপজ্জনক। রাত্রে নৌকাকে তীরের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবার সময় খুব সাবধান থাকতে হয় যে নৌকা যেন তীরের থেকে কিছু দূরে থাকে; কারণ প্রায়ই এমন হয় যে কেউ না কেউ বাঘের মুখে পড়ে। এই ভীষণ জন্তুরা নাকি রাত্রে যখন সবাই ঘুমোচ্ছে তখন নৌকায় উঠে পড়ে আর যে কোন একজন লোককে তুলে নিয়ে যায়। এদেশের মাঝি মাল্লারা বলে যে বাঘেরা সাধারণতঃ দলের সবচেয়ে জোয়ান আর মোটা লোককেই তুলে নিয়ে যায়।

এই সব দ্বীপ আর খাড়ির মধ্যে দিয়ে একবার আমি নয় দিন নৌকা করে পিপলি (পিপলি উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে সুবর্ণরেখার মোহানা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।) থেকে হুগলি গিয়েছিলাম। সেই কাহিনী এখানে বাদ দেওয়া উচিত হবে না, কারণ এই যাত্রার মধ্যে এমন একদিনও হয়নি যে আমাদের কোন দুর্ঘটনা বা অ্যাডভেঞ্চার না হয়ে থাকে। আমাদের সাতদাঁড়ের নৌকাতে করে পিপলির নদী থেকে বেরিয়ে আমরা তখন সমুদ্র তীর বরাবর এই সব দ্বীপ আর খাড়ির দিকে

তিন চার লিগ এগিয়েছি তখন দেখি সমুদ্র রুই মাছের মত এক রকম মাছে ঢেকে গেছে আর তাদের পিছনে এক গাদা শুশুক (dolphins) তাড়া করেছে। আমি দাঁড়ীদের সেই দিকে যেতে বললাম। গিয়ে দেখলাম মাছগুলি পাশের দিকে পড়ে ভাসছে ; মনে হয় যেন মরে গিয়েছে। কতকগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, আর কিছু এমনভাবে নড়া চড়া করছে যে মনে হয় তারা হত চেতন হয়ে গিয়েছে। আমরা খালি হাতেই চব্বিশটা মাছ ধরলাম। দেখলাম যে তাদের মুখ থেকে রুই মাছর পটকার মত কিছু বাইরে বেরিয়ে আছে। আর সেগুলির শেষাংশ লাল। সহজেই বুঝলাম যে ঐ পটকার জন্যই মাছগুলি ডুবে যাচ্ছেনা। কিন্তু কেন যে পটকাগুলি বেরিয়ে আছে তা বুঝতে পারলাম না। হয়তো শুশুকগুলি তাদের এত দূর থেকে তাড়া করে এনেছে যে তাদের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য মাছগুলি এমন প্রাণপন চেষ্টা করেছে যে পটকা-গুলি ফুলে উঠে লাল হয়ে গিয়েছে আর তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই ঘটনা আমি অনেক নাবিকের কাছে বর্ণনা করেছি, তবে কেউই এই গল্প বিশ্বাস করেনি। তবে একবার একজন ওলন্দাজ পাইলট আমাকে বলেছিল যে চীনের সমুদ্র উপকূল দিয়ে যাবার সময় তারাও এই রকম ব্যাপার দেখেছিল, আর নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে তারাও এই রকম ভাবে অনেক মাছ ধরেছিল।

পরদিন বিকালের দিকে আমরা দ্বীপগুলির মধ্যে পৌঁছলাম। এক জায়গায়, যেখানে মনে হল বাঘ নেই, নেমে আমরা আগুন জ্বালালাম। গোটা দুই মুরগী আর কিছু মাছ রাঁধতে বললাম। সন্ধ্যার খাওয়াটা চমৎকার হ'ল। তারপর আবার নৌকায় উঠে অন্ধকার হবার আগে অবধি এগিয়ে যেতে বললাম। অন্ধকার হয়ে গেল বিভিন্ন খাড়ির মধ্যে পথ হারিয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা সুবিধামত খালে ঢুকে রাত কাটালাম। নৌকাটিকে একটা মোটা গাছের ডালে বেঁধে তীর থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রইলাম। জেগে পাহারা দেবার সময় আমি একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখলাম। এ রকম আমি দিল্লীতেও দুবার দেখেছি। দেখলাম যে চাঁদের রামধনু হয়েছে। তাই দেখে আমি সকলকে জাগিয়ে এই দৃশ্য দেখালাম। সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। আমার এক বন্ধুর অনুরোধে দুজন পোর্তুগীজ পাইলটকে আমার সঙ্গে নিয়ে ছিলাম। তাঁরা তো বললেন যে এরকম রামধনুর কথা তাঁরা আগে কখনোও শোনেন নি।

তৃতীয় দিন ঐ খাড়িগুলির মধ্যে আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। কয়েকজন পোর্তু-গীজের সঙ্গে দেখা না হলে আমরা যে কি করে পথ খুঁজে পেতাম তা জানি না। এরা একটি দ্বীপে নুন তৈরি করছিল। এই রাত্রেও আমরা একটি ছোট খাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গেকার পোর্তুগীজরা আগের রাত্রের ঐ দৃশ্যের কথা ভুলতে পারেনি। তারা সমানে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আমার ঘুম ভাঙিয়ে আর একটি রামধনু দেখাল। এইটিও তেমনি সুন্দর আর পরিষ্কার ছিল। মনে করবেন না যেন যে আমি সভা আর রামধনুতে গুলিয়ে ফেলেছি। সভা আমি ভাল করেই চিনি। দিল্লীতে বর্ষাকালে এমন কোন মাস যায় না যখন চাঁদের চারিদিকে এই রকম

সভা না দেখা যায়। তবে সভা দেখা যায় চাঁদ প্রায় মাথার উপর থাকলে। আমি পর পর তিন চার রাত এই রকম সভা দেখেছি, কখনোও এক সঙ্গে দুটি সভা। যে রামধনুর কথা বলছি তা চাঁদের চারিদিকে বৃত্তের মতন নয়। এটি চাঁদের উলটো দিকে ছিল, ঠিক যেমন সূর্যের রামধনুর বেলায় হয়। যখনই আমি রাত্রে রামধনু দেখেছি, চাঁদ ছিল পশ্চিম আকাশে আর ঐ রামধনু ছিল পূর্ব আকাশে। আর চাঁদও প্রায় পুরো গোল ছিল। বোধহয় তা নইলে চাঁদের কিরণ রামধনু বানানোর মত জোরালো হবে না। রামধনুর রং সভার রঙের মত সাদা ছিল না। এটি যে বেশ উজ্জ্বল ছিল তাই নয়, এতে বেশ কয়েকটি রং ও দেখা যাচ্ছিল।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যে বেলাও আমরা অন্যদিনের মত প্রধান খাড়ি থেকে সরে নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিলাম। সেদিনকার রাতটা ছিল আশ্চর্য রকম। বাতাস একেবারে বন্ধ ছিল। হাওয়া ছিল খুব গরম, আর এমন দম আটকে আসছিল যে মনে হচ্ছিল যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা। চারিদিকে ঝোপঝাড়ে এতো জোনাকি ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন ঝোপগুলিতে আগুন লেগেছে। আর সমানে আগুনের শিখার মত দেখা যাচ্ছিল। আমাদের দাঁড়ীরা ভয় পেয়ে ভাবছিল যে ও গুলি নিশ্চয় ভূত। এদের মধ্যে দুটি আলো বেশ উল্লেখযোগ্য। একটি আগুনের গোলকের মত। একটা পেটার (pater) মন্ত্র পাঠ করতে যত সময় লাগে তার চেয়েও বেশি সময় এটিকে দেখা গিয়েছিল। অন্যটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছোট একটা গাছে আগুন লেগেছে। এটা প্রায় পনের মিনিট দেখা যাচ্ছিল।

পঞ্চম রাত ছিল ভীষণ বিপজ্জনক। সে রাত্রে ভীষণ এক ঝড় ওঠে। আমরা যদিও গাছের তলায় বেশ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, আর আমাদের নৌকা বেশ ভাল ভাবে বাঁধা ছিল, তবু আমাদের দড়ি ছিঁড়ে যায়। আর একটু হলেই আমরা বড় খাড়ির দিকে ভেসে যেতাম আর শেষ হয়ে যেতাম। আমি আর সেই দুজন পোর্তুগীজ সেই সময় হঠাৎ একটা গাছের ডাল ধরে ফেলতে পারি, আর তাই ধরে আমরা প্রায় দুঘণ্টা ছিলাম। ঝড় তখন প্রবল বেগে বইছে। এদেশী দাঁড়ীদের কাছ থেকে কোন সাহায্যের আশাই ছিল না তারা তখন ভয়ে মৃতপ্রায়। সেই গাছ জড়িয়ে ধরে থাকার সময় আমাদের অবস্থা যে বেশ কষ্টকর ছিল তা বলাই বাহুল্য। তার উপর এমন বৃষ্টি পড়ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ যেন বালতি করে জল ঢেলে দিচ্ছে। আর, চারিদিকে কেবল বিদ্যুতের আলো আর বজ্রের গর্জন। সেই ভয়ঙ্কর রাতে আমরা জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

যাত্রার শেষ কয়েকদিন অবশ্য খুব আরামে কেটেছিল। নবম দিনে আমরা হুগলি পৌঁছলাম। পথের দু পাশে সুন্দর দেশ দেখতে দেখতে চোখের সাধ মিটছিল না। তবে আমার জামা কাপড় আর বাক্স একেবারে ভিজে গিয়েছিল। মুরগী সব মরে গিয়েছিল, মাছ সব পচে গিয়েছিল, আর সঙ্গেকার সব বিস্কুট বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গিয়েছিল।

[সমাপ্ত]

তাভের্নিয়ের

তাভের্নিয়েরের [Jean-Baptiste Tavernier] জন্ম হয় প্যারিসে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। খুব অল্প বয়সেই তিনি ইয়োরোপের বহু দেশে ভ্রমণ করেন আর অনেক ইয়োরোপীয় ভাষা শিখে যান। প্রাচ্য দেশ গুলির উদ্দেশে তিনি প্রথম যাত্রা করেন ২৬ বছর বয়সে, তবে সেবার তিনি তুর্কী থেকেই ফিরে গিয়েছিলেন। তার পর তিনি আরও পাঁচ বার প্রাচ্য দেশে যাত্রা করেন, ও প্রতিবারই ভারতবর্ষে এসে এ দেশের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। তাভের্নিয়ের ইয়োরোপ থেকে আসবার সময় অনেক মণি মুক্তা আর সোনার জিনিস নিয়ে আসতেন। তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এগুলিকে পারস্যের আর ভারতবর্ষের বাদশাহ আর অন্য ধনীদের বিক্রি করা। শেষবার যখন তিনি ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি একবার আগ্রা থেকে ঢাকা গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালার সুবেদার শায়েস্তা খানকে কিছু মণি মুক্তা বিক্রি করা। আগ্রা থেকে তিনি রওনা হন ২৫শে নভেম্বর ১৬৬৫। তাঁর সঙ্গে দুজন ইয়োরোপীয় যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বার্নিয়ের।

(আগ্রা থেকে বাঙ্গালা যাবার পথে) এই দিন (১লা ডিসেম্বর, ১৬৬৫) আমি ১১০টি গরুর গাড়ী আগ্রার দিকে চলেছে দেখতে পেলাম। গাড়ীগুলির প্রত্যেকটিতে ৫০,০০০ টাকা আর এগুলি ছটি করে বলদ টানছে। এই সব টাকা বাঙ্গালা সুবার রাজস্ব। অর্থাৎ সব খরচ মিটিয়ে আর সুবেদারের পকেট ভাল করে ভর্তি হবার পরও এই রাজস্বের পরিমাণ ৫৫ লক্ষ টাকা।

তেসরা জানুয়ারী (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় চার ঘণ্টা গঙ্গা বেয়ে চললাম। সেখানে কাটারে (কোসী ?) নদী উত্তর থেকে গঙ্গায় এসে পড়েছে। এই রাত্রি পোংগাজেলে [আধুনিক সকৃড়ী গলি ঘাট] ঘুমোলাম। এই খানে, যে পাহাড় নদীর ধার বরাবর চলছিল তা শেষ হ'ল। এ দিনের যাত্রা ১৩ ক্রোশ। পর দিন পোংগাজেল থেকে এক ঘণ্টা চলে মার্ত নদী (কালিন্দ্রী ?) পেলাম। এই নদী উত্তর থেকে এসেছে। রাজমহলে এসে ঘুমোলাম।

রাজমহল গঙ্গার দক্ষিণে একটি শহর। স্থলপথে এলে শহরে পেঁছবার আগে প্রায় এক বা দুই ক্রোশ পথ ইট দিয়ে বাঁধান। আগে বাঙ্গালার শাসনকর্তা এই খানে বাস করতেন। জায়গাটা শিকারের পক্ষে ভাল, আর ব্যবসা বাণিজ্যও এখানে যথেষ্ট হয়। পরে নদী এখান থেকে সরে পুরো আধ লিগ দূরে চলে গেছে। তা ছাড়া আরাকানের রাজা আর পোর্তুগীজ দস্যু যারা গঙ্গার মোহানায় বসতি ক'রে ঢাকার লোকেদের উত্যক্ত করছে তাদের ঠেকাবার জন্য শাসনকর্তা আর সওদাগররা ঢাকা চলে গেছেন। ঢাকা এখন বেশ বড় বাণিজ্য কেন্দ্র।

ছ তারিখে রাজমহল থেকে ছ ক্রোশ গিয়ে দোনাপুর বলে বেশ বড় একটি শহরে পেঁছলাম। এখানে মঁসিয়ে বার্নিয়েরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। উনি কাসিমবাজার হয়ে সেখান থেকে স্থলপথে হুগলি গেলেন। কারণ নদীতে জল কম থাকলে সুতিকী [Soutiqui, মুর্শিদাবাদের কাছে সুতী] শহরের কাছে বালির চরের জন্য

নদীপথে যাওয়া যায় না। এই রাত্রে আমি তুতিপুরে [তাঁতিপুরে] ঘুমিয়ে ছিলাম। জায়গাটা রাজমহল থেকে ১২ ক্রোশ। ভোরে উঠে দেখি কয়েকটা কুমীর চরের উপর শুয়ে আছে। সাত তারিখে ২৫ ক্রোশ গিয়ে আচেরাত [হাজরা হাট] পেঁছিলাম।

এখান থেকে ঢাকা আরও ৪৫ ক্রোশ। এই দিন আমি এত বেশি কুমীর দেখেছিলাম যে শেষ অবধি আমার ইচ্ছা হ'ল যে লোকে যে বলে যে ওদের বন্দুকের গুলিতে কিছু হয় না তা সত্য কিনা দেখতে। গুলি গিয়ে তার চোয়ালে লাগল আর রক্ত বেরোতে লাগল, কিন্তু কুমীরটা জলের মধ্যে পালিয়ে গেল। আট তারিখে অনেকগুলো কুমীরকে নদীর ধারে শুয়ে থাকতে দেখলাম। আমি দুটো কুমীরের উপর দুবার বন্দুক চালালাম। প্রতি বার বন্দুকে তিনটি করে গুলি ভরে ছিলাম। গুলি লাগতেই তারা চিত হয়ে পড়ে সেইখানেই মরে গেল। এ দিন আমি ১৭ ক্রোশ চলে দোলদিয়া পেঁছে সেই খানে রাত কাটালাম। কাকেদের জন্য আমরা একটা ভাল মাছ পেয়ে গেলাম। মেছোরা এটা নদীর ধারে শরবণের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। আমার নৌকার দাঁড়ীরা শরবণে এত কাকের ডাকাডাকি শুনে বুঝে গিয়েছিল যে ওখানে কিছু আছে। খোঁজাখুঁজি করে তারা ভাল একপালা খাবারের উপযুক্ত মাছ পেয়ে গেল।

ন তারিখে দুপুর দুটোয়ে আমরা ছাতিওয়ার নদী পেলাম। এটি উত্তর থেকে এসে পড়েছে। ১৬ ক্রোশ চলে আমরা সেদিন দামপুরে থাকলাম। ১০ তারিখে রাত্রে আমরা নদীর ধারে ঘুমোলাম। লোক বসতি থেকে জায়গাটা দূরে। এ দিন আমরা ১৫ ক্রোশ চলেছি। ১১ তারিখে সন্ধ্যার দিকে, গঙ্গা যেখানে তিন ভাগ হয়ে গেছে সেখানে পেঁছিলাম। একটি শাখা ঢাকার দিকে গেছে। এই শাখার মুখে যাত্রাপুর বলে একটা বড় গাঁয়ে রাত্রি বাস করলাম। এ দিন আমরা ২০ ক্রোশ চলেছি। যাদের সঙ্গে মালপত্র বেশি নেই তারা এখান থেকে স্থলপথে ঢাকা চলে যায়। নদী এত ঘুরে গেছে যে স্থলপথে পথ অনেক কম। ১২ তারিখে দুপুরে বাগমারা বলে একটা বড় শহর পেরোলাম। রাত্রে কাসিয়াটাতে (কাজি হাট ?) থাকলাম। এ দিন ১১ ক্রোশ চলেছিলাম।

১৩ তারিখে দুপুরে ঢাকা থেকে দু ক্রোশ দূরে লাখ্যা নদী দেখলাম। এটি উত্তর পূর্ব থেকে এসে পড়েছে। যেখানে নদীটি এসে পড়ে তার অপর পারে একটি ছোট কেল্লা আছে। তার দু পাশে কয়েকটি কামান রাখা। আরও আধ ক্রোশ গিয়ে পাগলা নদী। এর উপর একটি সুন্দর সেতু। মীর জুমলার আদেশে এটি তৈরি হয়। নদীটি উত্তর পূর্ব থেকে এসেছে। আরও আধ ক্রোশ গেলে কদমতলী নদী উত্তর দিক থেকে এসে পড়েছে। এই নদীটির উপরও ইটের তৈরি একটি সেতু আছে। নদীর ধারে কয়েকটি গম্বুজ আছে। যে সব লোকে পথে ডাকাতি করত তাদের মাথা কেটে তার উপর এগুলি বানান হয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে ন ক্রোশ চলে ঢাকা পেঁছিলাম। ঢাকা বেশ বড় শহর, কিন্তু শুধু লম্বার দিকেই বড়, কারণ সকলেই চেষ্টা করেছে গঙ্গার ধারে বাড়ি বানাতে। [সেই সময় বুড়ী গঙ্গাই পদ্মার আদি শাখা ছিল।] লম্বাতে এই শহর দু ক্রোশের বেশি। শেষ যে ইটের সেতুর কথা বলেছি সেখান থেকে ঢাকা অবধি সমানেই পর পর বাড়ি, তবে বাড়ি

গুলি একটি অন্যটির গায়ে লেগে নেই। যে সব ছুতোর মিস্ত্রিরা বড় নৌকা [galley] আর অন্য নৌকা বানায়, এই বাড়িগুলি তাদের। বাড়ি বলতে অবশ্য এগুলি কুঁড়ে ঘর মাত্র, বাঁশের উপর কোন রকমে মাটি দিয়ে দেওয়াল বানানো। ঢাকা শহরের বাড়ি গুলিও প্রায় তাই। শাসন কর্তার বাড়ি উঁচু দেওয়াল দেওয়া খানিক জমির মাঝখানে কাঠের তৈরি যেমন তেমন একটি বাড়ি। সাধারণতঃ তিনি তাঁবুতে থাকেন। এটি ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যে একটা বড় উঠান মত জায়গায় খাটানো। ঢাকার সাধারণ বাড়িতে নিজেদের মালপত্র সুরক্ষিত থাকবেনা ভেবে ওলন্দাজরা বেশ সুন্দর একটি বাড়ি বানিয়ে নিয়েছেন। ইংরেজদের বাড়িটিও বেশ ভাল। অগস্টিন পাদরিদের গির্জা ঘরটি ইটের তৈরি, আর বানানোও হয়েছে বেশ সুন্দর ভাবে।

আমি গতবার যখন ঢাকায় আসি তখন বাংলার তৎকালীন শাসন কর্তা নবাব শায়েস্তা খান আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ রাজার নৌবহরে ২০০টি রণপোত আর কয়েকটি ছোট নৌকা। রণপোত গুলি বঙ্গোপসাগর থেকে গঙ্গায় ঢুকে পড়ে আর জোয়ারের সময় ঢাকা বা তারও পরে উঠে আসে।

শায়েস্তা খান বর্তমান বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মামা, আর সাম্রাজ্যের সবচেয়ে চতুর লোক। তিনি কোন এক কৌশলে আরাকানের রাজার নৌবহরের অফিসারদের ঘুষ দিয়ে চল্লিশটি রণপোত নিজের দলে টেনে নেন। ঐ রণপোতগুলির ক্যাপ্টেন ছিল পোর্তুগীজরা। তাদের সম্বন্ধ পাকা করবার জন্য তিনি সেই অফিসার আর পোর্তুগীজ সৈন্যদের বেশ ভাল বেতন দেন, তবে দেশী সৈন্যদের মাইনে শুধু ডবল করে দিয়েছিলেন। রণপোতগুলি যে দাঁড় টেনে কী বেগে যায় তা দেখলে আশ্চর্য লাগে। অনেকগুলিতে এক এক দিকে ৫০টি করে দাঁড়, তবে প্রতি দাঁড়ে দু জনের বেশি লোক থাকে না। অনেকগুলি নৌকা সোনালি আর নীল রং দিয়ে চিত্রিত।

ওলন্দাজরা কিছু বড় জাহাজ নিজেদের মাল বইবার জন্য রাখে, আর মাঝে মাঝে দরকার পড়লে অন্য লোকেদের কাছেও নৌকা ভাড়া করে। এতে বহুলোক রোজগার পায়।

ঢাকায় পেঁছিবার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী আমি নবাবকে অভিবাদন করতে গেলাম। তাঁকে আমি সোনার জরিতে তৈরি অর্থাৎ টিস্যু কাপড়ের একটি পোশাক উপহার দিলাম। এই পোশাকটির কিনারা আর ঝালর স্পেন দেশের সোনালী জরির তৈরি। তাঁকে একটি সোনালী আর রুপালী নকশা করা চাদর আর একটি পান্নাও দিলাম। সন্ধ্যা বেলা যখন আমি ওলন্দাজদের কুঠি যেখানে উঠেছিলাম, ফিরে এলাম নবাব আমাকে কিছু বেদানা, চীনে কমলালেবু, দুটো পারস্যের খরবুজ আর তিন রকম নাসপাতি পাঠিয়েদিলেন।

১৫ই আমি তাঁকে আমার পণ্য সামগ্রী দেখালাম আর তাঁর ছেলেকে মীনে করা সোনার বাক্সে একটি ঘড়ি, রূপার কাজ করা এক জোড়া পিস্তল আর একটি দূরবীন উপহার দিলাম। বাপ আর এই দশ বছরের কর্তাকে যে উপহার দিয়েছিলাম তার দাম হবে পাঁচ হাজার লিবর।

১৬ তারিখে গিয়ে আমি নবাবকে যা বেচেছিলাম তার দাম ঠিক করলাম। আর তারপর তাঁর উজিরের কাছ থেকে কাসিমবাজারের উপর হুণ্ডি নিতে গেলাম। তিনি অবশ্য নগদ দিতেও রাজি ছিলেন তবে ওলন্দাজদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বেশি। তারা বললে যে এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াতে বিপদ আছে। কাসিমবাজার যেতে গঙ্গা বেয়ে অর্থাৎ নদীপথে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্থলপথে অনেক জলা আর জঙ্গল। জলপথে যে সব ছোট নৌকা ব্যবহার হয় সেইগুলি সামান্য বাতাসেই উলটে যেতে পারে। আর মাঝীরা যদি জানতে পারে যে যাত্রীর কাছে টাকা তাহলে তাদের পক্ষে ইচ্ছা করে নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া কিছুই কঠিন নয়। পরে তারা সুবিধে মত নদী থেকে টাকা তুলে নিয়ে যায়।

২০ তারিখে আমি নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি আমাকে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নিমন্ত্রণ করলেন, আর আমাকে, একটি পাসপোর্ট দিলেন। এই পাসপোর্টে আমাকে তাঁর পরিবারের লোক বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

২১ তারিখে ওলন্দাজরা আমার সম্মানে একটি ভোজ দিল। এতে তারা ইংরেজদের, পোর্তুগীজদের, আর সেই দেশেরই একজন অগস্টিন সম্প্রদায়ের পাদরিকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ২২ তারিখে আমি ইংরেজদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাদের প্রধান বা প্রেসিডেন্টের নাম মিস্টার প্র্যাট (Prat)। তারপর মাননীয় পোর্তুগীজ পাদরি, আর তারপর অন্য কিছু ইয়োরোপীয়দের (Franks) সঙ্গে দেখা করলাম। ২৩ আর ২৯ তারিখের মধ্যে আমি জিনিস পত্র কিনলাম। এতে প্রায় ১১,০০০ টাকা লাগল। সব জিনিস নৌকোয় তোলা হয়ে গেলে আমি বিদায় নিলাম। ২৯ তারিখে বিকেলে ঢাকা ছাড়লাম। ঢাকার সব ওলন্দাজরা তাদের সশস্ত্র নৌকোয় চড়ে আমার সঙ্গে দু লিগ অবধি এলো। স্পেন দেশীয় মদ সেই সময় কম খরচ হয়নি। ২৯ জানুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী অবধি নদীপথে চলে হাজরাহাট পেঁছিলাম। সেখানে আমার মালপত্র আর আমার চাকরদের নৌকায় রেখে আমি একটি ছোট নৌকা ভাড়া করে মিরদাপুর বলে একটি বড় গাঁয়ে এলাম।

১২ তারিখে আমি একটি ঘোড়া ভাড়া করলাম। আমার বাক্স নিয়ে যাবার জন্য আর কোন ঘোড়া ভাড়া না পেয়ে দু জন স্ত্রীলোককে সেগুলি বয়ে নিয়ে যেতে বললাম সেইদিন সন্ধ্যেবেলা কাসিমবাজার পেঁছিলাম সারা বাঙালায় যত ওলন্দাজ বসতি আছে তাদের ডিরেক্টর মসিঁয়ে ভাকতেন ডোন্‌ক (M. Arnoult van Wachtten-donk) আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর সঙ্গে থাকবার নিমন্ত্রণ করলেন। ১৩ তারিখে ওলন্দাজ ভদ্রলোকদের সঙ্গে বেশ আনন্দে কাটল। তাঁরা আমার খাতিরে দিনটা ফুর্তি করে কাটালেন। ১৪ তারিখে ডিরেক্টর হুগলি চলে গেলেন। সেই খানেই ওলন্দাজদের প্রধান বসতি। সেই দিনই আমার একজন চাকর এসে খবর দিল যে ঝড়ের জন্য আমার নৌকার লোকজনদের আর মালপত্রের বেশ বিপদ হয়েছিল, আর রাত্রে ঝড়ের বেগ বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

১৫ তারিখে ওলন্দজরা আমাকে মুর্শিদাবাদ যাবার জন্য একটি পালকি দিল।

মুর্শিদাবাদ কাসিম বাজার থেকে তিন ক্রোশ দূরে। শহরটি বিরাট। এই খানেই শায়েস্তা খানের প্রধান খাজাঞ্চী (Registrar-general) থাকেন। তাঁকে আমি হুণ্ডিটি দিলাম। সেটি পড়ে তিনি বললেন যে হুণ্ডিটি ঠিক আছে, আর তিনি টাকাও দিয়ে দিতেন, কিন্তু আগের দিনই তিনি নবাবের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন যে আমাকে যদি টাকা ইতিমধ্যে না দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে যেন আর না দেওয়া হয়। শায়েস্তা খান যে কেন এরকম আদেশ দিয়েছেন তার কারণ তিনি কিছু বললেন না। আমি এই ব্যাপারে অবাক হয়ে আমার বাসায় ফিরে এলাম। ১৬ তারিখে আমি নবাবকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম কেন তিনি তাঁর খাজাঞ্চীকে আমাকে টাকা দিতে বারণ করেছেন। ১৭ তারিখে আমি ওলন্দাজদের দেওয়া ১৪ দাঁড়ের নৌকাতে হুগলি রওনা হলাম। সেই রাত্রি ও পরের রাত্রি আমি নৌকাতেই ঘুমোলাম।

১৯ তারিখে আমরা নদিয়া বলে একটি বড় শহর পেরোলাম। গঙ্গার জোয়ার এই অবধিই ওঠে। সেদিন ভীষন ঝড় হল। নদীতে ঢেউ এত বেশি ছিল যে আমরা তিন চার ঘণ্টার জন্ম থামতে বাধ্য হলাম, আর নৌকাটিকে তীরে খুলে নিলাম।

২০ তারিখে আমি হুগলি পৌঁছলাম। সেখানে আমি ২রা মার্চ অবধি ছিলাম আর এই সময় আমি ওলন্দাজদের অতিথি ছিলাম। এই দেশে যা কিছু আনন্দ সম্ভব ওরা তা আমাকে দিতে চেষ্টা করেছিল। কয়েকবার আমরা নদীতে বেড়ালাম। ইয়োরোপে যত রকম সুস্বাদু শাক সবজি পাওয়া যায় সেই সব খেতাম। কয়েক রকম স্যালাড, বাঁধাকপি, অ্যাসপারাগ্যাস, মটর, নানা জাতের জাপান থেকে আমদানি করা বীজের সীম তার মধ্যে ছিল। ওলন্দাজরা তাদের বাগানে নানা জাতের শাক সবজি সযত্নে চাষ করে, তবে অনেক চেষ্টা করেও তারা আর্টিচোক (Artichoke) ফলাতে পারেনি।

২রা মার্চ হুগলি ছেড়ে ৫ই আমি কাসিমবাজারে পৌঁছলাম। পরের দিন মুর্শিদাবাদ গেলাম, নবাবের খাজাঞ্চী যে আমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল সে আর কোন আদেশ পেয়েছে কিনা তাই জানতে। আগেই বলেছি যে আমি শায়েস্তা খানকে লিখে জানতে চেয়েছিলাম কেন তিনি আমার হুণ্ডির টাকা আমাকে দিতে চান না। সেই সঙ্গে ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টর ও একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে ভাল করে চেনেন। তা ছাড়া নবাবও আমাকে ভাল করে চেনেন। আহমদাবাদে দক্ষিণের সৈন্ত সমাবেশে ও অন্ত জায়গাতেও আমি ছিলাম, আর তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কাজ কারবার হয়েছে। আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া তাঁর মনে রাখা উচিত যে আমিই একমাত্র লোক যে ইয়োরোপ থেকে দুষ্প্রাপ্য আর পছন্দমত জিনিস নিয়ে আসি। এরকম ব্যবহার করলে আমি আর আসতে চাইব না। তাছাড়া আমার বাজারে যা সুনাম (credit), আমার সঙ্গে যা ব্যবহার হয়েছে সে কথা শুনলে অন্য কেউ দুষ্প্রাপ্য জিনিস নিয়ে আর ভারতবর্ষে আসতে চাইবে না। আমার বা ডিরেক্টরের চিঠি কারুরই কোন ফল হল না। নবাব তার খাজাঞ্চীকে যে

নতুন হুকুম পাঠালেন তাতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট হলাম না। নবাব লিখেছিলেন যে আমার পাওনা টাকা, অর্থাৎ হুণ্ডিতে লেখা টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা কেটে বাকি টাকা যেন আমাকে দেওয়া হয়। নবাব তারপর লিখেছিলেন যে আমি যদি এতে সন্তুষ্ট না হই তাহলে আমি আমার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

(তাভের্নিয়ের তাঁর বাঙ্গালা দেশ যাত্রার বিবরণ হঠাৎ এইখানে শেষ করে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন। তবে তিনি আরও দু মাস বাঙ্গালাদেশে ছিলেন, কারণ তিনি ৮ই এপ্রিল মালদাতে ছিলেন, আর সেখান থেকে তিনি ১২ তারিখে গঙ্গা বেয়ে পশ্চিমে চলে যান।)

৮ই এপ্রিল (১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) যখন আমি বাঙ্গালা দেশের মালদা শহরে ছিলাম, তখন আমি মূর্তিপূজকদের একটা বড় উৎসব দেখি। এই উৎসব এই জায়গার একটি বিশেষত্ব। লোকে সবাই শহরের বাইরে গিয়ে গাছের ডালে হুক লাগিয়ে দেয়। তারপর এদের মধ্যে অনেকে সেই হুকে নিজেদের শরীর আটকিয়ে নেয়; কেউ শরীরের পাশ থেকে আটকায় আর কেউ কেউ পিঠের মাঝখানে। হুকগুলি তাদের শরীরে ঢুকে যায় আর তারা একঘণ্টা বা দুঘণ্টা হুক থেকে ঝুলে থাকে। যখন তাদের শরীর থেকে মাংস বেরিয়ে আসে তখন তারা নেমে পড়তে বাধ্য হয়। আশ্চর্য এই যে এই বেরিয়ে আসা মাংস থেকে এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে না; আর হুকেও রক্তের কোন চিহ্ন থাকে না। আর ব্রাহ্মণেরা তাদের যে ওষুধ খেতে দেয় তাতে তারা দুদিনেই একেবারে সেরে যায়। এই উৎসবে অন্য কিছু লোক পেরেকের বিছানা বানিয়ে তার উপর শুয়ে থাকে। পেরেকের ডগাগুলি তাদের শরীরে বেশ গভীর ভাবে ঢুকে যায়। তারা যখন এই কষ্ট করছে, তখন তাদের আত্মীয় আর বন্ধুরা পান, টাকা বা ছাপা কাপড় তাদের জন্য নিয়ে আসে। তপস্যা শেষ হয়ে গেলে তারা এগুলি গরীবদের মধ্যে বিলি করে দেয়; নিজেদের জন্য কিছু রাখেনা। আমি তাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই উৎসব আর এই কষ্ট তারা কেন করে। তারা বলল যে এই উৎসব আদি বা প্রথম মানুষের স্মরণে। আমাদের মত এরাও এই প্রথম মানুষকে আদম নামে অভিহিত করে।

[সমাপ্ত]

টমাস বাউরী

টমাস বাউরী (Thomas Bowrey) বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের একজন নাবিক-প্রধান (Sailing-master) ছিলেন। তাঁর লেখা বই A Geographical Account of the countries Round the Bay of Bengal (1669-1679) বই থেকে বাঙ্গালা দেশ অংশটুকুর অনুবাদ দেওয়া হল। বইটি হাকলিউট সোসাইটি ১৯০৫ সালে প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা দেশে (Kingdom of Bengala) বিশেষ করে হুগলি নদী আর এই নদীরই শাখা বা খালের ধারে অনেক পোর্তুগীজের বাস। এরা অনেকেই বলে যে তাদের ইয়োরোপে জন্ম (filias de Lisboa) কিন্তু আসলে অধিকাংশের জন্ম ভারতেই। ইংরেজদের ফ্যাক্টরির এক মাইল উপরে তাদের খুব বড় একটা শহর আছে। এই শহরের নাম ব্যাণ্ডেল (Bandell)। আমার মনে হয় এই শহরের বেড় হবে দুই মাইল। শহরে বহু স্ত্রী পুরুষ আর ছোট ছেলেমেয়ে। এরা বেশির ভাগই খুব গরীব। কিন্তু এদের উদ্যোগের প্রশংসা করা উচিত, কারণ খ্রীষ্টানদের পক্ষে সৎভাবে রোজগার করা এই বিধর্মীদের দেশে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল।

ইংরেজ এবং ওলন্দাজ ফ্যাক্টরির জন্য, কিছু লোকের বাড়ির জন্য এরা সুতী আর রেশমী মোজা বোনে। আর জাহাজীদের জন্য বানায় রুটি। এরা আম, কমলালেবু, পাতিলেবু, আদা, আমলকি, ভ্রিঙ্গোর শিকড় ইত্যাদি দিয়ে নানা রকম মিষ্টান্ন বানায় আর তাছাড়া আম, বাঁশ, লেবু ইত্যাদি দিয়ে অনেক রকমের আচার (achar) বানায়। এগুলি খুব ভাল আর সস্তা। অনেকে সমুদ্রে যেতে হলে ইংরেজি বা মুসলমানী (Moor) জাহাজ ব্যবহার করে। এরা এশিয়ার অনেক জায়গার চেয়ে এখানে বেশি ভালো থাকে কারণ সব জিনিস এখানে সস্তা। ভাল গরু এখানে চার শিলিং ছ পেন্স বা দু টাকায় বিক্রি হয়; ঌ টাকায় ভাল শুয়োর পাওয়া যায়; ১ টাকায় ৪৫টি বা ৫০ টি মুরগী পাওয়া যায়। মাছও এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। সব রকম খাবার জিনিস, আর এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী কাপড় এখানে এত প্রচুর পাওয়া যায় যে বহু বিদেশী এই রাজ্যে বাস করে। তাই বার্ণিয়েরের [Bernyer] কথা সত্য বলে মনে হয় যে বাঙ্গালার রাজ্যে প্রবেশের দ্বার অনেক আছে কিন্তু বাহির হবার দ্বার মাত্র একটি। হাজার হাজার লোক যারা অন্য দেশে জন্মেছে, তারা বাঙ্গালা দেশে এসে নিজেদের শেষ জীবন কাটায়।

সাধারণ পোর্তুগীজদের এদেশে স্বাধীন ভাবে থাকতে দেওয়া হয়, তবে যারা ধনী, যাদের ফিদালগো (Fidalgo) বলে, তাদের কাস্টম আর অন্য শুল্ক দিতে হয়, আর মুসলমান শাসকদের সম্মান দেখাতে হয়। কিন্তু এই সব শুল্ক হিন্দু (gentus) বা বাণিয়াদের (Banjan) কাছে যেমন যাতা ভাবে আদায় করা হয়, এদের কাছ থেকে তা করা হয় না।

তবুও মুসলমানরা সুবিধা পেলে এদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করে। যেমন,

১৬৭৬ সালে পোর্তুগীজরা অনেক টাকা যোগাড় ক'রে একটা বড় গির্জা বানাবার উদ্যোগ করছিল। পাথর, ইট, চুণ, কাঠ, ইত্যাদি জড়ো করে, পুরানো বাড়িটি ভেঙে ফেলে তারা নতুন বাড়ির সিকি অংশ যখন বানিয়েছে, তখন মুসলমান শাসকদের আদেশে তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল, আর কারিগরদের বলা হল যে আর কাজ করলে জেলে যেতে হবে। এতে ফাদার আর অন্যরা খুব দুঃখ পান। মুসলমানরা এটা ধর্মের জন্য করেনি, করেছিল টাকার জন্য, কারণ হাজার পাউণ্ড দিলে রাজ্যের যে কোন জায়গায় তারা দু-তিনটে গির্জা বানাতে দেবে।

আমার বিশ্বাস এদেশে ২০,০০০ এর কম ফিরিঙ্গি (Frangues) নেই, আর তাদের মধ্যে অর্ধেক হুগলি নদীর আশেপাশে থাকে।

মুসলমানদের সময় জানবার একটা অদ্ভুত উপায় আছে, আর এটা ইয়োরোপের প্রণালী থেকে একেবারে ভিন্ন। এরা কোন সূর্য ঘড়ি, ঘড়ি বা টেকঁঘড়ি বা বালির ঘড়ি ব্যবহার করে না। কারণ আমার মনে হয় এরা এগুলি বানাতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সময় জানাবার একটা বেশ ভাল উপায় বার করেছে।

প্রথমে এরা খুব বড় একটা বাসনে পরিষ্কার জল রাখে, আর তারপর ছোট একটা তামার বাটি, যাতে আধ পাইন্ট বা এক পাইন্ট জল ধরে, সেই জলে ভাসিয়ে দেয়। বাটিটি খুব পাতলা চাদরের তৈরি, আর তার তলায় একটা ছোট ফুটো। বাটিটি আস্তে আস্তে জল ভরে গিয়ে ডুবে যায়। এটিকে দেখবার জন্য সমানে লোক বসে থাকে। সে তখনি আবার এটিকে ভাসিয়ে দেয়, আর একটা ঘণ্টা বাজায়। যখন আবার ডোবে তখন দুবার ঘণ্টা বাজায়। এমনি করে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭। সাতটা বেজে যাবার পর সে তার পরের বারে এক বার ঘণ্টা বাজায়, অর্থাৎ তখন এক প্রহর (Pore) হ'ল। তার পর যখন আবার বাটিটি ডোবে তখন যে আবার একবার ঘণ্টা বাজায়, অর্থাৎ এক ঘড়ি (Gree)। দুই প্রহর মানে মধ্যাহ্ন বা মধ্য রাত্রি। সকাল নটায় এক প্রহর মধ্যাহ্ন বারটায় দু প্রহর, বিকেল তিনটেয় তিন প্রহর, আর সূর্য ডোববার সময় চার প্রহর। রাত্রেও এই নিয়ম। এদের ঘণ্টা বেলের (bell) মত নয়, মুসলমানদের বেল নেই এদের ঘণ্টা পেগুর কাঁসা [gans of Pegu] বলে এক রকম ভাল কাঁসার তৈরি চাকতি। দেড় ফুট বা দু ফুট বা তার চেয়েও বড়। এগুলি এক পাশে একটি ফুটোর মধ্যে দিয়ে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর নাম গংগ (gonge)। ছোট একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়ে এটা পেটা হয়, আর এর শব্দ আর ধ্বনি খুব মিষ্টি। হিন্দুস্থানের বেশির ভাগ বড়লোক মুসলমান রাস্তার দিকে দরজার কাছে একটা দালান (porch) বানিয়ে এই রকম ঘণ্টা রাখেন। দুজন লোক সেগুলো পেটাবার জন্য থাকে। একজন ঘুমোয় আর অন্য জন জেগে ঘড়ির দেখা শোনা করে। ইংরেজ আর ওলন্দাজরাও এই রাজ্যে আর হিন্দুস্থানের অন্য জায়গায় তাদের ফ্যাক্টরির গেটে এই রকম ঘড়ি রাখে। সেই পুরানো প্রবাদ, যস্মিন দেশে…(cum fueris Romae, etc.)

[সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দ পোর্তুগীজ ভাষা থেকে বা পোর্তুগীজ ভাষা মারফত অন্য ভাষা থেকে এসেছে। অনেক বহু ব্যবহৃত বাঙ্গালা শব্দ, যেমন, চাবি, জানলা, পিপা, ফিতা, ইত্যাদি পোর্তুগীজ ভাষা থেকে নেওয়া। এই সব শব্দগুলির প্রায় সব কটিই বস্তু বা জাতি বিশেষের নাম। এইগুলি ছাড়া এমন কতগুলি পোর্তুগীজ শব্দ আছে, যেগুলি শুধু বাঙালী রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান সমাজেই চলে। সাধারণ বাংলা সাহিত্যে এই সব শব্দের ব্যবহার নেই। রোমান ক্যাথলিক সমাজে যে সব পোর্তুগীজ শব্দ এখনও চলে, তাদের অনেকগুলিকে খুব সম্ভব সমার্থক বাংলা বা ইংরেজি শব্দ ধীরে ধীরে হটিয়ে দিচ্ছে, ও কালে এদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত হয়ে যাবে। পোর্তুগীজ (Terco) শব্দের অর্থ জপমালা। বাঙ্গালা দেশের ক্যাথলিক সমাজে তেরসু শব্দটি বোধহয় এখন প্রচলিত নেই। যে সব পোর্তুগীজ শব্দ বাঙালী ক্যাথলিক সমাজে প্রচলিত ছিল তার একটি সংক্ষেপিত তালিকা এই লেখার শেষে আছে। তবে বিদেশীদের লেখা থেকে সংগৃহীত এই তালিকা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তা জানা নেই। যেমন, এই তালিকা অনুসারে কন্‌ফেসান (পাপস্বীকার) শব্দটি বাঙালী রোমান ক্যাথলিক সমাজে প্রচলিত, আর শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (Confissao) থেকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ঢাকা জেলার ভাষায় কংসার বা কঙ্কসার শব্দ এই অর্থে ব্যবহার হয়, আর শব্দটি পোর্তুগীজ (confessar) শব্দ থেকে নেওয়া। তালিকার শব্দের অধিকাংশই খ্রীস্টান ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের শব্দ। তাই মনে হয় যে ধর্মতত্ত্বের বা দর্শনের কোন পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় পোর্তুগীজ ভাষা থেকে নেওয়া হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় ইস্‌পিরিতো সান্তো (পবিত্র আত্মা, Holy Ghost)। পোর্তুগীজ মিশনারীরা বাঙ্গালা দেশে ধর্মপ্রচারের সময় হিন্দুধর্মের পরিভাষাই ব্যবহার করতেন। বাঙ্গালা ভাষায় কোন পোর্তুগীজ মিশনারীর লেখা প্রথম বই বোধহয় কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। মানো এল্‌-দা-আসসুম্প সাম্‌ বইটি লেখেন ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে। এই বই থেকে একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে:

গুরু। ভাল: এখন নৈরাকারের ভেদ বুঝাও 'মানি যে কেবল এক পরমেশ্বর হয়েন': এহি ভেদ কেমতে বুঝ?

শিষ্য। বুঝি যে বিস্তর পরমেশ্বর নহেন: তিনি কেবল এক, অনন্ত, অপার, অমর, সর্বরীত, সর্ব-জান; আর আর ইত্যাদি যত।

গুরু। 'মানি, যে তিনি পিতা, তিনি পুত্র, তিনি ইস্‌পিরিতো সান্তো।' এহি তিন ভেদ কেমতে বুঝ।

(২)

চলিত বাঙ্গালা ভাষায় এক শ'র কাছাকাছি পোর্তুগীজ ভাষার শব্দ বা পোর্তুগীজদের আমদানি করা অন্য বিদেশী ভাষার শব্দ আছে। তবে এই শব্দগুলির সংখ্যা ঠিক কত তা বলা সম্ভব নয়। এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি কোন কোন অভিধানকারদের মতে পোর্তুগীজ ভাষা থেকে আমদানি, কিন্তু সম্ভবত শব্দটি দেশী। যেমন

গুধড়ী শব্দটি নেওয়া যেতে পারে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ লিখেছেন, "থাসা চীরা বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকন গুধড়ী গায় বাঁকা কোংকা হাতে।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে লিখেছেন যে শব্দটি পোর্তুগীজ (godrim) শব্দ থেকে এসেছে, আর এর অর্থ সন্ন্যাসী ফকীরদের বহির্বাস। চলন্তিকাতে শব্দটি নেই। হিন্দী ও উর্দু ভাষার অভিধানকাররা বলেন যে গুধড়ী আসলে হিন্দী শব্দ, আর এর অর্থ ছেঁড়া পুরানো টুকরো দিয়ে বানানো জামা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে বাঙ্গালা আর হিন্দী গুধড়ী ঠিক একই বস্তু নয়। ওঁর বিপক্ষে যুক্তি এই, যে কোন পোর্তুগীজ লেখক বাংলা শব্দটিকে তাঁদের ভাষা থেকে আমদানি বলে দাবি করেননি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষে বলেছেন যে শব্দটি দেশী আর এর অর্থ কাঁথা।

বিষবৃক্ষতে আছে, "দেবেন্দ্র তখন ঝিমকিনি মারিয়া গাইতে লাগিল—

বয়স তাহার বছর ষোল
দেখতে শুনতে কালো কোলো
পিলে অগ্রমাসে মোলো
আমি তখন খানায় পোড়ে।"

এই খানা শব্দটি চলন্তিকা ও বঙ্গীয় শব্দকোষের মতে পোর্তুগীজ শব্দ (cana) বা (cano) থেকে আমদানি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কিন্তু বলেছেন যে, খানা শব্দ সংস্কৃত খন্ ধাতু থেকে খাত মারফত এসেছে। শব্দটি কবিকঙ্কন মুকুন্দরামও ব্যবহার করেছেন। "পগার খন্দক খানা, উলু কান্দা নলবেণা, নাহি সাধু করে অব্যাহতি।" বাংলা দেশে পোর্তুগীজরা আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। মুকুন্দরাম এই শতাব্দীর শেষের দিকের লোক। খানা-ডোবায় ভরা বাঙ্গালাদেশে এই অতি পরিচিত জিনিসের জন্ম অত শীঘ্র একটি বিদেশী নাম চলিত হয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়না।

জোলাপ শব্দটি সম্বন্ধেও এই ধরণের প্রশ্ন উঠতে পারে। চলন্তিকা বলেছেন যে জোলাপ এসেছে আরবী শব্দ জুল্লাব থেকে। আরবী অভিধানে আছে জুল্লাব শব্দের অর্থ বিরেচক। এই অবধি কোন অসুবিধা নেই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কিন্তু আর এক ধাপ পিছিয়ে বলেছেন যে জুল্লাব শব্দটি এনেছে পোর্তুগীজরা মেকসিকো থেকে। মেক্‌-সিকোর জলাপা (Xalapa) শহরে এক রকম গাছের শিকড় থেকে এই বিরেচক ঔষধ তৈরি হয়। জলাপা অ্যাজটেক ভাষার শব্দ। দাস মহাশয়ের অনুমান বোধহয় ঠিক নয়। মনে হয় তিনি ইংরেজি অভিধানে (jalap) শব্দটি দেখে এই কথা লিখেছেন। (jalap) এর অর্থ বিরেচক ঔষধ। কিন্তু ইংরেজি অভিধানে (julep) বলে আর একটি শব্দ আছে। (julep) শব্দটি আরবী জুল্লাব শব্দ থেকে এসেছে, আর এর অর্থ ঔষধ মেশানো সরবত। তাই মনে হয় আমাদের জোলাপ আরবী জুল্লাব থেকেই এসেছে। প্রায় একই উচ্চারণের অ্যাজটেক ভাষার শব্দটির অস্তিত্ব নেহাতই আকস্মিক।

মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষাগুলি থেকেও পোর্তুগীজরা কিছু শব্দ আমাদের দেশের ভাষাগুলিতে এনে দিয়েছে, যেমন কিরিচ, গুদাম ইত্যাদি। গুদাম জিনিসটি

নিশ্চয় আমাদের দেশে আগেই ছিল, শুধু নামটা পোর্তুগীজরা নিয়ে এসেছে মালয় ভাষার শব্দ (godong) থেকে। আমরা আবার শব্দটিকে (godown) বানিয়ে ইংরেজি ভাষাকে দিয়েছি। কিরিচের বেলা কিন্তু শুধু শব্দটিই নয় জিনিসটিও পোর্তুগীজরা মালয় দেশ থেকে আমাদের দেশে এনেছে।

(৩)

পোর্তুগীজরা চিরকালই চাষবাসের কাজে দক্ষ। অ্যামেরিকা থেকে তারা অনেক গাছগাছড়া আমাদের দেশে নিয়ে এসেছে। অনেক সময় এই সব গাছ, ফল, ইত্যাদির নামগুলিও তারা হয়তো অ্যামেরিকার কোন ভাষা বা পোর্তুগীজ ভাষা থেকে নিয়ে এসেছে। তামাক, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি শুধু পোর্তুগীজদের আমদানি করা গাছ, ফল, ইত্যাদিই নয়, এদের নামগুলিও ওদের আনা। কতকগুলি গাছ বা ফলের বেলা কিন্তু নামকরণটা আমাদের দেশেই হয়েছে। বিদেশ থেকে আমদানি হলেও যে সব তরকারির নাম দেশী, তাদের মধ্যে প্রধান হল আলু। দক্ষিণ অ্যামেরিকার ইন্‌কা জাতির প্রধান খাদ্য ছিল আলু। তাদের দেশ থেকে স্পেনের লোকেরা ইয়োরোপে আলু নিয়ে আসে। সেখান থেকে পোর্তুগীজরা আমাদের দেশে আলু নিয়ে আসে। আলু নামটা কিন্তু দেশী, পোর্তুগীজদের আমদানি করা নয়। দেশী নাম হওয়ার কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের দেশে এই রকম কন্দ জাতীয় তরকারি, যেমন রাঙালু, শাঁকালু, চুবড়ি আলু, ইত্যাদি হয়তো আগে থেকেই ছিল। তাই এই নতুন কন্দের নাম সহজেই গোলআলু বা আলু হয়ে যায়, অনেকে যেমন টম্যাটোকে বিলিতি বেগুন বলেন। আলু শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে তা ঠিক জানা নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "বাঁশ বনের ধারে বুনলে আলু, আলু হয় গাছ বেড়ালু।" (খনার বচন)। এ আলু আমাদের গোল আলু নয়, অন্য আলু, চুবড়ী আলু। কিন্তু আলু "শব্দটি পারসী।" (রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ)। ফারসী অভিধানে লেখা আছে আলু শব্দটি হিন্দী। হিন্দী সংক্ষিপ্ত শব্দসাগরে আছে যে শব্দটি বোধহয় সংস্কৃত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঋ ধাতু থেকে শব্দটি বানানোর চেষ্টা করেছেন, "ঋ = গমন করা + উ (কর্তৃবাচ্যে)র = ল, আরু = আলু, মাটিতে বা জলে যে গমন করে।"

অ্যামেরিকা থেকে পোর্তুগীজদের আনা আরও কয়েকটি ফুলফলের নাম দেশী, যেমন, কামরাঙা, কৃষ্ণকলি, ভুট্টা, লঙ্কা, হিজলি বাদাম (বা কাজু বাদাম, কাজু নামটি কিন্তু পোর্তুগীজদের আমদানি করা)। টম্যাটো ফলটিও এসেছে অ্যামেরিকা থেকে, তবে পোর্তুগীজরা এই ফল আমাদের দেশে আনেনি। টম্যাটো আমাদের দেশে এনেছে ইংরেজরা।

(৪)

কিছু পোর্তুগীজ শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় কমে আসছে। উদাহরণ স্বরূপ রেস্ত শব্দটি ধরা যেতে পারে। আজকাল সাহিত্যের ভাষায় রেস্তর ব্যবহার কমে যাচ্ছে। সৈয়দ মুজতবা আলী মাঝে মাঝে শব্দটি ব্যবহার করতেন : "রেস্তর অভাব বলে উঠেছে

এক সস্তা হোটেলে।" (দেশ, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬১)। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা হুতোম প্যাচার নক্শাতে শব্দটি অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়েছে, যেমন "রেস্তহীন গুলিখোর", "রেস্তহীন মুচ্ছদী", 'দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ি পালকি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন', ইত্যাদি। সেই সময় শব্দটির ব্যবহার বেশি ছিল।

ব্যবহারের অভাবে বাঙ্গালা ভাষা থেকে যে সব পোর্তুগীজ শব্দ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল প্রমারা খেলার শব্দগুলি। প্রমারা এক রকম তাসের জুয়া। পোর্তুগীজরা এই খেলা আমাদের দেশে আনে। এই খেলার পাঁচটি শব্দ, প্রমারা, কোরেস্তা, তেরেস্তা, ফিক্র ও বিন্তি পোর্তুগীজ ভাষা থেকে নেওয়া। (কিছুদিন আগে অবধি যে বিন্তি খেলা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, সে খেলা গ্রাবুর মতন। তার সঙ্গে প্রমারার কোন সম্পর্ক নেই)। প্রমারা বোধহয় আজকাল উঠে গেছে। তবে উনবিংশ শতাব্দী অবধি এই খেলা বাঙ্গালা দেশে বেশ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। হেমচন্দ্র লিখেছেন, "ফিক্রদানে এক তাড়াতে কল্লে বাজী মাৎ।"

(৫)

বাংলা ভাষায় পোর্তুগীজ শব্দের তালিকা প্রধানত তিনটি অভিধানের সাহায্যে বানানো। এইগুলি হল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭), রাজশেখর বসুর চলন্তিকা (দশম সংস্করণ, ১৯৬৬), ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৬৭ সালের মুদ্রণ)। ইংরেজি বইগুলির মধ্যে (J. J. Campos-এর Protuguese in Bengal, (1919) পুস্তকের শেষে একটি শব্দের লিস্ট দেওয়া আছে। এই লিস্টের অধিকাংশ শব্দই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের শব্দ। এশিয়ার ভাষাগুলিতে পোর্তুগীজ শব্দের প্রভাব নিয়ে সব চেয়ে বেশি গবেষণা করেছেন গোয়ার ধর্মযাজক Monsignor Sebastiao Rodolfo Dalgado। (দালগাদো বংশের প্রাচীন নাম দেশাই)। দালগাদোর লেখা পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ করেন A. X. Soares। অনুবাদের নাম Influence of Portuguese Vocables in Asiatic Languages, (Baroda, 1936) বইটি থেকে এই প্রবন্ধে অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া হবসন জব্‌সন্, সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দ-সাগর প্রভৃতি যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

পোর্তুগীজ নামটি বাঙ্গালায় চলিত হবার আগে জিনিসটির দেশী নাম কি ছিল, তা জানবার একটি উপায় হল আস্ সুম্পসাম্ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের শেষে দেওয়া বাঙ্গালা পোর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ (১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। পুস্তকটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ)।

(১) আচার। তৈলাদি সহযোগে রক্ষিত অম্ল খাদ্য। শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে সাজান বলে প্রথমেই আচার শব্দটি এসেছে। বস্তুত এই তালিকায় আচার শব্দটি মোটে ধরা উচিত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। ধরার সপক্ষের যুক্তি এই যে, প্রায় সব বাঙ্গালা অভিধানকাররাই বলেছেন যে শব্দটি পোর্তুগীজ (achar) শব্দ থেকে আমদানি। বিপক্ষের যুক্তি এই যে, আদি পোর্তুগীজ ভাষায় (achar) বলে কোন শব্দ নেই। যদি পোর্তুগীজরা এই শব্দটি আমাদের দেশে আমদানি করে থাকে, তাহলে এটিকে তারা পেয়েছে এশিয়ারই কোন ভাষা থেকে। হব্‌সন জব্‌সনের মতে 'আচার' ল্যাটিন ভাষার শব্দ (acetaria) থেকে পশ্চিম এশিয়া হয়ে আমাদের দেশে ঢুকে থাকতে পারে, আর ফার্সী ভাষাতে এর আচার রূপ প্রথম প্রকাশ পায়। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দ-সাগরের মতে 'আঁচার' শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে নেওয়া। ইরানে আর আফগানিস্থানে, যেখানে ফার্সী ভাষার প্রচলন আছে, সেখানে কিন্তু আচার শব্দটি চলেনা। সৈয়দ মুজতবা আলী লেখককে একবার জানিয়েছিলেন যে ঐ সব দেশে প্রচলিত শব্দ হল তুর্ষ (টক)। মোটকথা আচার শব্দের বংশ পরিচয় ঠিক জানা নেই।

(২) আতা। আতা ফল আর তার নাম পোর্তুগীজরা আমাদের দেশে এনেছে মেক্সিকো বা ব্রেজিল থেকে। গত শতাব্দীতে আতা শব্দটি নিয়ে আমাদের দেশে অনেক চর্চা হয়। মথুরা, অজন্তা আর বরহুতের প্রস্তর চিত্রে আতার মত দেখতে, কিন্তু অনেক বড় আকারের ফলওয়ালা একরকম গাছ দেখা যায়। তাই দেখে জেনারেল কানিংহাম বলেন যে আতা ভারতবর্ষেরই ফল, আর এর সংস্কৃত নাম আতৃপ্য। অন্যরা বলেন যে পোর্তুগীজরা আসবার আগে আতা এদেশে ছিল না। তাই যে ছবি দেখতে পাওয়া যায় তা হয় কাঁঠালের নয় কদমফুলের। শব্দকল্পদ্রুমে আতৃপ্যম্ শব্দটি আছে। অর্থ লেখা আছে, "ফলবিশেষ। আতা ইতি ভাষা।" ম্যাক্সমূলার বলেন যে আতৃপ্যম্ শব্দটি নবগঠিত, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার নয়।

(৩) আনারস। আনারস দক্ষিণ অ্যামেরিকার ফল। পেরু আর ব্রেজিলের প্রাচীন ভাষায় এর নাম (nana বা nanas)। তাই থেকে পোর্তুগীজরা এর নাম বানায় (ananas)। অবুল ফজল তাঁর আইন-ই-অকবরীতে আর জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে এই ফলের তারিফ করেছেন। পোর্তুগীজ (ananas) থেকে হিন্দী শব্দ অনন্নাস হয়েছে। বাংলাতে শব্দটি কি করে আনারস হয়ে গেল? সুকুমার সেন লিখেছেন, "পোর্তুগীস্ আনানস্ 'রস' শব্দের প্রভাবে বাঙ্গালায় 'আনারস' হইয়াছে" (ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৭)।

(৪) আয়া। পোর্তুগীজ শব্দ (aia) থেকে আয়া শব্দটি এসেছে। খুব সম্ভব দেশী শব্দ আই'র [=মাতা। "শ্যামশুক্লরূপে দেখিলেন শচী আই।" (চৈতন্য ভাগবত)] ধ্বনিসাদৃশ্যে শব্দটি সহজেই আমাদের ভাষায় ঢুকে পড়েছে। দালগাদো অনুমান করেছেন যে, ধ্বনিসাদৃশ্য হয়েছে আরবী-ফার্সী শব্দ "দায়া" [=দাই] শব্দের সঙ্গে।

(৫) আলকাতরা। পোর্তুগীজ (alcatrao) থেকে শব্দটি এসেছে। পোর্তুগীজরা শব্দটি নিয়েছে আরবী আলকাতরাহ বা আলকাতরান শব্দ থেকে শব্দের গোড়াতে আল থেকে যাওয়াতে মনে হয় বাঙ্গালাতে আলকাতরা শব্দটি সোজা আরবী থেকে আসেনি, পোর্তুগীজ ভাষার মারফত এসেছে। আরবী অল অনেকটা ইংরেজি (The)র মত।। তাই সোজা আরবী থেকে এসে থাকলে শব্দটি হয় কাতরা নয় কাতরান হত। হিন্দীর সঙ্গে আরবীর সম্পর্ক বাংলার চেয়ে বেশি। হিন্দী কিন্তু আরবী শব্দটি গ্রহণ করেনি। হিন্দীতে আলকাতরাকে বলে ডামর।

(৬) আলপিন। এই শব্দটি পোর্তুগীজ (alfinete) থেকে এসেছে। সংস্কৃত "অল" এর [=হুল] সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্যের জন্য বোধহয় শব্দটি সহজে আমাদের ভাষায় ঢুকে পড়েছে।

(৭) আলমারি। এই শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (armario বা almario) শব্দ থেকে। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রধান ভাষায় আলমারি শব্দটি প্রচলিত। ইংরেজি ভাষাতে শব্দটি গিয়েছে বাংলা বা হিন্দী থেকে।

(৮) ইংরেজ। পোর্তুগীজ (Ingles) শব্দ থেকে আমরা ইংরেজ শব্দটি পেয়েছি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে লিখেছেন, "ভারতের রাজপদ পাবার পর সংস্কার জড়িত উচ্চারণ বিকারে" শব্দটি ইংরাজ হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের থিয়োরি প্রমাণ করা শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা ইংরেজ লিখতেন। তাঁর লেখায় ইংরাজ নেই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় শব্দটির ব্যবহারে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর লেখায় শব্দটির রূপ ইংরাজ, আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি তিনি ইংরাজই লিখতেন। এই সময় থেকে তিনি ইংরেজ লেখা আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের থিয়োরি অনুসারে তাঁর গোড়ার দিকের লেখায় ইংরেজ আর শেষের দিকের লেখায় ইংরাজ থাকা উচিত ছিল। হয়েছে ঠিক উল্টো। ঠিক কবে তিনি ইংরাজ ছেড়ে ইংরেজ লেখা আরম্ভ করেন তা বলা শক্ত। রাজাপ্রজা গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি থেকে এই বিষয়ে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি ১৮৯৩ থেকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা। যে সব প্রবন্ধ ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগে লেখা, অর্থাৎ "ইংরাজ ও ভারতবাসী" থেকে "কণ্ঠরোধ" অবধি সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার পরের প্রবন্ধগুলিতে অর্থাৎ যেগুলি ১৯০৫-এর পরে লেখা, সেগুলিতে তিনি ইংরেজ লিখেছেন। শুধু এই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ "সমস্য"। [১৯০৮ খ্রীঃ]তে একবার মাত্র ইংরাজ লিখেছেন,—"ইংরাজ সাহিত্য সমালোচক"। এরপর বোধহয় গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ আর কখনও ইংরাজ লেখেননি। কবিতায় ছন্দের খাতিরে, অবশ্য লিখেছেন, "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ" (১৯১০ খ্রীস্টাব্দ)।

(৯) ইস্তিরি। চলন্তিকা আর বঙ্গীয় শব্দকোষের মতে ইস্তিরি শব্দ পোর্তুগীজ (estirar) শব্দ থেকে এসেছে। (Estirar) শব্দের অর্থ হল টানা বা ছড়ান বা বিস্তৃত করা। দালগাদোও চলন্তিকার মতের সমর্থন করেন। দালগাদো বলেছেন যে পোর্তু-গীজরা আসবার আগে ভারতবর্ষে লোহার ইস্তিরির ব্যবহার ছিল না; এই কাজটা

পোর্তুগীজরা এদেশে শিখিয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কিন্তু শব্দটিকে পোর্তুগীজ থেকে আমদানি বলেননি। তাঁর মতে ইস্তিরি এসেছে সংস্কৃত "স্তরী" থেকে, যার অর্থ "যে স্তরে স্তরে রাখে বা ভাঁজ করে।" এই মতের সমর্থনে অবশ্য বলা যায় যে আমরা যাকে ইস্তিরি করা বলি পোর্তুগীজ (Estirar) শব্দে ঠিক সেই কাজ বোঝায় না।

(১০) ইস্পাত। এই শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (Espada) থেকে। (Espada) মানে কিন্তু তলোয়ার। ইচ্ছা করলে সংস্কৃত অয়স-পত্র (পাত) থেকেও ইস্পাত বানান যায় ; তবে মনে হয় (Espada) থেকেই বাংলা ইস্পাত এসেছে।

(১১) এন্তার। এন্তার শব্দের অর্থ দেদার বা অজস্র। চলন্তিকা ও বঙ্গীয় শব্দকোষের মতে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (entaro) থেকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন যে শব্দটি ইংরেজী (entire) থেকে এসে থাকতে পারে। মনে হয় আরবী ইন্তিহা (শেষ, সীমা) থেকেও শব্দটি আসা সম্ভব।

(১২) ওলন্দা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (hollanda) থেকে। ওলন্দা মানে বিলাতী মটর বা ওলন্দা কড়াই। শব্দটি চলন্তিকা বা বঙ্গীয় শব্দ-কোষে নেই। বোধহয় শব্দটির ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষা থেকে উঠে গেছে।

(১৩) ওলন্দাজ। শব্দটি পোর্তুগীজ (Hollandez) থেকে এসেছে। সাহিত্যে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বোধহয় ভারতচন্দ্র,

> 'প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
> ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গী ফরাস॥
> দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
> সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী।'

অনেক ছোট শব্দ হলেও ইংরেজী ডাচ্, পোর্তুগীজ ওলন্দাজকে বাংলা ভাষা থেকে হটাতে পারেনি। হিন্দীতে কিন্তু ওলন্দাজ শব্দটি কখনও চলিত হয়নি। হিন্দী খবরের কাগজে আজকাল ডাচ্ শব্দটি ব্যবহার হয়।

(১৪) কপি। বাঁধাকপি, ফুলকপি, এগুলি এশিয়ার সব্জি। এগুলিকে বোধহয় পোর্তুগীজরা আমাদের দেশে আমদানি করেনি। কপি শব্দটি এসেছে কিন্তু পোর্তুগীজ (couve) শব্দ থেকে . ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক মাসিক পত্রের আগস্ট ১৯৬৯-এর সংখ্যায় শাক-সব্জি সম্বন্ধে একটি লেখা বেরোয়। তাই থেকে কপি সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। ফুলকপির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ইয়োরোপে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্লীনি ফুলকপির কথা লিখেছেন। লণ্ডনের বাজারে ফুলকপি প্রথম বিক্রি হয় ১৬১৯ সালে। যতদূর জানা আছে, বাঁধাকপির প্রথম চাষ হত তুরস্কে। এই দেশ থেকে খ্রীষ্টজন্মের আগে কেল্ট বা সেল্ট (Celt)রা ইয়োরোপে বাঁধাকপি নিয়ে যায়। বাঁধাকপির যাবতীয় নাম কেল্টিক ভাষার শব্দ (kap) (মাথা) থেকে এসেছে : যেমন ইংরেজি (cabbage), ফরাসী (caboche), ইত্যাদি। কপি বাঙ্গালা দেশে কবে আমদানি হয় জানা নেই। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে কপির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কয়েকটি রন্ধনের তালিকা আছে। কোনটিতেই কপির

কথা নেই। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দের স্ত্রী পদ্মমুখীর রান্নার লিস্ট দিয়েছেন। সেই লিস্টেও কপি নেই।

হিন্দীতে বাঁধাকপিকে বলে করমকল্লা। শব্দটি বোধহয় ফারসী। আসসুম্পসামের শব্দাবলীতে (couve) শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে করম (corom)।

(১৫) কফি। এই শব্দটি পোর্তুগীজ (cafee) থেকে এসেছে না তুর্কী (kaphe) থেকে এসেছে তা জানা নেই। কফি গাছের উৎপত্তিস্থল অ্যাবিসিনিয়ার কাফা (Kaffa) নামে জায়গায়।

(১৬) কাকাতুয়া। এই শব্দটি মালয় ভাষার। পোর্তুগীজরাই বোধহয় এই পাখি ও তার নাম প্রথম আমাদের দেশে আনে।

(১৭) কাজঘর। বোতামঘরকে কাজ বা কাজঘর বলে। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (casa) থেকে। বাংলা ছাড়া হিন্দুস্থানী, মারাঠী, গুজরাটী ও তামিলেও শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগরের মতে কিন্তু কাজ শব্দটি এসেছে আরবী শব্দ কায়জহ্ থেকে।

(১৮) কাজু। কাজু বাদামকে আগে সাধারণত হিজলি বাদাম বলা হত। চলন্তিকা বঙ্গীয় শব্দকোষ ও বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে কাজু শব্দের উল্লেখ নেই, তবে চলন্তিকায় হিজলি বাদামের অর্থ কাজু বাদাম লেখা আছে। ব্রেজিলের প্রাচীন ভাষায় শব্দটি ছিল (acaju)। পোর্তুগীজরা সেই দেশ থেকে এই গাছ আমাদের দেশে আমদানি করে।

(১৯) কাতান। কাতানের অর্থ দা বা কাটারি। পোর্তুগীজ (catana) শব্দের মানে বড় চওড়া তলোয়ার। চলন্তিকায় আছে যে, এই (catana) থেকেই বাঙ্গালা কাতান শব্দ এসেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কিন্তু বলেছেন যে, কাতান এসেছে সংস্কৃত শব্দ কর্তন থেকে। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন, "কাতান দৈবক্রমে পাওয়া গেল, তাহাতে গুণ কাটিয়া দেওয়া হইল।" এখানে কাতান মানে মনে হয় কাটারি, তলোয়ার নয়। তলোয়ার অর্থে কাতান শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায় বোধহয় নেই। তাই মনে হয় কাতান দেশী শব্দ।

(২০) কানেস্তারা। চলন্তিকায় আছে যে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ (canastra) থেকে। মনে হয় এই অনুমান ঠিক নয়। পোর্তুগীজ ভাষায় যদি (canastra) শব্দটি থাকে তাহলে তারা এই শব্দটি স্প্যানিশ ভাষা থেকে নিয়েছে। আর স্প্যানিশ ভাষায় শব্দটির অর্থ ঝুড়ি। তাই মনে হয় বাংলা কানেস্তারা ইংরেজি (canister) থেকে নেওয়া।

(২১) কাফরী। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব অংশে বাণ্টু পরিবারের কাফরী বা কাফির জাতির বাস। পোর্তুগীজরা বাংলা দেশে কাফরী শব্দটি আফ্রিকার সব কালো জাতির নাম হিসাবে চালিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় শব্দটির খুব প্রচলন ছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। "মধুসদন খর্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ এবং তাহার চুল কাফ্রির মত" (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ)। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে, "ফরাসী তো আছেই; তাছাড়া ভারতবাসী, আসামী, আরব

বা আলজিরিয়ার লোক, জনা কয়েক কাফরী আর দু পাঁচ জন চীনা" [রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ]। আফ্রিকার কালো দেশগুলি স্বাধীন হবার পর কাফরী শব্দটির ব্যবহার বাংলা ভাষা থেকে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

(২২) কাবার। কাবার শব্দের অর্থ শেষ : যেমন মাস কাবার, ইস্তক বিস্তি কাবার, ইত্যাদি। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (acabar) [=শেষ করা] থেকে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ছাড়া কাবার শব্দটি শুধু কোঙ্কনীতে আছে।

(২৩) কামরা। ল্যাটিন শব্দ (camera) থেকে পোর্তুগীজ শব্দ (camera)। তাই থেকে বাংলা শব্দ কামরা। ল্যাটিন শব্দটি আবার ইংরেজির মারফত বাঙ্গালা ভাষায় ঢুকেছে ক্যামেরা হয়ে।

(২৪) কামিজ। কামিজ আসলে আরবী ভাষার শব্দ। পোর্তুগীজরা শব্দটি আরবী থেকে নেয়। অনেকে অনুমান করেন যে বাংলাতে শব্দটি পোর্তুগীজ ভাষার মারফত এসেছে, সোজা আরবী থেকে আসেনি।

(২৫) কারতুজ। এই শব্দটি হয় পোর্তুগীজ (cartucho), নয় ফরাসী (cartouche) থেকে নেওয়া।

(২৬) কালাপাতি। নৌকার ছিদ্র বন্ধ করাকে কালাপাতি করা বলে। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় শব্দটির ব্যবহার বিশেষ নেই। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (calafate) থেকে। দালগাদো অনুমান করেছেন যে, পোর্তুগীজরা হয়তো শব্দটি আরবী থেকে পেয়েছে।

(২৭) কিরিচ। কিরিচ মালয় দেশের ছোরা। সে দেশে এর নাম [k(i)ris]। পোর্তুগীজরা এই ছোরা আর তার নাম আমাদের দেশে আনে।

(২৮) কেদারা। পোর্তুগীজ শব্দ (cadeira) থেকে বাংলা কেদারা এসেছে। আজকাল চেয়ার কেদারাকে হটিয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চেয়ার বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রিয় শব্দ ছিল কেদারা বা চৌকি। শেষের কবিতায় অজস্র ইংরেজি শব্দ আছে, কিন্তু চেয়ার নেই : "অমিত গেলনা, আরাম কেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে"। [আরাম কেদারার আরাম এসেছে ইংরেজি arm-chair এর arm থেকে, কেননা এই কেদারায় বসা আরামের—সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৭]।

(২৯) কোরেস্তা। প্রমারা খেলায় কোরেস্তার অর্থ চল্লিশ। পোর্তুগীজ (Quarante) শব্দ থেকে এর আমদানি।

(৩০) ক্রুশ। শব্দটি বাংলাতে এসেছে পোর্তুগীজ cruz থেকে।

(৩১) গরাদে বা গরাদিয়া। এই শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ Grade থেকে। গরাদে মানে লোহা বা কাঠের সিক বা ছড়, যেমন জানলার গরাদে। ধ্বনি-সাদৃশ্য থাকলেও গারদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। গারদ এসেছে ইংরেজি Guard থেকে।

(৩২) গামলা পোর্তুগীজ gamela শব্দ থেকে গামলা এসেছে। আনন্দময়ুপসামের

শব্দাবলীতে gamela-র দুটি বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে, তামারি আর তাগারি। তাগারি শব্দটির পশ্চিমবঙ্গে প্রচলন নেই। ঢাকা অঞ্চলে তাগারি মানে রাঁধবার কড়া। হিন্দীতে তাগারি মানে গামলা। তামারি বাঙ্গালা দেশের কোন আঞ্চলিক শব্দ হতে পারে।

(৩৩) গির্জা। শব্দটি পোর্তুগীজ igreja শব্দ থেকে এসেছে। Igreja শব্দটি ল্যাটিন ecclesia শব্দের অপভ্রংশ। উত্তর ভারতের সব ভাষায় গির্জা শব্দটি প্রচলিত। কোঙ্কণীতে বলে ইগর্জা। দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে শব্দটি চলিত হয়নি।

(৩৪) গুধড়ী। শব্দটি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে পোর্তুগীজ godrim থেকে নেওয়া।

(৩৫) চা। শব্দটি চীনদেশীয়। চীনালিপিতে যে ছবি দিয়ে চা লেখা হয় তাকে দুরকম ভাবে পড়া যায়: মান্দারিন বুলিতে ছা, আর ফুকিয়েনের বুলিতে তে। জাপান, ইন্দোচীন, পোর্তুগাল, গ্রীস আর রাশিয়াতে প্রথম উচ্চারণটি গ্রহণ করা হয়। বাকি সব ইয়োরোপীয় ভাষায়, আর আমাদের দেশে তামিল, তেলেগু আর মালয়ালী ভাষায় দ্বিতীয় উচ্চারণটি গ্রহণ করা হয়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উচ্চারণটিই স্বীকৃত। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে পোর্তুগীজরাই শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় এনেছে।

(৩৬) চাবি। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ chave থেকে। প্রাচীন শব্দ কুঁজিকে চাবি হটিয়ে দিয়েছে। প্রবাদ বাক্যেও এখনও চাবি বলা হয়, "ঘর সর্বস্ব তোমার, চাবি কাঠিটি আমার।"

(৩৭) জানলা বা জানালা। পোর্তুগীজ janela থেকে জানলা শব্দের উৎপত্তি। জানলার বোধহয় চলিত বাঙ্গালায় কোন প্রতিশব্দ নেই, তবে বাতায়ন, যার আক্ষরিক অর্থ ভেন্টিলেটার, কবিতায় জানলা অর্থে ব্যবহার হয়। হিন্দীতে জানলাকে বলে খিড়কি, কিন্তু বাংলায় খিড়কির সাধারণ অর্থ বাড়ির পিছনের দরজা। আস্‌সুম্‌পসাম তাঁর পোর্তুগীজ বাঙ্গালা শব্দাবলীতে Janelaর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়েছেন ঝরোখা। বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিরাও জানলা অর্থে শব্দটির ব্যবহার করতেন। জ্ঞানদাস লিখেছেন, "সখীগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁকি। আরতি অধিক তৃপত নহ আঁখি॥

(৩৮) জুয়া। মনে হয় শব্দটি সংস্কৃত শব্দ দ্যুত থেকে এসেছে, তবে কোন কোন পোর্তুগীজ লেখক অনুমান করেছেন যে শব্দটি পোর্তুগীজ jogar থেকেও এসে থাকতে পারে। চৈতন্য ভাগবতে আছে, "কেহ বলে মোর পুত্র পরম জুয়ার। মোর এই বর যেন না খেলায় আর।" চৈতন্য ভাগবত ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা। পোর্তুগীজরাও বাঙ্গালা দেশে ঐ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসে। অত শীঘ্র তাদের jogar শব্দ জুয়া রূপ নিয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়না।

(৩৯) টোকা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, তিন-জনেই বলেছেন যে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ touca থেকে। পোর্তুগীজ লেখকরা কিন্তু শব্দটিকে দাবি করেননি। কবিকঙ্কণ টোকার উল্লেখ করেছেন—

বিউনি চালনি ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা
জীবিকার হেতু এক চিতে।

টোকার ব্যবহার নিশ্চয় বাংলা দেশে পোর্তুগীজরা আসবার আগে থেকেই ছিল, কাজেই হঠাৎ তার জন্য একটি বিদেশী নাম গ্রহণ করা হয়েছিল বলে মনে হয়না। তাই মনে হয় শব্দটি দেশী। তাছাড়া, আস্সুম্পসামও পোর্তুগীজ touca শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিয়েছেন পাগড়ি বা পাগ। বাংলা টোকা তো পাগড়ি নয় তালপাতার ছাতা।

(৪০) তামাক। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি স্পেনের লোকের অ্যামেরিকা থেকে ইয়োরোপে প্রথম তামাক নিয়ে আসে। স্পেনের ভাষায় তামাককে বলে tabaco। Tabaco শব্দটি কোথা থেকে এলো জানা নেই। কেউ কেউ অনুমান করেন যে Tobago দ্বীপের নাম থেকে tabaco এসেছে ; আবার অনেকে বলেন যে এই দ্বীপ-বাসীরা অতিরিক্ত তামাক সেবন করত বলে দ্বীপের নাম Tobago হয়েছে। এই tabaco থেকে ইয়োরোপের সমস্ত ভাষায় আর ভারতবর্ষের, এক কোঙ্কণী বাদে, যাবতীয় ইন্দো-আর্য ভাষায় তামাকের নাম এসেছে। পোর্তুগীজরা আমাদের দেশে তামাক আর তার নাম আমদানি করে। আশ্চর্য এই যে, গোয়াতে, যেখানে চারশ বছর ধরে পোর্তুগীজদের রাজত্ব ছিল সেখানকার ভাষা কোঙ্কণীতে এই শব্দটি চলিত হয়নি। কোঙ্কণীতে আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে তামাককে বলে ধূমপান করবার পান। পাছে সাধারণ পানের সঙ্গে ভুল হয় তাই সাধারণ পানকে বলে খাবার পান।

বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তামাকু লিখতেন। "গদির উপর মসনদ করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় অম্বরি তামাকু চড়াইয়া মর্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন।" (কৃষ্ণকান্তের উইল)। তবে তামাকু বোধহয় সেই সময় শুধু সাধুভাষায় ব্যবহার হত। চলিত ভাষায় তামাকই প্রচলিত ছিল। "নবীন চকমকি ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন।" (হুতোম প্যাঁচার নক্শা)।

(৪১) তিজেল। চেপটা হাঁড়িকে তিজেল বলে। শব্দটি পোর্তুগীজ tigela শব্দ থেকে এসেছে। আস্সুম্পসাম tigelaর বাংলা প্রতিশব্দ দিয়েছেন তেলৈন। সাহিত্যে তেলৈন শব্দের ব্যবহার বোধহয় নেই, তবে কাছাকাছি শব্দ তেলানী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে : "তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল।" বসন্তরঞ্জন রায় লিখেছেন তেলানীর অর্থ ছোট হাঁড়ি, এটি ২৪ পরগণার প্রাদেশিক শব্দ।

(৪২) তেরেস্তা। প্রমারা খেলার শব্দ তেরেস্তান অর্থ ত্রিশ। পোর্তুগীজ শব্দ trinta থেকে শব্দটি এসেছে।

(৪৩) তোয়ালে। চলন্তিকার মতে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ toalha থেকে। দালগাদোও এই কথার সমর্থন করেছেন। মনে হয় চলন্তিকার অনুমান ঠিক নয়। খুব সম্ভব শব্দটি ইংরেজি towel থেকে আমদানি, কারণ তোয়ালে ব্যবহার করা আমরা বোধহয় ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি। তার আগে গামছাই চলত।

(৪৪) তোলো। রাজশেখর বসু ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ talha থেকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন যে শব্দটি হয় সংস্কৃত থেকে নেওয়া, নয় কোন দেশী শব্দ। শুধু তোলো শব্দটির ব্যবহার বোধহয় বাঙ্গালা

ভাষায় নেই। যদি এই রকম ব্যবহার থাকে, তাহলে বোধহয় বলা যায় যে শব্দটি পোর্তুগীজ থেকে এসে থাকতে পারে। সাধারণত কিন্তু তোলো-হাঁড়ি এই যুক্ত শব্দই দেখা যায়। যেমন নীলদর্পণে আছে, "যার পানে চাই তানারি মুখ তোলো-হাঁড়ি"। মুখ তোলো-হাঁড়ি মানে মুখ গম্ভীর ও কৃষ্ণবর্ণ। খুব সম্ভব তোলো-হাঁড়ি মানে যে হাঁড়ি না মেজে বা পরিষ্কার করে তুলে রাখা হয়। তাই গম্ভীর কালো মুখ তোলো-হাঁড়ির সঙ্গে তুলনীয়। তোলো-হাঁড়ির তোলো তাই মনে হয় দেশী শব্দ, পোর্তুগীজ থেকে আমদানি করা নয়।

(৪৫) নিলাম। পোর্তুগীজ leilao শব্দ থেকে নিলাম শব্দটি এসেছে। Leilao শব্দের উৎপত্তি কী করে হল তা জানা নেই। হয়তো আরবী অল-ইলাম (ঘোষণা, বিজ্ঞাপন) শব্দ থেকে এই শব্দটি বানান হয়েছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ (অষ্টাদশ শতাব্দী) শব্দটির ব্যবহার করেছেন, "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারি।"

(৪৬) নোনা। পোর্তুগীজরা এই ফল আমাদের দেশে অ্যামেরিকা থেকে আনে। পোর্তুগীজ ভাষায় এই ফলের নাম anona।

(৪৭) পরাত। সব বাঙালী অভিধানকাররাই বলেছেন যে পরাত শব্দটি পোর্তুগীজ prato শব্দ থেকে নেওয়া। দালগাদো কিন্তু পরাত শব্দটি পোর্তুগীজ থেকে নেওয়া বলে দাবি করেননি। পরাত হিন্দীতেও ব্যবহার হয়। সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দসাগরের মতে পরাত এসেছে সংস্কৃত পাত্র থেকে।

(৪৮) পাঁউরুটি। পোর্তুগীজ pao শব্দের অর্থ খামিরা দ্বারা স্ফীত আটার রুটি। তাই থেকে বাঙ্গালা জোড়া শব্দ পাঁউরুটি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই। (লোকরহস্য)।

(৪৯) পাতি। পাতি মানে ছোট বা নিকৃষ্ট। যেমন পাতিলেবু, পাতিকাক বা পাতিহাঁস। পোর্তুগীজ ভাষাতে (pato) মানে হাঁস। এই থেকে দালগাদো অনুমান করেছেন যে বাংলা পাতিহাঁসের পাতি এই (pato) শব্দ থেকে নেওয়া। এই অনুমান বোধহয় ঠিক নয়, তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একে অসম্ভব বলেননি। তাঁর মতে পাতি শব্দটি হয় দেশী নয় পোর্তুগীজ শব্দ (pato) থেকে আমদানি।

(৫০) পাদ্রী। পোর্তুগীজ (padre) শব্দ থেকে আমরা পাদরী পেয়েছি।

(৫১) পিপা। শব্দটি সোজা পোর্তুগীজ (pipa) থেকে নেওয়া। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই শব্দটি প্রচলিত।

(৫২) পিরিচ। এই শব্দটি (pires) রূপে পোর্তুগীজরা আমাদের দেশে আমদানি করে। তবে অন্য কোন ইয়োরোপীয় ভাষায় (pires) বা এর কাছাকাছি উচ্চারণের কোন শব্দ নেই। খুব সম্ভব মালয় ভাষার শব্দ (piring) থেকে পোর্তুগীজরা (pires) শব্দটি বানিয়েছিল।

(৫৩) পিস্তল। অনুমান করা হয় যে পোর্তুগীজ শব্দ (pistola) থেকে বাঙ্গালা

পিস্তল শব্দ এসেছে। ইংরেজি শব্দ (pistol) আর ওলন্দাজী শব্দ (pistool)-ও ধ্বনির দিক দিয়ে পিস্তলের কাছাকাছি।

(৫৪) পেঁপে। পেঁপে অ্যামেরিকার ফল। পোর্তুগীজরা এই ফল আমাদের দেশে আমদানি করে। এর পোর্তুগীজ নাম (papaia) বোধহয় অ্যামেরিকার কোন আদি ভাষা থেকে নেওয়া।

(৫৫) পেয়ারা। এই ফল পোর্তুগীজরা অ্যামেরিকা থেকে আমাদের দেশে আনে। পেয়ারা শব্দটি কিন্তু অ্যামেরিকান নয়। নাসপাতি জাতীয় ফল পেয়ারকে (pear) পোর্তুগীজ ভাষায় (pera) বলে। সাদৃশ্য আছে বলে এই ফলের নামও ওরা (pera) রাখে। তাই থেকে বাঙ্গালা শব্দ পেয়ারা। হিন্দীতে পেয়ারাকে বলে অমরুদ। অমরুদ ফার্সী শব্দ, আর ফার্সীতেও অমরুদ বলে পেয়ার (pear) কে।

(৫৬) পেরু। পেরু দক্ষিণ অ্যামেরিকার মোরগ জাতীয় পাখি। নামটি এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ (peru) থেকে। কেন এই পাখির নাম পেরু হল, আর কেনই বা পেরু নাম উঠে গিয়ে আজকাল এই পাখিকে টার্কি বলা হয় তা জানা নেই। ইংরেজিতে পেরু নাম কোন দিনই চলেনি। গোড়া থেকেই ইংরেজিতে টার্কি নামটি প্রচলিত। বোধহয় ইংরেজির প্রভাবে পেরু নাম উঠে গিয়ে বাঙ্গালাতেও টার্কি নাম চলছে।

(৫৭) পেরেক। পোর্তুগীজ শব্দ (Prego) থেকে পেরেক শব্দটি এসেছে। (prego) মানে মাথার কাটাও হয়, তবে এই অর্থে পেরেক বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার হয়নি। আসুম্পসামের শব্দাবলীতে (prego)-র তিনটি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে ; মেক, কীল আর গজাল। মেক ফার্সী শব্দ। বাংলাতে একমাত্র প্রয়োগ বোধহয় "কফিন চোরের ব্যাটা মেক মারা" এই প্রবাদে। কিল বোধহয় সংস্কৃত শব্দ ; শব্দটি হিন্দীতে ব্যবহার হয়। গজাল শব্দের জন্ম কী করে হল বলা শক্ত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ফার্সী গজ (লোহার শিক)-এর সঙ্গে সংস্কৃত অল্ (সূক্ষ্ম মুখ) সন্ধি করে গজাল বানিয়েছেন। বড় পেরেক অর্থে গজাল বহুদিন বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দ তাঁর মনসামঙ্গলে লিখেছেন, "নানারূপ বন্ধ করি, বাঁশের গজাল মারি, সাজাইল কলার মান্দাসে।" গজাল শব্দের চলন বাংলা ভাষাতে এখনও আছে, তবে মেক চলিত আর কীলের ব্যবহার বোধহয় নেই। উনবিংশ শতাব্দী থেকে পেরেক শব্দই চলিত হয়েছে। হুতোম প্যাচার নক্শাতে মাতালের গান আছে, "কে মা রথ এলি সর্বাঙ্গে পেরেক আঁটা চাকা ঘুর ঘুরালি ?"

(৫৮) প্রমারা। প্রমারা এক রকমে তাসের জুয়া। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ (primeiro) থেকে।

(৫৯) ফর্মা। পুস্তকাদির যতগুলি পৃষ্ঠা এক সঙ্গে ছাপা হয় তাকে ফর্মা বলে। চলন্তিকার মতে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (forma) থেকে। অনেকে কিন্তু অনুমান করেছেন যে শব্দটি ইংরেজী forme এর লিপ্যন্তর।

(৬০) ফিতা। শব্দটি পোর্তুগীজ (fita) থেকে এসেছে। আসুম্পসামের শব্দাবলীতে (fita) শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে কিনারা। কিনারা আজকাল

হিন্দীতে চলে। বাংলাতে পাড় বা ফালি অধিক প্রচলিত।

(৬১) ফিক্র বা ফিগ্রু। গ্রমারা খেলার একরকম দানের নাম ফিক্র। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (figura) থেকে।

(৬২) ফিরিঙ্গী। চলন্তিকার মতে শব্দটি এসেছে, পোর্তুগীজ শব্দ (Francez) থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বার্নিয়ের লিখেছেন যে ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয়দের ফ্রাঙ্গী (Franguis) বলে। অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি ফিরিঙ্গী হীনার্থক শব্দ ছিল না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে বাতিজর বলে একটি শব্দ আছে। তাতে তিনি একটি দাসখতের উল্লেখ করেছেন, যার আরম্ভ, "শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গী শুচরিতেষু" (১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ)। আরও একশ বছর পরে ফিরিঙ্গী শব্দের অর্থ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের মিশ্রিত জাতিকে বলা হত। তখন কোন ইংরেজকে ফিরিঙ্গী বলা মানে প্রায় তাকে অপমানিত করা।

(৬৩) ফেস্তা। ফেস্তা মানে মেলা বা পরব। পোর্তুগীজ শব্দ (festa) থেকে এই শব্দ এসেছে।

(৬৪) বয়া। শব্দটি পোর্তুগীজ (boia) শব্দ থেকে এসেছে। নদী বা সমুদ্রের চড়া ইত্যাদি দেখাবার নিদর্শনকে বয়া বলে।

(৬৫) বয়াম। আচার রাখবার চীনামাটি ইত্যাদির পাত্রকে বয়াম বলে। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ (boiao) থেকে। পোর্তুগীজরা এই শব্দটি কোথা থেকে পেল, তা ঠিক জানা নেই। খুব সম্ভব তারা মালয় বা ইন্দোচীনের কোন ভাষা থেকে শব্দটি নেয়। হিন্দীতে বয়ামকে সাধারণত অমৃতবান বলা হয়, তবে উত্তর প্রদেশে কোথাও কোথাও বয়াম শব্দটিও ব্যবহার হয়।

(৬৬) বরগা। পোর্তুগীজ শব্দ (verga) থেকে শব্দটি এসেছে।

(৬৭) বাও। উপদংশঘটিত দূষিত গ্রন্থিস্ফীতি রোগকে বাগী বা বাও বলে। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (bubao) ইংরেজি (bubo) থেকে।

(৬৮) বারান্দা। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দটি কোথা থেকে এলো সে বিষয়ে কয়েকটি থিওরি আছে। চলন্তিকাতে আছে যে, শব্দটি ফার্সী বরামদহ থেকে নেওয়া। ফার্সী বরামদ্ শব্দের অর্থ যা বেরিয়ে আছে। বরামদহ মানে তাহলে হবে (porch) বা গাড়ি-বারান্দা। দ্বিতীয় থিওরি অনুসারে বারান্দা এসেছে পোর্তুগীজ শব্দ (varanda) থেকে। তৃতীয় মত হল যে, শব্দটি আসলে ভারতবর্ষেরই ; প্রায় একই উচ্চারণের পোর্তুগীজ শব্দের অস্তিত্ব নেহাতই আকস্মিক। গত শতাব্দীতে বিদেশী পণ্ডিতেরা শব্দটি নিয়ে চর্চা করেন। বৃ ধাতু থেকে শব্দটি বানাবার চেষ্টা করা হয়। মৃচ্ছকটিকের কোন কোন পুঁথিতে বরণ্ড-লম্বুক শব্দ আছে। এই শব্দটির অর্থ কী তাই নিয়েও গবেষণা হয়।

যাই হোক ইংরেজি (veranda) শব্দ যে বাংলা বা হিন্দী বারান্দা থেকে নেওয়া, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৬৯) বাল্‌তি। শব্দটিকে সাধারণত পোর্তুগীজ (balde) থেকে আমদানি বলে ধরা

হয় ; তবে পোর্তুগীজ ভাষায় শব্দটি কোথা থেকে এলো তা জানা নেই। পোর্তুগীজ লেখকরা অনুমান করেছেন যে শব্দটি আসলে কোন ভারতীয় ভাষা থেকেই নেওয়া। ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই শব্দটি আছে। আসসুমপসাম বালতির বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়েছেন চিলিয়া। এই শব্দটি আজকাল বাংলা ভাষায় চলে না। মনে হয় তুর্কী চিল্মচী (হাত মুখ ধোবার গামলা) শব্দটিকে চলিত ভাষায় চিলিয়া বলা হত।

(৭০) বাসন। পুরাতন পোর্তুগীজ ভাষার (bacio বা bacia) বলে একটি শব্দ আছে। শব্দটির অর্থ থালা। হবসন জবসনের মতে বাঙ্গালা বাসন এই (bacio) থেকে এসেছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা মেনে নিয়েছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস আর রাজশেখর বসু কিন্তু বলেছেন যে শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে, তবে কোন সংস্কৃত শব্দ থেকে বাসন এসেছে তা তাঁরা বলেননি।

(৭১) বিন্তি। প্রমারা খেলায় বিন্তির অর্থ কুড়ি। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (vinte) থেকে।

(৭২) বিস্কুট। শব্দটি পোর্তুগীজ (biscoito) থেকে এসেছে, না, ইংরেজি (biscuit) থেকে এসেছে, তা বলা কঠিন। বিস্কুট অনেকদিন রেখে দিলেও খারাপ হয় না, তাই আগেকার দিনে জাহাজের খাবার হিসাবে বিস্কুট সঙ্গে নেয়া নিয়ম ছিল। পোর্তুগীজ নাবিকরাই প্রথম আমাদের দেশের লোককে বিস্কুটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই শব্দটি পোর্তুগীজ থেকে আসাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ইংরেজির দিকে এক মাত্র যুক্তি এই যে, পোর্তুগীজ থেকে এসে থাকলে শব্দটির উচ্চারণ বিস্কুত হত।

(৭৩) বেসালি বা বেসারি। বেসালি মানে দুধের কেঁড়ে, বা মাটির সরা। রাজশেখর বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই বলেছেন যে শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (vasilha) থেকে। পোর্তুগীজ লেখকরা কিন্তু শব্দটি পোর্তুগীজ থেকে এসেছে বলে দাবি করেননি। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে বেসালি বা বেসারির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, রামেশ্বরের শিবায়নে [১৭১১ খ্রীস্টাব্দ] আছে, "ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারির পরে" ; চণ্ডীদাস লিখেছেন, "যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া সাঁজে সাজাইনু দুধ"।

(৭৪) বেহালা। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (viola) থেকে।

(৭৫) বোতল। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (botelho) থেকে। শব্দটি বোধহয় ইংরেজি (bottle) থেকে আসেনি, কারণ তাহলে হয়তো এর উচ্চারণ বাংলা বোটল হত।

(৭৬) বোতাম। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (botao) থেকে। আস্‌সুম্‌পসামের শব্দাবলীতে (botao) শব্দের দুটি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে ; ghondi (ঘুণ্ডী) আর tocom (তকম)। ঘুণ্ডী শব্দটি সুতার তৈরি গোল বোতামের জন্ত এখনও ব্যবহার হয়। তকম বলে কোন শব্দ বাঙ্গালায় আজকাল চলিত নেই। তকম। বলতে বোধহয় তকমা বোঝানো হয়েছে। তকমার অর্থ চাপরাশ বা শীলমোহর। বাংলা তকমা শব্দ তুর্কী তমগা শব্দের বর্ণবিপর্যয় থেকে তৈরি।

(৭৭) বোমা। শব্দটি পোর্তুগীজ (boma) থেকে এসেছে। বোমার অর্থ বারুদ-পূর্ণ গোলক। (Bomba) শব্দের আর একটি অর্থ জলের পাম্প। বাঙ্গালায় এই অর্থ গ্রহণ করা হয়নি, তবে হিন্দী ও মারাঠীতে বম্বা শব্দ প্রচলিত।

গাড়ির যে কাঠে জোয়াল লাগানো থাকে তাকে বোম বলে। এই বোম এসেছে ওলন্দাজী শব্দ (boom) থেকে।

(৭৮) বোম্বেটে। শব্দটি পোর্তুগীজ (bombardier) থেকে এসেছে।

(৭৯) ব্যাণ্ডেল। ফরাসী বন্দর শব্দ পোর্তুগীজ উচ্চারণে (Bandel) হয়ে এখন বাঙ্গালা একটি শহরের নাম হয়ে গেছে।

(৮০) মাইরি। বাঙ্গালা অভিধানকাররা বলেছেন যে এই শপথ শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (Maria যীশুমাতা) থেকে। বিস্ময় স্থলেও মাই বা মাই রি বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন, "মাইরি সুরধুনি তীরে নেহারি" (জগদানন্দ); "আর এক লাজ তোহে কি কইব মাই। জল দেই দেই তবহু না যাই।" (বিদ্যাপতি); ইত্যাদি শপথ হিসাবে মাইরির প্রয়োগ মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে আজকালকার কথ্য ভাষায় মাইরি, এই শপথ, ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। সাধারণতঃ লোকে শপথ নিজেদের দেবতা বা দেবতুল্য ব্যক্তির নামে নেয়। যীশুমাতা মারীকে বাঙ্গালা দেশে লোক এতো ব্যাপকভাবে দেবতুল্য ব্যক্তি বলে জানে না।

সম্ভবত মাইরি মায়ের দিব্য (যীশুমাতা) মারীর দিব্য নয়।

(৮১) মার্কা। এই শব্দটি পোর্তুগীজ marca (রাজশেখর বসু) থেকে এসেছে না ইংরেজি mark (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) থেকে এসেছে, তা বলা শক্ত।

(৮২) মারতোল। মারতোল বলে হাতুড়িকে। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (martelo) থেকে। মনে হয় শব্দটি বাংলার চেয়ে হিন্দীতে বেশী চলে। চলন্তিকাতে শব্দটি

(৮৩) মাস্তল। এই শব্দটি হয় পুরানো পোর্তুগীজ শব্দ (masto) থেকে, নয় আধুনিক পোর্তুগীজ শব্দ (mastro) থেকে এসেছে।

(৮৪) মিস্ত্রি। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (mestre) থেকে। পোর্তুগীজ শব্দটির অর্থ সর্দার-মিস্ত্রি বা ফোরম্যান।

(৮৫) মেস্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজপুরুষদের সম্বোধনে মেস্ত্র বা মেস্তর শব্দ ব্যবহার হত। যেমন, "স্বস্তি সকলমঙ্গলোক নিলয় শ্রীযুক্ত মেস্ত্র স্তুরমান মেকলোড় সাহেবজিউ সহৃদায় চরিত্রেষু" [প্রাচীন বাঙলা পত্র সঙ্কলন, পত্র সংখ্যা ১২৫]। এই মেস্ত্র শব্দ হয় ইংরেজি master, নয় পোর্তুগীজ mestre থেকে নেওয়া।

(৮৬) মেজ। শব্দটি হিন্দীতেই বেশী চলে বাঙ্গালায় খুব বেশী ব্যবহার নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ, হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ"। হিন্দীতে শব্দটি এসেছে আরবী-ফারসী শব্দ মেজ থেকে। দালগাদো অনুমান করেছেন যে আরবী-ফারসীতে শব্দটি পোর্তুগীজ mesa থেকে নেওয়া। মনে হয়, বাংলাতে শব্দটি এসেছে হিন্দী মারফত; সোজা পোর্তুগীজ থেকে আসেনি।

(৮৭) মেরিনো। এক রকম ভেড়া আর তার পশমকে মেরিনো বলে। জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস লিখেছেন যে শব্দটি পোর্তুগীজ merinoর রূপান্তর। মনে হয় শব্দটি ইংরেজির মাধ্যমে বাঙ্গালায় এসেছে। Merino মূলে স্প্যানিশ ভাষার শব্দ।

(৮৮) যীশু। চলন্তিকায় আছে যে পোর্তুগীজ (Jesu) থেকে যীশু নাম এসেছে। এই কথার কোন প্রমাণ নেই। কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থে [১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ] যেস্থস আছে, যীশু নেই। "যেস্থস খ্রিস্ত আরবার আইসিবেন পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ের দিন।"

(৮৯) রেস্ত। রেস্ত মানে পুঁজি বা সম্বল। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (resto) থেকে।

(৯০) লণ্ড্রা। লণ্ডন শহরের নাম পুরানো বাঙ্গালা বা সংস্কৃততে লণ্ড্র। শব্দটি পোর্তুগীজ (Londre) থেকে নেওয়া। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লণ্ড্রজ শব্দের ব্যবহার পেয়েছেন মেরুতন্ত্র বলে এক গ্রন্থে।

(৯১) সপেটা। সপেটা একরকম খাদ্য ফল। এই গাছ অ্যামেরিকা থেকে আমাদের দেশে বোধহয় পোর্তুগীজরা নিয়ে আসে। পোর্তুগীজ ভাষায় এই ফলের নাম (Zapota)।

(৯২) সাঁকালি। টাকা রাখবার দুমুখো মোটা কাপড়ের থলিকে সাঁকালি বলে। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (saccola) থেকে। বঙ্গীয় শব্দকোষে উদাহরণ দেওয়া আছে, "ওরে দুমুখো সাঁকালি, সারাদিন ওবরা ভরা আর কর্বো কত" (দেহতত্ত্বের গান)।

(৯৩) সাগু বা সাবু। মালয় উপদ্বীপ থেকে নিউগিনি অবধি ভূখণ্ডে সাগু জন্মায়। হবসন জবসনে আছে যে মালয় ভাষায় (sagu) বলে একটি শব্দ আছে। পোর্তুগীজরা সাগুর নাম আর ব্যবহার আমাদের দেশে প্রচলন করে।

(৯৪) সান্তারা বা সন্ত্রা। সান্তারা কমলা জাতীয় ফল। আইন-ই-আকবরীতে আছে যে সিলেট (শ্রীহট্ট) সরকারে সান্তারা নামে একরকম ফল হয়। ফলের রঙ কমলা, বেশ বড় আর খুব মিষ্ট। চলন্তিকাতে আছে যে সান্তারা শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (cinha) থেকে। এই কথার কোন প্রমাণ দেওয়া শক্ত। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বেশ কয়েক-রকম কমলা জাতীয় ফলের কথা লিখেছেন। এইগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যেত। কেরলে পোর্তুগীজরা পৌঁছনোর সাতাশ বছরের মধ্যেই বাবর ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এত শীঘ্র পোর্তুগীজদের আনা কোন ফল ও তার নাম উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয় না।

(৯৫) সাবান। এই শব্দটি পোর্তুগীজ (sabao) থেকে এসেছে, না আরবী-তুর্কী সাবুন থেকে এসেছে তা জানা নেই।

(৯৬) সায়া। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (saia) থেকে।

(৯৭) সালসা। এক রকম রক্ত-শোধক ঔষধকে সালসা বলে। স্প্যানিশ ভাষায় (Zarza parilla) বলে একটি শব্দ আছে। (Zarza) মানে কাঁটা ঝোপ আর (parilla) মানে সুরা। এই কাঁটা ঝোপের মূল থেকে এক রকম টনিক বা সালসা

তৈরি হ'ত, তার নাম স্প্যানিশ ভাষায় (Zarza parilla) আর ইংরেজিতে (sarsa parilla)। এই ঔষধের প্রধান ডিপো ছিল জামাইকা দ্বীপে। সালসা শব্দটি বাঙ্গালা ভাষায় স্প্যানিশ ভাষা থেকে ইংরেজির মারফত এসেছে না পোর্তুগীজ ভাষার মারফত এসেছে তা বলা শক্ত। চলন্তিকাতে আছে যে শব্দটি পোর্তুগীজ ভাষা থেকে এসেছে। তবে দালগাদো বা কাম্পোস কেউই পোর্তুগীজ ভাষার তরফ থেকে শব্দটি দাবি করেননি।

(৯৮) সুর্তি। শব্দটি পোর্তুগীজ (sorte) থেকে এসেছে। (Sorte) মানে লটারির টিকিট। প্রায় ঐ একই অর্থে বাংলা ভাষায় সুর্তি শব্দ ব্যবহার হয়।

(৭৯) সেঁকো বা শেঁকো। চলন্তিকার মতে পোর্তুগীজ শব্দ (arsenico) থেকে সেঁকো শব্দটি এসেছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন যে সংস্কৃত শব্দ শঙ্খবিষ থেকে শেঁকো এসেছে।

(১০০) হারামদ, হারমদ, হারমাদ বা হরমাদ। এই শব্দের অর্থ জলদস্যু। শব্দটি এসেছে পোর্তুগীজ (armada) থেকে। বোধহয় আরবী হারাম শব্দের মিশ্রণে শব্দের প্রথম অক্ষর হ হয়ে গেছে। আজকাল আর শব্দটি চলিত নেই। চলন্তিকাতে শব্দটি নেই। পোর্তুগীজ ভাষা থেকে আমদানি অন্য একটি শব্দ 'বোম্বেটে' হারামদ-কে সরিয়ে দিয়েছে। তবে মধ্যযুগে হারামদ চলিত ছিল। কবিকঙ্কণের কোন কোন পুঁথিতে আছে, "ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে ॥" চট্টগ্রামের কবি আলাওল তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম-লেখা। দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥"

উপরের তালিকার শব্দগুলি প্রায় সবকটিই বস্তু বা জাতির নামবাচক, এক বোধহয় কালাপাতি শব্দটি বাদে। সাধারণত এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নামপদই লেন দেন হয়। ক্রিয়াপদের নেওয়া দেওয়া বিশেষ দেখা যায়না। তবে একটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। টুকা বা টোকা মানে লিখে নেওয়া। এই ক্রিয়াপদটি যদি দেশী শব্দ না হয়, তাহলে হয়তো এটি পোর্তুগীজ শব্দ (toca বা touca) থেকে এসে (৭) থাকতে পারে।

কাম্পোস আর দালগাদো তাঁদের নিজ নিজ পুস্তকে বাংলা ভাষায় পোর্তুগীজ শব্দের যে তালিকা দিয়েছেন সেগুলি অনেক বড়। কাম্পোসের তালিকায় ১৭১টি শব্দ ও দালগাদের পুস্তকে ১৬২টি এই রকম শব্দ আছে। এই সব শব্দের মধ্যে অনেকগুলি শুধু বাঙালী রোমান ক্যাথালিক সমাজে প্রচলিত ছিল ও হয়তো এখনও কিছু প্রচলিত আছে। সবকটি শব্দ দেবার প্রয়োজন বোধহয় নেই। উদাহণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। নিচের তালিকায় প্রথমে বাঙ্গালা অক্ষরে পোর্তুগীজ শব্দটির প্রচলিত উচ্চারণ, বন্ধনীর মধ্যে শব্দার্থ এবং রোমান হরফে পোর্তুগীজ শব্দটির বানান দেওয়া আছে।

বাংলা	পোর্তুগীজ
বাফাদু (ডিশ)	abafado
আগবেন্ত (তীর্থবারি)	aguabenta

আলম্প (ল্যাম্প	alampada
আমেন	Amen
অলতার (বেদী)	altar
আভেমারী (জয় মেরী)	Ave Mary
বাবতিস্মা	baptismo
বোমা দিয়া (শুভদিন)	Bom dia
কালদো (ঝোল)	caldo
কাপ্‌ পা (ওভার কোট	capa
কাটে কিস্‌মা	catecismo
কোমাদ্রী (ধর্মমাতা)	comadre
কোমপাদ্রী (ধর্মপিতা)	compadre
কমফিসান (পাপস্বীকার)	confissao
দেবুস (ঈশ্বর)	Deus
আনজুল (নতজানু হওয়া)	em joelhas
এজমোলা (ভিক্ষা)	esmula
আবতু (সন্ন্যাসীর বেশ)	habito
ইসোপা (জল ছিটোবার পাতার	hissope
ইরমান (ভাই)	irmao
মনা (বোন)	mana
মানু (ভাই)	mano
নাতল (বড়দিন)	Natal
ওল (পবিত্র তৈল)	ol
পাপা (পোপ)	Papa
পাসকুবা (ঈস্টর)	Pascoa
পেনা (শাস্তি)	pena
পোবরী (গরিব)	pobre
পারগেটারী	purgatario
সাক্রামেন্ত	Sacramento
তেরসু (জপমালা)	Terco
বেরদী (সবুজ)	verde

[সমাপ্ত]

নির্দেশিকা

অগাষ্টস ৬১, ১৫৭
অগষ্টিনীয় ৮, ১৬, ১৮, ১৯
অগষ্টিনিয়াস ৪, ১৭, ৩২
অম্বর ২৩
অশোক ৯৮, ১০১
আকবর ১২, ১৬, ১৯
আখ ২২
আগ্রা ১৪, ১৬
আজারকেল ৩৪, ৯২
আচার ৮৭
আজারতী ৮৩, ৮৪
আফিম ২৩, ১৫১
আভা ১২৯
আম ১২, ১৫০, ১৬১
আমদমপুর ৮৩, ৮৪
আমলকী ১৩১,১৬১
আরাকাস ১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৯১
আলাওল ২
অ্যালেক্সা দে মেনেসেস ৩১
ইট ৮৬, ৮৭, ১১২, ১৫৭
ইবনে বত্তুতা ১০৬
ঈশা-খান ১৩৬, ১৩৮
উড়িষ্যা ১, ২০, ২৮, ১২৯, ১৩০,
ম্যানুয়েল ৮, ১০, ১১
এস্টেভাস ডেলেমোস্ ৩৪
কটক ৪৩, ৪৮, ৬০
কটিবারি ১৯
কর্ণ সুবর্ণ ৯৭, ৯৯
কর্পূর ১৪, ২৩
কলম্বো ৬৯
কড়ি ১৩, ১০৯
কাউন্ট জিঁয়ারেস ৩৫
কাজুরিন ৬২
কাটরাবো ১৯ ২০, ১৪২
কাঁথা ১৪, ৫৭
কাঁথী ১৮
কানিংহাম ৯৭
কাপড় ২২
কাপাস ৮৪
কামরূপ ৯৮
কাম্বুলীন ৫৬
কামান ১৪৭
কালমিনা ৩২
কাঁসা ২৪, ৩৯
কুচবিহার ১২৯, ১৩০
কুমীর ৩৫, ৩৮, ৪০, ৮৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৫৬
কেদার রায় ১৩৮
কোচিন ১৬, ১৮, ৭০
কোরাণ ৪৫
কোসা ১৫, ৩৬
ক্যাম্বে ২১
খত্রি ১৮
খপবহি ৬৫
খপবাহ ৬৫
খানজাহান ১৪
খাসা ২২
খাসী ১১
খুদাবক্স খান ১২৯
খুর্রম ৯১
খোরাসান ২২, ৭২
গঙ্গা ২১, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৫৩, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৪৯, ১৫১, ১৫২
গণ্ডার ৩৫, ৩৭
গম ৮৪
গরু ২২, ৭৪, ৮৫
গয়ে ৬৯
গয়াসুদ্দীন ১০৩
গালা ৪২, ১৩১
গুদরিব বা গোদরিণ ৪৮, ৭২
গোমেদ ৬৯

গোলমরিচ ১৩, ২৬, ৭৬
গোলাপজল ১০৩, ১১২
গোয়া ১, ১৪, ৩২, ৩৪, ৭১
গৌড় ১, ২১, ৮৩, ৮৫, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪
ঘি ১২, ১৪, ২১, ২২, ২৬, ৭৪, ৮২, ১০৩, ১৩৫, ১৫১
ঘুঘু ১৯, ২৫, ৭১, ৭৪
চণ্ডী মঙ্গল ২
চন্দন কাঠ ১৪, ৩১
চর্বি ২১
চাটগাঁ ১, ২, ৩২, ৩৩, ১২৮, ১৩২, ১৩৫, ১৪০, ১৪৪
চাঁটি গাঁও ১১১
চাঁদ রায় ১৩৬
চান্দেখান বা চান্দেকান ২০, ১৩৮, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬
চাল ১১, ১৪, ২১, ৭৪, ৮২, ১০২, ১০৩, ১৩৬
চিনি ১২, ১৪, ১৮, ২২, ১০৩, ১৩১, ১৩৫, ১৫০
চীন ১৩, ১৪,
চুন ৩০
ছাগল ২৫, ৮৫
জগন্নাথ ২৮
জলসার ৭২
জয়িত্রি ১৪, ২৩
জাগরা ২২
জালালুদ্দীন (ফকীর) ১০৫, ১০৭
জিনষম্ ১৪, ১৮
জুয়াম দেলা ক্রুজ ১৬
জেলিয়া ১৪, ৩৩, ৩৫, ৯২, ১৩৮
জোঁক ৩৮, ৩৯
জোয়াও দে বাররোস ১২৮
টাণ্ডা ১৩৩
টিপারা ৩২, ১২৯, ১৩৬
টুটিকোরিণ বা তুতিকোরিন ৫, ১৩
ডিয়াঙ্গা বা দিয়াঙ্গা ৩২, ৩৫, ৬৪, ৯২, ১৪০, ১৪৪, ১৪৫
ঢাকা ২, ১৩, ১৮, ২০, ৩২, ৩৩, ৬৩, ৮২, ৮৩, ১৫৬, ১৫৭
তমলুক ৫৮, ৫৯, ৬০
তাম্রলিপি ৯৭, ৯৯
তাভারেস ১৫, ১৬
তাভেরনিয়ের ৮৩, ১৪৯, ১৫৫
তিমোর ১৪
তিলের তেল ১০৩, ১৩১
তীর ধনুক ৮৬
তুলা ১৩৩
তেল ২২, ৮২, ৮৫
তোপক্কি ৮৬
দাবা ১০, ৪৯
দামপুর ৮৩
দামাস্কাস ৫৩
দারচিনি ৬৯
দারাশিকোহ ৯৪
দালগিরি ৫৭
দিগো ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩
দিল্লী ১৩০, ১৫৩
দুর্গা ২৯
দুধ ১০০
দুয়ার্তে বার্বোসা ১২৫
দেবদত্ত ১০০
দোম জোয়াও ১২৪
ধান ২২, ১০৩, ১৪৯
নরন্দিন ১৮
নরসিঙ্গার ২১, ১৩০
নারায়ণগঞ্জ ১৩৮
নারায়ণগড় ৭৫, ৭৬, ৮২
নারিকেল তেল ৪৮, ৫২
নালন্দা ৯৭
নাসিরুদ্দীন ১০৩
নীল ১৪

মুন ৬২, ১৫৩
নেকলেস ২৪
নোয়িকুল ১৯
পতঙ্গা ৩৩, ৩৫
পটলা ১৫
পটুয়া ১০১
পাটনা ৮২, ৮৩, ৯০, ১২৯, ১৩০, ১৪৯
পামুরিণ ৫৬
পাদশা ১৪, ১৬
পান ১৯
পারগো ১৩৫
পায়রা ১১, ১৯, ২৫, ৭৪
পিপলি ৪, ৫৮, ৬২, ৬৫, ১৫২
পুণ্ড্র বর্ধন ৯৭
পুলগরি ১৮
পুসার ৪৪
পেগু ৩২, ১৩৬
পোর্তুগাল ১
পোর্তুগীজ ৬, ৮, ১২-১৫, ১৭, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৬০, ৬৩
পোর্তুগীজ জলদস্যু ২
পোয়চা ১১
পোস্ত ২৩, ৭২
প্রতাপাদিত্য ১৩৭
প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ১০৮
ফখরুদ্দীন ১০৩
ফতেহ জঙ্গ ৩৩
ফা-হিয়েন ৯৬
বজরা ১৩১
বটের ২৫
বতীচা ১০
বর্দ্ধমান ৮০, ৮১
বনজা ৫০, ৫১, ৬৪, ৬৭
বঙ্গালা ১০২
বন্দুক ৩৬, ৩৮-৪০, ৫০, ৭৫-৭৭, ৮৬
বার্ক্সিন ১৩৮
বাকলা ১৯, ১০, ১৩৬, ১৪৬
বাঘ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ১৫২
বাছুয়ের মাংস ১১
বাঙ্গালা ২০
বাণিয়ের ১৪৯
বান্দা ১০
বারভুঁইয়া ২১, ১৩৭
বারুদ ৩৮
বালতাসার ৬৫, ৬৬
বালাসোর ৬৪, ৭২, ১৫১
বালিঘাটা ৭২, ৮০, ৮১, ৮২
বাঁশ ১২, ২২, ১৬১
বিজয় নগর ১৩০
বিটিল ৩০
বুদ্ধ ৯৮, ৯৯
বুলভা ২০
বেত ২২
বেতোড় ১৩১
ব্রেসলেট ২৪
বোণিও ২৩
ব্রোকেত ১৩
ভাও ২৩, ৩১
ভাগারু ১২৯
ভারথেমা ১২২
ভুলুয়া ৩২
ভেলভেট ২৩
ভেড়া ৮৫, ১০৩
ভেড়ার মাংস ১১
ভোলা ২০
মগ ১, ২, ২৯, ৩২, ৩৫
মদ ২২, ১৫১, ১৫২
মধু ৩৭
মলুকা ১৪
মশা ৭৪
মসলিন ১০, ১৩, ২২
মহাবত খান ৫২, ৫৩, ৫৫-৫৭

মহিষাদল বা মালাকা ৬১, ৬২
ময়ূর ৭১, ৭৪, ৭৬, ৭৭
মানরিক ১, ২, ৩, ৩২, ৩৪
মানাশোর ১৮
মানুএল দেলা ৩৪
মাহয়ান ১০৯
মিংসে ১২০
মুক্তা ১৩
মুর্গী ১১, ৭৪, ১০৩, ১৫০, ১৫২, ১৬১
মুরিশলোটন ৩৯
মুসলিম ৭, ৯, ১১, ৬১, ৬২, ১৩৮
মুস্থমাবাজার ৮১
মেদিনীপুর ১০, ৪৮
মোম ১৪, ১৮, ২২, ১৫১
যদুনাথ সরকার ১০৮
যশোর ২০
যমুনা ১২৮
রাঙ ২৪
রাজমোল ২০, ৮৩, ৮৮-৯০, ১৫৫, ১৫৬
রেশম ১৩, ১৪, ২৪, ১৫১
র‍্যালফ ফিচ্‌ ১৩৩
লবঙ্গ ১৪, ২৩
লংকা ১৪
লাক্ষা ১৫১
লুইস্‌ ভ্রিগেরোস ৫০, ৫৩
লুইস্‌ জি'য়ারেসে ৫৮
শঙ্খ ৫, ৬, ২৪, ৩২
শশাঙ্ক ৯৭
শাম সুদ্দীন ১০৩
শায়েস্তাখান ১৫৭
শাহ্‌ বন্দর ৭০
শিহাবুদ্দিন ২, ১০৩
শু-ইউ-চু-ৎসিউলু ১১৭
শুয়োর ২৫, ৮৫, ৯৪, ১৫০, ১৬১
শোরা ১৪, ১৫১
শ্রীপুর ১৯, ৮২
সমতট ৯৭, ৯৮
সপ্তগ্রাম বা সাঁতগা ১, ১২৯, ১৩১
সন্দ্বীপ ৩৩, ৩৫, ১৩২, ১৩৬
সাগরদ্বীপ ২৯, ৩২
সালভাদের দাস্তেস ৬১
সাবাসপুর ৩৫
সি-ইয়াং চাও কুং টিথেলু ১১৪
সিন্দুর ৫৭
সিরিপুর ১৯, ১৩৬, ১৪১
সিংহল ২, ৬৮, ১৩৬
সীজার ফ্রেডারিক ১৩১
সুপারি ৩০, ৬৯
সুতী কাপড় ১০৩
সুদকাঁবা ১০৩, ১০৪
সুমাত্রা ১৩৫
সুরেন্দ্রনাথ সেন ১২৪
সেলিমাবাদ ১৯
সোগোল দ্বীপ ৩৫
সোনা ২৫
সোনার গাঁ ১৩৬
সোলার ১৪
সোলিমান বাস ১৯, ১০
হরিতকী ১৩১, ১৫০
হর্ষপুর ৭০, ৭১
হর্ষবর্ধন ৯৭
হাকলুইট সোসাইটি ১২৫, ১২৮
হাতি ৬৯
হাতির দাঁত ২৪
হার্মাদ ২
হিউয়েন ৎসাঙ ৯৭
হিজলি ৭, ৮, ১০, ১১, ২০, ৩৬, ৬২, ১৩৪, ১৩৫
হুগলি ১, ২, ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ৩২, ৯১, ৯৫, ১৩৪
হুহিয়েন ১১১, ১১৩,
হোগলা ২৫